প্রবাহ

তৃতীয় সংখ্যা

মানিকের সংকলন

প্রকাশকাল-
২৩শে জানুয়ারী, ২০২১

প্রকাশক-
শ্রীধর ঘোষ
চারুপল্লী, বোলপুর, বীরভূম
মোঃ- ৯৪৭৫৪৭৪৬৭০

বর্ণ সংস্থাপনায়-
মেসার্স বাসন্তী প্রিণ্টার্স
কালীমোহনপল্লী, বোলপুর
মো-৯৪৭৫৯৮৫৪৩৮

প্রচ্ছদ-
ব্রহ্মসমুদ্র থেকে ধেয়ে আসছে
চৈতন্যের প্রবাহ।

মুদ্রণ-
গ্যাল্যাক্সি প্রিণ্টার্স
৭/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন
কোলকাতা-৭০০০৬৭

বিনিময়-১০০/-

প্রাপ্তি স্থান-
পবিত্র কুমার দত্ত
৩৮/২৫, বি. এম. রায় রোড
কোলকাতা-৮
মোঃ-০৩৩২৪৪৭৩৪৬৩

অরুন ব্যানার্জ্জী
শিমুরালী, নদীয়া
মোঃ- ৯৫৬৪৪১৭০৯৫

গীতা বসাক
আমতলা, দঃ ২৪পরগণা
মোঃ-০৩৩২৪৭০৮৪৮৯

রত্না মাইতি
কাষ্ঠডাঙ্গা, সরশুনা
মোঃ-৭২৭৮৩৩৭২২১

বিভা দাস
বাগুইআটি, কোলকাতা
মোঃ-৯৮৩০৪২৮২৩৯

পার্থ সারথী ঘোষ
বেলঘড়িয়া, কোলকাতা
মোঃ- ৭৯৮০৪৪৫৪৭২

স্নেহময় গাঙ্গুলী
বোলপুর, বীরভূম
মোঃ-৯৪৭৫০০৭১৬৮

অমরেশ চ্যাটার্জ্জী
ইলামবাজার, বীরভূম
মোঃ-৯৪৩৪৫৮২১০৯

তরুন ব্যানার্জ্জী
বোলপুর, বীরভূম
মোঃ-৭৯০৮১৮৮৫৭৩

রুদ্রনাথ দত্ত
গড়গড়িয়া, বীরভূম
মোঃ-৯৭৩২২২৯৮২৫

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১। মানিক ৬৫ সংখ্যা	১-৩৭
২। মানিক ৬৬ সংখ্যা	৩৮-৭১
৩। মানিক ৬৭ সংখ্যা	৭২-১০৫
৪। মানিক ৬৮ সংখ্যা	১০৬-১৪১
৫। পাঠ পরিক্রমা-১	১৪২-১৫৮
৬। পাঠ পরিক্রমা-২	১৫৯-১৭২

প্রাককথন

দেখতে দেখতে প্রবাহের ৩য় পর্ব প্রকাশ হলো। যদিও করোনা অতিমারীর কারনে বেশ কিছুটা দেরী হয়ে গেল। এই প্রবাহে থাকলো মানিকের ৬৫, ৬৬, ৬৭ ও ৬৮ সংখ্যা এবং দুটি পাঠ পরিক্রমা। করোনার কারনে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হলেও পাঠ ও অনুশীলন বাধাগ্রস্ত হয়নি বরং আরও গতি লাভ করেছে প্রযুক্তি সহায়তা লাভ করায়—ঘরে বসেই গুগুল মিটে পাঠ শোনার সুযোগ হওয়ায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে এক গল্পে আছে— ব্রহ্মচারী কাঠুরেকে বলেছিল—"এগিয়ে পড়ো।" কাঠুরের গতিলাভ হলো। এগিয়ে গিয়ে সে প্রথমে চন্দনের বন পেল। কিছুদিন পরে, আরও এগিয়ে রূপোর খনি পেল। তারপর সোনার খনি। শেষে হীরে মণি মানিকের সন্ধান পেতে লাগলো। এগোনোর শেষ নেই, আর রত্ন লাভেরও শেষ নেই।

আজও কাঠুরের গতি অব্যাহত রয়েছে। পরশমণির সন্ধান পেয়ে তা নিয়ে চলেছেন সর্ব সাধারণের কাছে, যার স্পর্শ পেলে সকল মণি তুচ্ছ করে তারা পরম প্রাপ্তির আনন্দে উদ্বেল হবে ও আত্মিকে এক বোধে উত্তীর্ণ হয়ে জীবন সম্পূর্ণতা লাভ করবে।

এই উত্তরণের কিছু লক্ষণ দেখা যাবে বর্তমান প্রবাহে যার মননে পাঠকও এগিয়ে যাবেন অভীষ্ঠ লক্ষের দিকে। তাই আশা করা যায় কথামৃত, ধর্ম ও অনুভূতি ইত্যাদি গ্রন্থের পাশাপাশি পাঠচক্রের মানুষদের কাছে এই পত্রিকাও অনুশীলনের একটি অতিরিক্ত উপাদান হিসাবে বিবেচিত হবে।

২৩শে জানুয়ারী, ২০২১

ভূমিকা

বেদের ঋষিরা বলেছেন মানুষের ভিতরে জগৎ। জন্মের পর থেকেই মানুষ এই জগৎকে বাইরে বিক্ষেপ করে ও সেই জগতে বাস করে। ঠিক যেমন মাকড়সা তার ভিতর থেকে জাল বের ক'রে সেই জালেই বাস করে।

মানুষের জীবন ত্রিমাত্রিক (Three dimensional)। স্থুল দেহগত ব্যবহারিক জীবন, মানসিক প্রবৃত্তিগত সাংস্কৃতিক জীবন এবং আত্মিক জীবন ।

একটি কোষ থেকে অসংখ্য কোষ সৃষ্টি হয়ে এই মানবদেহ তৈরী হয়। আদি কোষের ক্রোমোজমের মধ্যে যে অসংখ্য জিন থাকে তার বিন্যাস-ই ঠিক করে দেয় ঐ কোষ থেকে গঠিত দেহের পূর্ণাঙ্গ রূপ ও বৈশিষ্ট্য সকল কী হবে। জিনের মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে যে পরিকল্পনা থাকে বয়স বাড়ার সাথে সাথে তা স্পষ্ট রূপ পেতে থাকে। অবশ্য বাহ্য পরিবেশেরও প্রভাব পড়ে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে।

মানসিক প্রবৃত্তির ক্ষেত্রেও একথা খাটে। এটিও জন্মগত। পরিবেশ থেকে উপাদান গ্রহণ ক'রে মানুষ তার সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। সেই চেতনার আলো বাইরে বিক্ষেপ ক'রে নিজস্ব ভাবধারার একটি জগৎ সৃষ্টি ক'রে নিয়ে সেখানেই বাস করে।

কবির মধ্যে যে কাব্যচেতনা, শিল্পীর মধ্যে যে শিল্পচেতনা, তা জন্ম থেকেই বীজ আকারে ভিতরে থাকে। পরে সেই চেতনার আলো বিক্ষেপ ক'রে সে কবি জগৎ, শিল্পী জগৎ বা অন্য কোন নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি ক'রে নেয়।

এই জগৎ বিক্ষেপ কার্যটি আপনা হতে ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে হয়ে চলে। কেননা চেতনার আলো বিক্ষেপ করার পর জগতের মানুষের মধ্যে তার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ হয়— চিন্তা ও চেতনার পরিবর্তন হয়। এই নতুন চেতনা আবার সে বিক্ষেপ করে। এছাড়া দেহগত পরিবর্তন,যা ভিতর থেকে হয় ও জন্মের সময় জিনগত ভাবে ঠিক হয়ে থাকে এবং কালে কালে প্রকাশ পায়, তা ব্যক্তির চিন্তা ও চেতনাকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ ক্রমাগত নতুন চেতনা লাভ ও তার বিক্ষেপ চলতে থাকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত।

আর আছে মানুষের আত্মিক জীবন। আত্মিক বিকাশের সম্ভাবনাও জন্মমুহূর্তে ঠিক হয়ে যায়। আত্মাসাক্ষাৎকারের পর আত্মার মধ্যে জগৎ বা বিশ্বরূপ দর্শন ও পরে বিশ্ববীজবৎ দর্শন হলে মানুষটা বোঝে আত্মিক জগৎ তার ভিতরে বীজরূপে বর্তমান। এই ভিতরের জগতকেই সে নিজের ও অন্যের সহস্রারে বিক্ষেপ করে দেখছে। বাইরে এই দর্শন অনুভূতির চর্চায় সৃষ্টি হয় এক বিশেষ কৃষ্টি (Culture), সত্যিকারের কৃষ্টি, দেহজমির গভীরতম প্রদেশে কর্ষণের ফল।।

দেহগত সম্পর্ক ধ'রে, রক্তের সম্পর্কে, পারিবারিক আত্মীয়তার বন্ধনে ধরা পরে ছোট্ট এক জগৎ। তার চেয়ে বড় জগৎ একসূত্রে আবদ্ধ হয় সাংস্কৃতিক চেতনার মেল বন্ধনে।

একজন মানুষ কোন কবির কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে তার কবি জগতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, কোন গায়কের গান শুনে মোহিত হয়ে তার সঙ্গীত জগতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।কিন্তু কোন ভাবেই এরূপ একটি জগতে জাতি ধর্ম বর্ণ ও বয়স বিদ্যা বিভব নির্বিশেষে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং পরস্পরকে এক করা যায় না ।

এ সম্ভব কেবল মাত্র আত্মিক জগতে। আত্মা এক। আত্মার পূর্ণ প্রকাশ হয় যে দেহে তার আত্মিক জীবন তাঁর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তাঁর চিন্ময় রূপে তাঁর আত্মিক চেতনা বিক্ষিপ্ত হয় সমগ্র মনুষ্যজাতির মধ্যে। অজ্ঞাতসারে সকলে তাঁর সাথে এক হয়। আত্মা যেহেতু শাশ্বত, তাই তাঁর স্থূলদেহ চলে যাবার পরও এই একীকরণ চলতে থাকে তাঁর চিন্ময়রূপ ভিতরে দেখে। আত্মিকে এক বিশ্ব গড়ে ওঠার সম্ভাবনার দ্বার খুলে যায়। মানুষ বোঝে, ব্যক্তি নিরপেক্ষ বৈশ্বিক সত্তা (universal self) কেই তারা একজন মানুষের রূপে দেখছে। দ্রষ্টাদের ব্যক্তি সত্তা (individual self) বৈশ্বিক সত্তায় (universal self) বিলীন হয়— তাদের দর্শন ও অনুভূতি universal self এর মহিমাকে সমৃদ্ধ করে, স্পষ্টতর করে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ কেমনে দিই ফাঁকি
আধেক ধরা পড়েছি গো, আধেক আছে বাকী।"

পূর্ণপুরুষ শ্রীজীবনকৃষ্ণ কর্তৃক বিক্ষেপ করা বিশ্বজোড়া আত্মিক জালে আমরা আটকে গেছি সেইদিনই যেদিন তাঁকে ভিতরে দেখেছি স্বপ্নে বা ধ্যানে। সেই আত্মিক জীবন থেকে সরে এলেই আমরা আমাদের নিজস্ব বিচ্ছিন্ন জগতে বাস করি। তখন সেই বৃহৎ জগতের সুখ থেকে বঞ্চিত হই। ঋষিরা বলেছেন, ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখম অস্তি। নিজের ক্ষুদ্র জগতে সুখ নাই, ভূমার মধ্যেই সুখ। বৃহৎ জগতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সেই ভূমার বিকাশ মহিমা দর্শনেই প্রকৃত সুখ।

সেই ভূমা.পুরুষকে মাঝে মাঝে ভিতরে দেখলেই হবে না, দর্শন অনুভূতির মননে সংস্কার মুক্ত হয়ে তার সাথে একত্ব উপলব্ধি হওয়া চাই, তবেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ হবে —ভূমানন্দ লাভ হবে। আর তখন ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনের দুঃখের তরঙ্গাভিঘাত মানুষকে বিচলিত করতে পারবে না।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩

প্রথম আলো

বিগত ছয় মাসের মধ্যে যারা প্রথম শ্রীজীবনকৃষ্ণকে অন্তরে দর্শন করে আত্মিক জগতে পদার্পণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, জীবনের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে, যেখানে জ্ঞানের আলোকরেখা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তাদের কিছু দর্শন এখানে উল্লেখ করা হ'ল।

(১) ইলামবাজারে মাস্টার মশায়ের বাড়িতে পাঠে গিয়ে প্রথম শ্রীজীবনকৃষ্ণের আশ্চর্য জীবনকথা শোনার ঠিক পরের রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম -আমি যেন বারো বছরের এক ছোট্ট মেয়ে। একজন লোক আমাকে ধরবে বলে তাড়া করছে। আমি প্রচণ্ড ভয়ে ছুটতে ছুটতে একটা মাটির বাড়ীর কাছে দাঁড়ালাম। লোকটিও ছুটে আমার কাছে পৌঁছে গেল। আমি তখন ভয়ে বাড়ীর দোতলার বারান্দায় গেলাম। সেখানে গোলাপী কাপড় পরে একজন মহিলা শুয়েছিল। আমি তার মাথার কাছে গিয়ে বসলাম। মুহুর্তের মধ্যে লোকটিও সেখানে পৌঁছে গেল। গিয়েই আমার একটা হাত ধরল। তাকিয়ে দেখি, তাঁর মুখটি পাঠের ঘরে ফটোতে দেখা শ্রীজীবনকৃষ্ণের মতো ।....ঘুম ভাঙ্গল। স্বপ্নটা মনে করলেই দেহে অদ্ভুত এক আনন্দ অনুভব করি, চোখে জল আসে।

গীতা বিশ্বাস, মেমারী, বর্ধমান

ব্যাখ্যা ঃ আগে মানুষ ছুটত ভগবানকে পাবার জন্য, এযুগে ভগবান ছুটছেন মানুষকে ধরা দেবেন বলে। গোলাপী কাপড় পরা মহিলা– গোলাপী জগৎ অর্থাৎ ভোগের জগৎকে মানুষ আঁকড়ে ধরে। ভগবান হাত ধরলে তবে মুক্তির পথ পায় ।

২। বেহালার পাঠচক্রে প্রথম যাওয়ার এক মাসের মধ্যে দুটি স্বপ্ন দেখি। প্রথম স্বপ্ন- ডিসেম্বর ২০১৫,মহাসম্মেলনের প্রায় ১৫দিন আগে। দেখছি—এক হাস্যরত বুদ্ধ অর্থাৎ লাফিং বুদ্ধকে। অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম। মূর্তিটি ঘরে বা দোকানে যেভাবে দেখা যায় অবিকল সেরকম কিন্তু প্রাণবন্ত, জীবন্ত রূপে।।

দ্বিতীয় স্বপ্নঃ- ঐ মহাসম্মেলনের প্রায় ১৫ দিন পরে অদ্ভুত এক স্বপ্নে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দেখলাম। দেখছি—আমি প্রচণ্ড জোরে হেঁটে যাচ্ছি এবং একটি কালী মন্দিরে ঢুকেছি। সেই মন্দিরে এক প্রকাণ্ড কালীমূর্তি আছে, লম্বা চওড়ায় বিশাল আকার। সেই মা কালীর সামনে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড তেজের সঙ্গে আমি বলছি—আমি সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষকে দেখতে চাই। অমনি ভগবান জীবনকৃষ্ণের মূর্তি আমার মাথায় ফুটে উঠল– তিনি আমার মাথায় বসে আছেন- –একেবারে জীবন্ত। পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। পরনে একটি সাদা গেঞ্জির উপর হালকা সবুজ হাফ সোয়েটার এবং লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় আমার মাথায় বসে পা দোলাচ্ছেন। তাঁর গায়ের রঙ ফর্সা।

মা কালীকে যখন বলছি—"আমি সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষকে দেখতে চাই"—তখন আমার সে কী তেজ! বাপ্‌রে বাপ্। সে তেজ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। স্বপ্নটি দীর্ঘক্ষণ ধরে দেখি। তারপর ঘুম ভেঙে যায়।

দেবব্রত প্রধান, বারাসাত, উ.২৪ পরগনা।

ব্যাখ্যা ঃ- লাফিং বুদ্ধ দেখিয়ে বুঝিয়েছে দ্রষ্টা শীঘ্রই আত্মিক সম্পদ লাভে ধনী হবেন। পরের স্বপ্নেই তিনি কালীর সংস্কার কাটিয়ে আদ্যাশক্তি তথা দেহের প্রসন্নতা লাভে নিজেরই সহস্রারে সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষকে, সত্যমূর্তিকে দর্শন করে সত্য লাভ করলেন।

সাধারণ পোষাক—সর্বজনীনতার প্রতীক।

৩। এ বছর, জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে এক রাত্রে স্বপ্ন দেখছি-আমাদের বাড়ীতে প্রচুর রান্না হয়েছে। অনেক লোক এসে লাইন দিয়ে বসে খাচ্ছে। এক অচেনা ভদ্রলোক সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরে ঘোরাফেরা করে সব তদারকি করছেন। ভদ্রলোককে দেখে বেশ ভক্তিশ্রদ্ধা জাগছে। ....স্বপ্ন ভাঙল। এর দুদিন পর হঠাৎ আমার স্বামী একটা বড় বাঁধানো ফটো আনলো ঘরে। দেখে চম্‌কে উঠলাম। আরে আমি এনাকেই তো স্বপ্নে দেখেছি খাওয়া দাওয়া তদারকি করতে। জিজ্ঞেস করে জানলাম ভদ্রলোকের নাম শ্রীজীবনকৃষ্ণ। আমি আগে কখনও এনার নাম শুনিনি ও ছবি দেখিনি। অথচ স্বপ্নে স্পষ্ট দেখলাম।......

মধুমিতা প্রধান, বারাসত, উঃ ২৪ পরগানা

ব্যাখ্যাঃ— দ্রষ্টার বাড়ী থেকে বহু মানুষ জীবনকৃষ্ণের কথা জানতে পারবে ও তাদের আত্মিক ক্ষুধা মিটবে।

৪। গত ১লা জানুয়ারী, ২০১৬, অদ্ভুত একটা স্বপ্ন হয়েছিল। দেখছি- একটা রাস্তা দিয়ে চলেছি একটা নদীর দিকে। যাবার পথে রাস্তাটা দুভাগ হয়ে গেছে। একটা পথ সোজা ও শর্টকাট, অন্যটি একটু আঁকাবাঁকা। সোজা পথটি ধরে এগিয়ে গিয়ে দেখি নদীর ভিতর জেগে ওঠা এক চরে একজন মাঝ বয়সী ভদ্রলোক বসে আছেন। তাঁর দেহ থেকে মিষ্টি আলো বেরোচ্ছে। যেন সোনার বরণ দেহ। উনি বললেন, তুই যে রাস্তা ধরেছিস সেটা দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবি না। তোকে আরো বাধার সম্মুখীন হতে হবে।আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কী করব ভাবছি। অমনি উনি ডান হাতের তর্জনী নির্দেশ করে দেখালেন এক অপূর্ব জ্যোতির্ময় পথ। বললেন, এই পথ ধরে চলে যা, তাড়াতাড়ি না পৌঁছালেও বিনা বাধায় গন্তব্যে পৌঁছাবি। আমি ঐ রাস্তাটা ধরে চলতে শুরু করেছি আর তক্ষুনি মায়ের ডাকে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

পরদিন স্যারের কাছে শ্রীজীবনকৃষ্ণের ফটো দেখে চমকে উঠলাম। আমি তো স্বপ্নে এনাকেই দেখেছি। কী আশ্চর্য।

বন্যা চ্যাটার্জী, পার্বতীপুর,অবিনাশপুর

ব্যাখ্যাঃ-আলোকিত পথ—ঈশ্বর নির্দেশিত পথ।
বিনা বাধায়—মায়ায় না জড়িয়ে, নির্লিপ্ত হয়ে।
গন্তব্যস্থল—ভবনদীর পারে যাওয়া, আত্মিক জগতে পৌঁছে চৈতন্যের রসাস্বাদন করা।
আঁকাবাঁকা পথ—বৈধী ধর্মের পথ।
শর্টকাট (short cut) পথ- অন্তর্মুখী কিন্তু বিচারাত্মক পথ।
আলোকিত পথ- অনুভূতিমূলক ধর্মের পথ, যা জীবনকৃষ্ণই দেখাতে পারেন।

৫। গত ৩রা এপ্রিল, ভোররাতে অদ্ভুত এক স্বপ্নে আমি শ্রীজীবনকৃষ্ণকে প্রথম স্পষ্টভাবে দেখলাম। দেখছি— হোস্টেল থেকে বাড়ী ফিরে বোনকে বললাম, চল দোকান থেকে তোকে খাতা, পেন কিনে দিই। দোকানে গিয়ে পেন কিনে দাম দেবার সময় দেখি মানি ব্যাগে মাত্র ২৫ টাকা রয়েছে, যেখানে অন্তত ৬০০ টাকা থাকার কথা। তখন ATM কার্ড নিয়ে টাকা তুলতে গেলাম। দেখি ATM সেন্টার বন্ধ। বোনকে দাঁড়াতে বলে ATM এর খোঁজে জামবুনির দিকে এগোচ্ছি। কিন্তু সব ATM কেন্দ্র বন্ধ - অন্ধকারে ডুবে আছে। বড় বড় গেট লাগানো বাইরে থেকে। জামবুনি পৌঁছে দেখি গ্রামে এসে গেছি। রাস্তায় আলো নেই। চারিদিকে অন্ধকার, হঠাৎ খালি গায়ে ধুতি পরে ন্যাড়া মাথা এক ভদ্রলোক সাইকেল চড়ে কাছে এলেন। তার চোখদুটি উজ্জ্বল। গা থেকে আলো বেরোচ্ছে। মনে হ'ল আমার পরিচিত। ভাবলাম ওনার কাছে ১০০টাকা ধার চেয়ে নিই। ওনাকে সেকথা বলতেই উনি বললেন, "এত ভাবছ কেন? বাড়ী যাও। তুমি যা খুঁজছো তা তোমার কাছেই আছে।" তখন আবার ছুটে ঐ দোকানে ফিরে এলাম। হঠাৎ মনে হ'ল ঐ ভদ্রলোক স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ। উনি বলেছেন, যা চাইছি তা আমার কাছেই আছে। তখন মানিব্যাগ খুলে দেখি হাজারের বেশি টাকা রয়েছে। খুব অবাক হলাম।

সমর্পন চক্রবর্তী, বোলপুর

ব্যাখ্যাঃ- বোনকে খাতা কলম কিনে দিচ্ছি — দ্রষ্টার মাধ্যমে বোনেরও আত্মিক অনুভূতি লাভ হবে - যা লিখতে হবে।
সব অন্ধকার অথচ ওনাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ওনার গা থেকে আলো বেরোচ্ছে – তাঁর আলোতেই সবকিছু ভাস্বর হয়। তাঁকে কেউ আলোকিত করতে পারে না।

"ন তত্র সূর্যভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোয়ম্ অগ্নিঃ
তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্বম্
তস্য ভাসা সর্বং ইদং বিভাতি।।"

যা চাইছ তা তোমার কাছে আছে — তার কৃপা পেলে ভিতরে অফুরন্ত আত্মিক তেজ জেগে ওঠে।

৬। স্বপ্নে দেখছি — আমার হাতে কৃষ্ণের বাঁশী। শ্রী জীবনকৃষ্ণ আমার কাছে ছুটে এসে বলছেন, 'তোমার বাঁশী শুনে আমি যে আর থাকতে পারছি না — তাই ছুটে এলাম।' আমি হতবাক্।.....
ব্যাখ্যাঃ- ব্রহ্ম এক আবার বহু। দ্রষ্টার মধ্যে ভগবানের লীলার প্রকাশ কাহিনী শুনে মনুষ্যজাতিরূপী ব্রহ্ম আকৃষ্ট হবে।

কখনও ভক্ত চুম্বক পাথর হন, ভগবান হন ছুঁচ— শ্রীরামকৃষ্ণ। "বনমালী তুমি পরজনমে হইও রাধা।" — এ যুগে রাধাদের অন্তরে নিজের সত্তা দান করে কৃষ্ণের জন্য রাধার ব্যাকুলতা অনুভব করছেন।

ঠাকুর বললেন, চোর চোর খেলায় বুড়ি ছুঁয়ে ফেললে আর ভয় নাই। জীবনকৃষ্ণ বললেন, বুড়িকে অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত ঈশ্বরকে ছোঁয়া যায় না, বুড়িই ছোঁয়। এই বিষয়টা নিয়ে আমার আর একটা স্বপ্ন হ'ল।

দেখছি — এক বুড়ি বসে আছে। মনে হ'ল ইনি সেই রামকৃষ্ণকথিত বুড়ি। অমনি ছুটে গিয়ে ওকে ছুঁয়ে ফেললাম। তারপর বুড়ির কাছে বসে পড়লাম। বুড়িকে শোনাতে লাগলাম আমার চাহিদা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা। বুড়ি আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, তুমি কি চাও? তখন আবার ঐ কথাগুলোই বলার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখি বলতে পারছি না, গলা রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কোন চাহিদার কথা বলতে পারছি না। .....

বুঝলাম, বুড়িকে সত্যিকার ছোঁয়া, তার সাথে এক হওয়া, তাঁর সত্তা পাওয়া, তাঁর কৃপায় হয়। আর তাঁর ছোঁয়া অর্থাৎ প্রসন্নতা লাভ করলে (তাকিয়ে হাসলে) মানুষ কামনা-বাসনা মুক্ত হয়।

সনাতন সাহা
পাটুলী, কাটোয়া, বর্ধমান

শিবলিঙ্গে জল ঢালা

● স্বপ্নে দেখছি (২২.০৩.২০১৬)— এক জায়গায় কয়েকটি ছোট ছেলে মিলে কালীপুজো করছে। ওদের মায়েরাও এসেছে। একজন একটা কাঁসার বাটিতে পায়েস এনেছে। ওকে বললাম, এটা আমার বাটি। ও বলল, না, এটা আমার। তখন একজন কিশোর সেখানে এসে বলল, আর কোনটা কোনটা তোমার? সকলেই একথা শুনে চুপ করে গেল। কিশোরটি এবার বাচ্চাগুলোকে বলল, তোমরা কী করছ? ওরা বলল, মা কালীর পুজো করছি। প্রশ্ন হ'ল, তারপর কী করবে? ওরা বলল, মা কালীকে জলে ভাসিয়ে দেব। কিশোর বালকটি বলল, তোমরা বরং নিজেদের মা-দের পুজো কর, করে জলে ভাসিয়ে দাও। অমনি মায়েরা বলে উঠল, তুমি এমন কথা বলছ কেন ? ওরা বাচ্চা। এমনি আনন্দ করছে। ওরা জানে না। কিশোরটি বলল, ওদের এই ছোট বয়সেই জানিয়ে দেওয়া উচিত যে ঐ কালীমূর্তি ভগবান নয়।

তারপর পায়েসের বাটিটি হাতে নিয়ে সকলকে একটু একটু করে দিতে লাগল। আমাকে দিতে এলে বললাম, ডাক্তার আমাকে মিষ্টি খেতে বারণ করেছে, আমি পায়েস খাব না। ছেলেটি আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, আর ডাক্তার কী 'আমার, আমার' করতে বলেছে? চম্‌কে উঠলাম। ......ঘুম ভাঙল।

মিনতি ব্যানার্জী (বোলপুর)

ব্যাখ্যাঃ— ১) ঈশ্বরকে বিনোদনের বিষয় না করে শিশুকালেই ঈশ্বর বিষয়ক সত্য জানিয়ে দেওযা উচিত।

২) ব্যবহারিক জীবনে ডাক্তারের কথা শুনবে আর আত্মিকে ভগবানের।

● গত ৭ই মার্চ সকালে বাড়ীতে যখন 'ধর্ম ও অনুভূতি' পাঠ হচ্ছিল, তখন হঠাৎ দর্শন হ'ল বইটির ঐ লাইনগুলি যেন জলের উপর লেখা।.......

ব্যাখ্যাঃ- শিবলিঙ্গকে জল দিয়ে স্নান করানো মানে "ধর্ম ও অনুভূতি" পাঠ শ্রবণ। এতে ভিতরের শিব সত্তার পরিচয় স্পষ্ট হয়।

অদ্রিজা বিশ্বাস (সখেরবাজার, কলকাতা)

নতুন প্রবাহ

● গত ১১.০৩.২০১৬-র রাত্রে স্বপ্নে দেখছি — কাশীতে আছি। গঙ্গাস্নান করব। কিন্তু গঙ্গায় কোন জল নেই। তখন একটা মানিক হয়ে উড়ে গেলাম আফ্রিকায়। ওখানে সকলে নিজের নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আমার দিকে কেউ তাকালো না। ফিরে এলাম

কাশীতে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। একজন অজানা লোক বলল, বাড়ী ফিরে যাও। বললাম, গঙ্গায় জলের নতুন প্রবাহ আসবে এক্ষুনি। আমি গঙ্গায় চান না করে ফিরব না। লোকটি বলল, রাত্রে থাকবে কোথায়? বললাম, গঙ্গার ওপারে আমার ঘর আছে। আজ গঙ্গা চান করে ওখানে থাকব। পরদিন বাড়ী যাব। বলতে বলতেই গঙ্গায় আগত নতুন প্রবাহের জলোচ্ছ্বাসের শব্দ শোনা গেল।

অরুণ ব্যানার্জী (শিমুরালী, নদীয়া)।

ব্যাখ্যাঃ- গঙ্গায় নতুন জলধারা আসবে — ধর্মজগতে জ্ঞানগঙ্গার নতুন প্রবাহ আসতে চলেছে। আফ্রিকা — মানুষের উৎপত্তি স্থল অর্থাৎ যারা জীবনকৃষ্ণচর্চার প্রাথমিক পর্যায়ে আছে, ব্যষ্টির সাধন নিয়ে আছে, তাদের কাছে। নতুন ধারায় স্নান করে তবে বাড়ী যাব — সমষ্টির ধর্ম তথা একত্বের ধর্মের পরিচয় পেয়ে, উপভোগ করে তবে ইহলোক ত্যাগ করব।

● স্বপ্নে দেখছি (৯.৩.১৬) — সমুদ্রতীরে আছি আমরা অনেকে। তীরে বালির উপর একটা কাগজের রোল (Roll), বেশ বড়। হঠাৎ ওটা খুলে যেতে লাগল। ওর ভিতর নানা রকম ছবি আঁকা। আমরা সকলে ছুটে ওখানে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে ঐসব ছবি দেখতে লাগলাম — ভিতর থেকে একটা কথা এল "এই কি একত্ব?" ..... ঘুম ভাঙল।

ব্যাখ্যাঃ- নির্গুণ ব্রহ্মের (সমুদ্রের) শক্তিতে একত্বের প্রকাশ (Unfoldment of Oneness) শুরু হতে চলেছে।

পার্থ সারথি ঘোষ (বেলঘরিয়া, কোলকাতা)

সখা

● দেখছি (২২.০১.২০১৬) — পাঠে গেছি। স্নেহময়দা পাঠ করলেন। পাঠ থেকে যখন ফিরছি তখন দেখছি — আমার কাঁখে এক কলসী জল এবং হাতে এক বালতি জল। রাস্তায় হঠাৎ পড়ে গেলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য ! কলসী বা বালতি থেকে এক ফোঁটা জলও পড়ল না। .... ঘুম ভাঙল।

অর্চনা দাস বৈরাগ্য (ইলামবাজার, বীরভূম)।

ব্যাখ্যাঃ- বলা হয়, শ্রীমতীর সহস্রধারা কলসী থেকে এক ফোঁটা জল পড়েনি। এটি কৃষ্ণ-কৃপায় দেহ সম্পূর্ণ যোগযুক্ত হওয়ার প্রমাণ। পাঠ শুনে দেহ যোগযুক্ত হওয়ায় দ্রষ্টা তার আস্বাদন পেলেন।

● গত ফেব্রুয়ারী মাসে এক রাত্রে স্বপ্নে শঙ্খ-র সাথে দেখা হ'ল। সে বলল, তুই আগের দিন পাঠে এলি না, স্নেহময় স্যার এসেছিলেন, অনেক কথা হ'ল। দেখছি রজনীও রয়েছে। সে ঐ পাঠে শোনা একজনের স্বপ্ন বলল। সে দেখেছে,— জীবনকৃষ্ণের সাথে দেখা হয়েছে এবং সে জীবনকৃষ্ণের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছে। জীবনকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে

বলেছেন, আবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কেন? কিছুক্ষণ পর আমার সাথে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেখা হ'ল। আমি আগে শোনা স্বপ্নের ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্য ওদের দু'জনকেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজনে একসাথে বলে উঠল, "আবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কেন বাবা!" একথা বলে দু'হাত তুলে হরিনাম করতে করতে চলে গেল। ..... ঘুম ভাঙল।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত (ইলামবাজার, বীরভূম)।

ব্যাখ্যাঃ- আত্মিকে ছোট বড় নেই, তাই প্রণাম করার দরকার নেই — এ কথার সত্যতা যাচাই করছেন ও প্রমাণ পাচ্ছেন দ্রষ্টা।

সংগ্রাম

● দেখছি (২৬.০৩.১৬)— বহু মানুষের সাথে যুদ্ধ করছি। যুদ্ধে সবাইকে হারিয়ে দিলাম। কিন্তু একটা কুকুর আমার পায়ে কামড়ে দিল। কুকুরটাকে আর দেখা গেল না। পায়ে দাঁতের দাগ দেখা যাচ্ছে। দেখছি বড় মামা রয়েছে। আমি মামাকে ব্যাপারটা বললাম। মামা বলল, ৩১টা ইন্‌জেকশন নিতে হবে, তবে ঠিক হবে। .... ঘুম ভাঙল।

সাগর ব্যানার্জী (বোলপুর, বীরভূম)।

ব্যাখ্যাঃ- দ্রষ্টা সংস্কার জয় করে সত্য ধর্ম লাভের পথে অনেকখানি এগিয়েছেন। এখন অবতারের সংস্কার অর্থাৎ ব্যক্তিপূজার সংস্কার কাটাতে হবে। ৩১টি ইন্‌জেকশন— অবতারের সংস্কার কাটানো। পূর্ণকে নিয়ে মোটে ৩১জন অন্তরঙ্গ ছিল অবতারপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের।

● গত ৮ই মার্চ রাত্রে স্বপ্নে দেখছি — একটা প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে গেছি। মনে হচ্ছে যেন একটা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব। জায়গাটা আমার অপরিচিত। একটা হলঘরে পৌঁছে দেখছি একটা বোর্ড-এ বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—

'India's struggle for freedom against poetry.' ('ধর্মে কাব্যকথার বিরুদ্ধে ভারতের মুক্তির সংগ্রাম।') you are about to win (তুমি জয়ী হতে চলেছ)'।

মনে হচ্ছে আমি জিতে যাব। .... ঘুম ভাঙল।

বরুণ ব্যানার্জী (বোলপুর, বীরভূম)।

ব্যাখ্যাঃ- এযাবৎ ধর্ম ছিল আবেগ ও কল্পনার মিশ্রনে শুধুই কাব্যময় — Religion of emotion and devotion. রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ সবই কাব্য আর গল্পগাথা। এসব কিছু অতিক্রম করে প্রকৃত ধর্ম তথা একত্বের ধর্মে আমাদের উর্ত্তীণ হতে হবে। দ্রষ্টা এই সংগ্রামে বিজয়ী হতে চলেছেন।

ফুলের সিঁড়ি

● মে মাসের মাঝামাঝি এক রাত্রে স্বপ্নে দেখছি — আমি ঠাকুমার বাড়ি গেছি। ঠাকুমার নাম ভারতী। উনি বললেন, চল্ তোকে দই খাওয়াব, ছাদে চল। ছাদে যাবার কোন সিঁড়ি নেই। হঠাৎ দেখি একটা ছেলে ফুল দিয়ে সিঁড়ি বানাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ছাদে ওঠার সিঁড়িটা সম্পূর্ণ করে দিয়ে ও চলে গেল। ঐ সিঁড়ি বেয়ে ঠাকুমার পিছু পিছু আমি ছাদে গিয়ে দেখি কী বিরাট ছাদ। কী সুন্দর। ঠাকুমা আমাকে এক বাটি দই খেতে দিল। একদম শুখো দই। কী দারুন খেতে। ঘুম ভাঙল। তখন মনে পড়ল, আরে, সিঁড়ি তৈরীর কারিগর তো ছোট বয়সের জীবনকৃষ্ণের যে ফটো আছে ঠিক তার মতো দেখতে।

সান্ত্বনা চ্যাটার্জী (বেলঘরিয়া, কলকাতা)।

ব্যাখ্যাঃ— ভারতী — সরস্বতী — পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। ছাদে যাবার ফুলের সিঁড়ি— শ্রীজীবনকৃষ্ণের নতুন বিকাশে মানুষের অন্তরে সৃষ্ট দর্শন অনুভূতি সমূহের সংকলন যা মননে মানুষের মন সহজে উর্ত্তীণ হবে সহস্রারে।

● গত ৯-৫-২০১৬ তারিখে স্বপ্নে দেখছি — শ্রীজীবনকৃষ্ণের ফটোর কাছে আকুল হয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছি। বলছি — ঠাকুর, আমি তোমায় জীবন্ত দেখতে চাই, দেখা দাও। অমনি ফটোতে জীবনকৃষ্ণের চোখ দুটো নড়ে উঠল। তখন বললাম, শুধু চোখ নয়, পুরো জীবন্ত হয়ে কাছে এসো। এবার উনি সত্যি সত্যিই ফটো থেকে জীবন্ত হয়ে নেমে এলেন। আমি বললাম, ঠাকুর, আমি কি পরীক্ষায় পাশ করতে পারব? উনি বললেন, 'নিশ্চয়। আমি তো আছি, ভাবনা কী?' ..... ঘুম ভাঙল অদ্ভুত এক নিশ্চিন্ত ভাব নিয়ে।

মিতালী দত্ত (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যাঃ- পরীক্ষায় পাশ করা— দ্রষ্টার সামনে স্কুল কলেজের কোন পরীক্ষা নেই। জীবনের উদ্দেশ্য আত্মিক একত্ব লাভ করা — এ বিষয়ে সফল হওয়া।

চশমা

● স্বপ্নে দেখছি (৫-৪-২০১৬) — একটা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। দেখি পাঠ হচ্ছে একটা বড় ঘরে। পাঠকের চোখে চশমা। শ্রোতারা বয়স্ক। কিছুক্ষণ পর ছেলেদের পাঠ হ'ল। দেখি পাঠকের চোখে এখন চশমা নেই। এখন পাঠ শুনছে কম বয়সীরা। এদের সংখ্যা বয়স্কদের চেয়ে অনেক বেশি।

অর্পিতা চ্যাটার্জী (সখের বাজার)।

ব্যাখ্যাঃ- চশমা — জীবনকৃষ্ণের ব্যষ্টির সাধনের অভিজ্ঞতা। সাধারণ মানুষের ব্যষ্টির সাধন হয় না। তাই ব্যষ্টির সাধনের কথা বলতে গেলে জীবনকৃষ্ণের অনুভূতির কথা বলতে হয়। বয়স্ক শ্রোতা — এরা ব্যষ্টির সাধনের কথা শুনতে পছন্দ করেন, সংস্কার থাকার জন্য। ছোটরা তুলনায় সংস্কারমুক্ত। তারা সমষ্টির সাধনের কথা, একত্বের কথা শুনতে চায়। তখন পাঠকও সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার নিরিখে পাঠ করেন। চশমা দরকার হয় না।

● দেখছি (২৪.০২.১৬) — স্নেহময়দার সাথে পথে দেখা। উনি এক জায়গায় পাঠ সেরে অন্য এক জায়গায় পাঠ করতে চললেন। বললাম, আপনি এক পাঠের আসরের ফুল ও কবজ নিয়ে অন্য এক পাঠের আসরে যাচ্ছেন? স্নেহময়দা হেসে বলল, ঠিক বলেছ। ...... ঘুম ভাঙল।

বিশ্বজিৎ দাস (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যাঃ- ফুল — দর্শন ও অনুভূতি। কবজ — স্বপ্নের ভিতরের শিক্ষা।

উৎস

● গত ১১ই জানুয়ারী, কাকুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম মানুষের আত্মা কোথায় থাকে আর মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় যায়। কাকু যখন উত্তর দিচ্ছেন, আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম — ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। ঘরের ভিতর অনেকে বসেছিল। তাদের কাউকে আর দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু একেবারে সামনে স্পষ্ট দেখা গেল শ্রীজীবনকৃষ্ণ বসে রয়েছেন। ...... পরক্ষণে দর্শন মিলিয়ে গেল। বুঝলাম, যে নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে জীবের উৎপত্তি ও অবশেষে সেখানে লয়, তারই মূর্তরূপ হলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ।

অর্পিতা সাহা, সখের বাজার, কলকাতা।

● দেখছি— একটা ছোট ডিঙিতে চেপে আছি। স্নেহময়দা ওটা চালাচ্ছেন। খুব জোরে ওটা কংক্রীটের তৈরী ব্রীজের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে। কোন জল নেই — অবাক হচ্ছি।........

অতনু মাইতি (কাঠডাঙা, সরশুনা)।

ব্যাখ্যাঃ- "ড্যাঙ ড্যাঙ ড্যাঙ ডাঙায় ডিঙি চালায় আবার সে কোন জন" — ব্যষ্টির সাধনে সে সচ্চিদানন্দ গুরু। সমষ্টির সাধনে সে আত্মিক একত্বের মূর্ত রূপ। স্নেহময়দা— একত্বের অনুশীলনের প্রতীক।

● গত বৃহস্পতিবার (২৬-১২-২০১৫) পাঠে যাইনি। কিন্তু রাত্রে স্বপ্ন দেখছি -– পাঠে গেছি। স্নেহময়দা পাঠের শ্রোতাদের বললেন, তোমরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে চাও? তাহলে এই দিকে তাকাও — বলে আকাশের একদিকে তাকাতে বললেন। আমাদের পিছনে অন্ধকার। সামনে দেখি কী মিষ্টি সূর্য উঠছে। কী মিষ্টি আলো তার। ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। স্নেহময়দা ঐ উদীয়মান সূর্যকে দেখতে বলছেন। ......

করবী রুজ (বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ- একত্ব লাভ হলে দর্শন সাপেক্ষে ঠিক ঠিক একজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

ভাই ফোঁটা

● স্বপ্নে দেখছি (১৭-১১-২০১৫) — জয় বলছে, এতদিন ধর্মচর্চা ছিল Theory (তত্ত্বকথা), এবার থেকে তা Practical -এ (বাস্তবে) নেমে আসবে। আমি যা আলোচনা করব পাঠে সেইকথাগুলিই প্রতিটি পাঠচক্রে আলোচিত হবে। আমি হাঁ হয়ে ওর তেজদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।........ ঘুম ভাঙল।

মনে হল এটি আত্মিক নিয়ন্ত্রনের প্রথম পদক্ষেপ। সব পাঠচক্রের অনুশীলনকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার, যাতে শ্রোতারা বিভ্রান্ত ও বিপথগামী না হয়।

এই প্রসঙ্গে একই দিনে গড়গড়িয়ার মিঠু গড়াইয়ের স্বপ্নটি উল্লেখ করছি। "দেখছি — কদমতলার ঘরে প্রচুর লোক বসে পাঠ শুনছে, এখানকার সব লোকরাও গেছি। ঘর ভর্তি। তাই রাস্তায় দাঁড়িয়েই পাঠ শুনছি। ভীষণ আনন্দ হচ্ছে।"

স্নেহময় গাঙ্গুলী (চারুপল্লী, বোলপুর)।

● ভাই ফোঁটার পরদিন (১৪-১১-২০১৫) রাত্রে স্বপ্ন দেখছি — তুতুন আর আমি জয়কে ফোঁটা দিতে গেছি ওদের বাড়ী। জয় বলল, আমি তো ভাইফোঁটা নিই না। আমরা কী করব ভেবে পাচ্ছি না। তখন দেখছি আরও অনেকে রয়েছে। সকলে লাইন করে বসে পড়লাম। জয় আমাদের সকলকে ভাইফোঁটা দিল। ....

মন্দিতা চ্যাটার্জী (ইলামবাজার)।

ব্যাখ্যাঃ- ভাই — বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ — শিবচৈতন্য (God Consciousnces)। এই শিব চৈতন্যকে ছোঁয়া যায় না। শিব চৈতন্য মূর্তিধারণ করে যদি তার সাথে এক করে নেন, তবেই মানুষ নিজের শাশ্বত সত্তাকে জানতে পারে, তাদের যমদুয়ারে কাঁটা পড়ে, ভাইয়ের কাছ থেকে ফোঁটা নেওয়া হয়।

যুগান্তর

● স্বপ্নে দেখছি (২২.১১.১৫)— একটা সুন্দর বাগান। সবুজ ঘাস। নানারকম ফুল। তরুণদা ও স্নেহময়দা আমার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে। হঠাৎ দেখি এক ভদ্রলোক খালি গায়ে, ধুতি পরে, হাতে পাচন নিয়ে কতকগুলি গরু, ছাগল ইত্যাদি ডাকিয়ে নিয়ে আসছে। আমি ভাবছি, এই সব গরু, ছাগল বাগানে ঢুকলে বাগানটা নষ্ট করে দেবে। কী আশ্চর্য! ওরা বাগানের ভিতর দিয়েই গেল কিন্তু কোন গাছে মুখ দিল না। ... ঘুম ভাঙার মুহূর্তে মনে ফুট

কাটল স্বপ্নদৃষ্ট ভদ্রলোক স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ। আর গরু, ছাগল ইত্যাদি বৈধী ধর্মের সংস্কার। শ্রীজীবনকৃষ্ণের কৃপা হলে সংস্কার সহজেই ত্যাগ হয়ে যায় এবং আত্মিক জীবনের সৌন্দর্য বজায় থাকে।

শিশির গঁড়াই, গড়গড়িয়া।

● দেখছি (০১.০৩.২০১৬) – প্রচণ্ড দুর্যোগ। জল ঝড় হচ্ছে। একজন বলিষ্ঠ দেহী মানুষ, বসুদেব যেমন মাথায় একটা ঝুড়িতে করে কৃষ্ণকে নিয়ে যমুনা পেরিয়ে নন্দ গৃহে গিয়েছিল, সেইভাবে মাথায় ঝুড়ি নিয়ে এগিয়ে চলেছে – ঝুড়িতে শিশুকৃষ্ণ আছে, তাকে ছাতার মত করে একটি সাপ তার ফণা দিয়ে ঘিরে রেখেছে। মনে হল লোকটি জীবনকৃষ্ণ। একটু পর মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। দেখি সত্যিই উনি জীবনকৃষ্ণ। ... ঘুম ভাঙল। মনে হল – ধর্মজগতে কী নতুন যুগ আসছে ? –

সুরজিৎ রুদ্র, বোলপুর।

● দেখছি (২০.১২.১৫) – পাঠ করছি। পাঠে দর্শন হল, একজন অজানা মানুষ, মনে হচ্ছে ভগবান, একটা কোদাল নিয়ে এসে মাটিতে চোট মেরে মাটি কেটে তা উল্টে দিল। ... এবার পাঠে দর্শনটি বললাম। ব্যাখ্যায় বললাম, দেখালো ভগবান উলোট পালট করে দিচ্ছেন। ধর্মজগতে বড় পরিবর্তন আসছে – ভগবানের ইচ্ছায়।। ... ঘুম ভাঙল।

স্নেহময় গাঙ্গুলী, চারুপল্লী।

পরিবর্তন

● স্বপ্নে দেখছি (১৩.১২.১৫) – গীতাদি বলল, স্নেহময়দা ডেকে পাঠিয়েছে তোমাকে। বাসন মাজছিলাম। হাত ধুয়ে দেখা করতে গেলাম। উনি একটা পাহাড়ের নীচে একটা শীতলপাটি পেতে বসে আছেন। সঙ্গে আরও কয়েকজন পাঠের লোক। ওনার পিছনে এক ঋষি বসে আছেন। তাঁকে স্নেহময়দা দেখতে পাননি। আমাকে দাদা বললেন, এতদিন যেভাবে পাঠ হয়ে আসছে সেভাবে আর পাঠ করা যাবে না। এর কিছু পরিবর্তন করা দরকার। তখন আমি বললাম, আপনি কি জীবনকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে বলছেন? তখন ঐ ঋষি আমাকে বললেন, আমি অনুমতি দিয়েছি। বললাম, আপনি কে? উনি বললেন, 'আমিই জীবনকৃষ্ণ।' আমি বললাম, কিভাবে আমরা পরিবর্তন করব। ঋষি তখন বললেন, "২৭শে কার্তিক মহাসভা হবে, সেখান থেকেই জানা যাবে কিভাবে পরিবর্তন হবে।" ...

রূপা মাজি, (আমতলা, দঃ ২৪ পরগণা)।

ব্যাখ্যাঃ- ২৭ সংখ্যাটি দেবদূতের একটি বার্তা বহন করে যা হলো- ইতিবাচক সংবাদ আসবে তোমার অনুভূতিতে যা অনুধাবন করলে ও মেনে চললে চরম কল্যান হবে।

● দেখছি (১০.০১.২০১৬) – পুরী গেছি। সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে আমি সূর্যোদয় দেখছি। সূর্য উঠল। সূর্যের ভিতর থেকে একজন মানুষ বেরিয়ে এল – তার মুখটা শ্রীজীবনকৃষ্ণের কিন্তু ধড়টা স্নেহময়দার। হাতে একটা নতুন 'ধর্ম ও অনুভূতি' বই। তিনি ঢেউয়ের তালে তালে এগিয়ে আসছেন আমার দিকে আর প্রচণ্ড আনন্দে দেহমন ভরে উঠছে। ...

গদাধর দাস, গড়গড়িয়া।

ব্যাখ্যাঃ মুখটা জীবনকৃষ্ণের ও ধড়টা স্নেহময়দার – সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষের সাথে একত্বলাভকারী মানুষদের প্রতিনিধি। ঢেউ – অনুভূতি।

নতুন 'ধর্ম ও অনুভূতি' বই হাতে এগিয়ে আসছেন – একত্বলাভকারী মানুষ কর্তৃক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে 'ধর্ম ও অনুভূতি' গ্রন্থ (নতুন) অনুশীলন ও অনুভূতি লাভের মাধ্যমে একত্বের ধর্ম ধারণাযোগ্য হবে সাধারণ মানুষের।

অর্ধনারীশ্বর

● দেখছি (১৩.০১.২০১৬) – একটি দেওয়ালে যাঁড়ের মুখ ও শূকরীর ধড় বিশিষ্ট অদ্ভুত এক জন্তুর ছবি। স্নেহময় সেটা পাঠের লোকদের দেখাচ্ছে। ও কী একটা মন্ত্র বলল, অমনি ছবিটা জীবন্ত হয়ে উঠল। তারপর বলল, এটা অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। খুব অবাক হলাম। ঘুম ভাঙল।

কৃষ্ণসাধন পাল, বোলপুর।

ব্যাখ্যাঃ মন্ত্র পড়া – দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যা (ধর্ম ও অনুভূতি) পাঠ। যাঁড়–শিবের বাহন– শিবত্ব তথা একত্ববোধ ধারনে সক্ষম যিনি। মাথাটা যাঁড়ের – ব্রেণ পাওয়ার আশ্রয় করে শিব অর্থাৎ পরম একের সাথে একত্বের বোধ হয়েছে যার। ধড়টা শূকরীর – বহু প্রসবিণীর অর্থাৎ বহুত্বের উৎস দেহজ্ঞানের প্রতীক।

সাধারণ মানুষের পক্ষে (যাদের বস্তুতত্ত্বে ১ম স্তরের সাধন হয় না), অর্ধনারীশ্বর মানে বহুত্বে একত্বলাভকারী মানুষ অর্থাৎ ব্যবহারিকে দেহজ্ঞান থাকার জন্য বহুত্ববোধ বা ভেদজ্ঞান থাকলেও আত্মিকে সকলে এক – এই বোধ যার লাভ হয়েছে।

সকল দেহ-ই প্রকৃতি – নারী। আর চৈতন্যের অখণ্ডতার বা একত্বের মূর্ত রূপ দেহীর আত্মিক সত্তা – পুরুষ। তাই নিজের মুখের স্থানে ঈশ্বরত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির যেমন জীবনকৃষ্ণের মুখ দেখাই অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দেখা।

● দেখছি (১৬.০১.১৬) – একটা ছেলের সঙ্গে গল্প করছি। মনে হচ্ছে ও আমাকে ভালবাসে। পাশে আর একটি ছেলে রয়েছে। কিছুক্ষণ পর আমার পছন্দের ছেলেটিকে দেখে মনে হল ও আসলে আমিই। অন্য কেউ নয়। তখন দ্বিতীয় ছেলেটি ঐ জায়গা ছেড়ে চলে গেল। ...

ঘুম ভাঙল। ভাঙার মুহূর্তে মনে হল, আমি সীতা আর আমার অপর রূপ ঐ ছেলেটি রাম।

অঙ্কনা মাইতি, (কাঁঠডাঙা, কলকাতা)।

ব্যাখ্যাঃ আমার আত্মিক স্বরূপ রাম – এক, অখণ্ড চৈতন্য। দ্বিতীয় ছেলেটি চলে গেল। ব্যবহারিকে অদ্বৈত বোধ হওয়ায়। দেহজ্ঞান আছে, তাই নারী – তবে তা রাম অনুগত তনু, তাই সীতা। আমিই রাম আমিই সীতা – অর্ধনারীশ্বর।

নিমন্ত্রণ

● দেখছি (১৯.০৩.২০১৬) – একজন কার্ড দিয়ে নেমন্তন্ন করতে এসেছে। নেমন্তন্ন কার্ডের বদলে পাঁচশ টাকার একটা নোট দিল। আমি বললাম, টাকা নেব কেন? ও বলল, 'বাবু সকলকে এটাই দিতে বলেছেন। সব ঘরে এই টাকা দিয়েই বাবুর নাতির অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন করলাম।' তখন আর কী করি, নিলাম টাকাটা। হঠাৎ দেখি উঠোনে স্বয়ং বাবু, ফতুয়া ও ধুতি পরে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছেন। বৌমাকে বললাম, যে কার্ড দিতে এসেছে তাকে কিছু দিতে হয়। সেজ বৌমা ডালায় করে বালি দিতে যাচ্ছিল। বললাম, এ কী করছ? বালি আবার দেয়! চাল দাও। তখন ও বালি ফিরিয়ে নিয়ে গেল ও নতুন করে চাল দিতে গেল। ... ঘুম ভাঙল।

শ্বেতবরণী দত্ত (গড়গড়িয়া)।

ব্যাখ্যাঃ সমকালে কোন মানুষের মধ্যে ব্রহ্মত্বের বিকাশ ঘটলে তা অন্যদের ধারণা করতে অনেক বেশি আত্মিক শক্তি দরকার হয়। ভগবান (বাবু) কৃপা করে আত্মিক শক্তি দান করে তাঁর নতুন প্রকাশ দ্রষ্টার ন্যায় বহু মানুষকে জানাবেন। চাল দিতে হয় – মস্তিষ্কের কোষ (Brain cell) দিয়ে মনন করতে হয়, কতকগুলি ধর্মীয় রীতি পালন নয়।

● গত জানুয়ারীর মাঝামাঝি, এক রাত্রে স্বপ্নে দেখছি – স্নেহময় পাঠ করল। তারপর উদাসীন হয়ে বসে রইল। সকলে ভাগবত প্রণাম করছে। আমি ভাগবত নিয়ে দেখি ওটা একটা চশমা। চশমাটা জোড় হাত করে নিয়ে সকলে প্রণাম করছে। ...

কল্পনা ব্যানার্জী, (শিমূরালী, নদীয়া)।

ব্যাখ্যাঃ ভাগবত প্রণাম – পাঠে আলোচিত যোগের দৃষ্টিভঙ্গীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা। পাঠক উদাসীন – এলানো ভাব, ঈশ্বরই কর্তা আমি অকর্তা – এই বোধ হয়েছে দ্রষ্টার।

বাস্তব ধর্ম

গতরাত্রে (০৬/০৩/২০১৬) দেখছি— পাঠের একদল ছেলেকে নিয়ে মধ্যমণি হয়ে বসে আছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। কোন একটা বিষয় নিয়ে জোর তর্ক বিতর্ক হচ্ছিল। হঠাৎ উনি বলে উঠলেন, 'ইথে কী হইল লাভ নন্দার পিসীর!' কথাটা স্পষ্ট শুনলাম। তারপর ঘুমটা ভেঙে গেল।

সান্ত্বনা চ্যাটার্জী, (বেলঘরিয়া)।

ব্যাখ্যাঃ ব্যষ্টির সাধনতত্ত্ব নয়, সমষ্টির ধর্ম তথা সাধারণ মানুষের ধর্ম ও তার ফলিত (Pratical) রূপই আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

● দেখছি (২৫.০৩.১৬) – জীবনকৃষ্ণের বাড়ী – দুটি ঘর পাশাপাশি। একটা ঘর ভেঙে ফেলা হয়েছে। সেখানে নতুন ঘর বানানো হচ্ছে। অপর ঘরটিও ভাঙা হবে ও নতুন করে নির্মাণ করা হবে। তবে তা পরে হবে। ওখানে জীবনকৃষ্ণও আছেন, তবে খুব আবছা দেখছি। দেখতে দেখতে ঘুম ভাঙল।

কৃষ্ণা ব্যানার্জী,(বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ বর্তমানে জীবনকৃষ্ণের দুটি ঘর -১) দ্বৈতবাদের ঘর যখন তিনি রামকৃষ্ণময় জীবনকৃষ্ণ। ২) অদ্বৈতবাদের ঘর যখন তিনি মৌলিক, স্বতন্ত্র বা অতিক্রান্ত জীবনকৃষ্ণ। নতুন করে নির্মান – ১) নির্গুণের ঘনমূর্তি জীবনকৃষ্ণ। ও ২) সমষ্টির ধর্ম বা একত্বের ধর্মের রূপকার জীবনকৃষ্ণ।

● দেখছি (০৩.০৪.১৬) – বাসন্তীদি, মহাদেবদা, আমার স্বামী, আমি ও পাড়ার আরও কয়েকজন জগন্নাথধাম গেছি। জগন্নাথের ঘরে ওনার আয়না ও চিরুনী দেখতে পেলাম। ঐ আয়না হাতে নিয়ে চিরুনী দিয়ে সকলের চুল আঁচড়াতে শুরু করলাম। ... ঘুম ভাঙল।

সবিতা ঘোষ, (চারুপল্লী)।

ব্যাখ্যাঃ আয়না – আদর্শ। জগন্নাথ – মানবব্রহ্ম শ্রীজীবনকৃষ্ণ। জগন্নাথ ধাম – পাঠচক্র। চুল আঁচড়ানো – অনেকের অনুভূতি নিয়ে সূক্ষ্মস্তরে ঈশ্বরীয় অনুশীলন।

আধুনিক

দেখছি (১৮.০৪.১৬) – সখেরবাজারে আছি। সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় পাঠে যাব ভাবছি। একটা জায়গার কথা মনে এল। কিন্তু সেখানে যেতে ২ ঘণ্টা লাগবে, আসতে ২ ঘণ্টা। তাহলে পাঠ করার সময় তো থাকছে না। হঠাৎ পাশ দিয়ে যাওয়া একটি মেয়েকে দেখে মনে হল ও পাঠের মেয়ে। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কাছে কোথাও পাঠ হয়? ও বলল, হ্যাঁ। বললাম, আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে? ও বলল, না। আমার সময় নেই। তারপর হাঁটতে লাগল। আমিও ওর পিছন পিছন যেতে লাগলাম। ও একটা ঘরে ঢুকে তার ছাদে গিয়ে বসল। আমিও ওর পাশে গিয়ে বসলাম। ও আমার বাঁ হাতটা ওর হাতে নিল তারপর দুলে দুলে গান করতে লাগল। সামনের বাড়ির দোতলার ঠিক ওপরে কার্নিসের মাথায় একটা আয়নাতে একজন অজানা ভদ্রলোকের বুক পর্যন্ত ছবি দেখা যাচ্ছে। তিনি সবুজ রঙের শার্ট পরে আছেন, আর গলা থেকে গলাবন্ধ ঝুলছে। বেশ স্মার্ট। হঠাৎ খেয়াল হল মেয়েটির ছোঁয়া লেগে আমার গায়ের রঙ বদলে গেছে। বিষয়টা অগ্রাহ্য করলাম। একটু

পরে অনুভব করলাম, দেহের ভিতরে কী একটা পরিবর্তন ঘটে গেল। তাও অগ্রাহ্য করলাম। কিছুক্ষণ পর দেখি আমার ব্রেন সেলে পরিবর্তন ঘটছে। ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবছি তাহলে তো এতদিন যেসব কথা বলে এসেছি পাঠে সেসব কথা আর বলতে পারব না। সব ভুলে যাব। ভয়ে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলাম। ... ঘুম ভাঙল।

স্নেহময় গাঙ্গুলী (চারুপল্লী, বোলপুর)।

ব্যাখ্যাঃ কাছে পাঠ – আকাঙ্ক্ষিত পাঠ দূর ভবিষ্যতে নয়, খুব কাছেই হবে। মেয়েটি– ভক্তের জগৎ। তার স্পর্শে – তার দর্শন অনুভূতি অন্তর স্পর্শ করলে। দর্পন – আদর্শ। দর্পণে অজানা ও আধুনিক এক ভদ্রলোকের প্রতিবিম্ব – শ্রীজীবনকৃষ্ণের যুগোপযোগী নূতন প্রকাশ জেনে তাকে আদর্শ করে জীবন কাটালে আত্মিক একত্বলাভ হবে – তার সুফল (effect) দেহে বর্তাবে – ধারণা শক্তি বাড়বে। গায়ের রং বদলাল – বাহ্য আচার, বিধিবাদীয় ধর্মীয় আচারও উঠে যাবে যা লোকের চোখে পড়তে পারে। ভিতরের পরিবর্তন – ক্রমাগত দর্শন ও অনুভূতি হয়ে দেহের ভিতরে পরিবর্তন ও পবিত্রতা লাভ হবে। সবশেষে মস্তিষ্কের কোষে পরিবর্তন – নতুনভাবে ভাবার, বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা জন্মাবে। শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় ঘটেছে বাহ্য পরিবর্তন বাহ্যপূজা ত্যাগ ইত্যাদি। শ্রীজীবনকৃষ্ণ লীলা গুপ্ত লীলা – ভিতরে দর্শন সাপেক্ষে দেহ মনের পবিত্রতা লাভ। এ যুগে ব্যক্ত লীলা হবে – বোধের পরিবর্তন ঘটবে মানুষের। ঈশ্বরচর্চার প্রকৃত সুফল পাবে মানুষ।

যোগীর দৃষ্টিতে হালদার পুকুর

শ্রীরামকৃষ্ণ গল্প করে বললেন, "ওদেশে হালদার পুকুর বলে একটা পুকুর আছে। গ্রামের মেয়েরা সেখানে জল আনতে যায়। সেই পুকুরের পাড়ে অনেকে বাহ্যে করে। ফলে দুর্গন্ধ ওঠে। তাদের অনেক করে নিষেধ করলেও পরদিন মেয়েরা গিয়ে দ্যাখে আবার তারা বাহ্যে করে রেখেছে। শেষে গাঁয়ের বয়স্করা বসে পরামর্শ করে কোম্পানীকে জানালো। কোম্পানী একজন চাপরাশিকে পাঠিয়ে দিল। সে পুকুর পাড়ে একটি নোটিশ টাঙিয়ে দিলে – 'এখানে বাহ্যে করিও না, করলে শাস্তি হবে।' তখন বাহ্যে করা বন্ধ হল।"

রূপকটির মর্মার্থ নিম্নরূপঃ

ওদেশে অর্থাৎ কামারপুকুরে, শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলার স্থানে– অতীত ভারতবর্ষের ধর্মজগতে।

হালদার পুকুর – 'হলধর' থেকে হালদার কথাটা এসেছে। হলধর মানে যারা কর্ষন জানে তথা কৃষ্টিবান মানুষ। আর্য কথার অর্থও কর্ষনকারী। অতীত ভারতে আর্যরা বৈদিক কৃষ্টি গড়ে তোলে। হালদার পুকুর হল অতীত ভারতে আর্যদের সৃষ্ট অনুভূতিমূলক ধর্মগ্রন্থ বেদ।

মেয়েরা – ভক্তরা।

জল আনতো– বেদ থেকে ভগবৎ প্রেমতৃষ্ণা মেটাবার উপাদান ঈশ্বরীয় অনুভূতির কথা শুনতো।

পুকুরের পাড় – বেদের ভাষ্য, বেদের কথা সহজ করে বোঝানোর জন্য সৃষ্ট পুরান কাহিনী।

বাহ্যে করা– ধর্মের অপব্যাখ্যা করা এবং নানা কাল্পনিক দেবদেবীর মূর্তি পূজার ও নানা মিথ্যা ধর্মীয় আচারের বিধান দান করে বৈদিক সত্য থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেওয়া।

এতে মানুষ ধর্মের সত্যসুন্দর রূপটি প্রত্যক্ষ করা ও উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত হয়। কখনও বা ধর্মে বিতৃষ্ণা জাগে। ক্বচিৎ ঈশ্বরীয় দর্শন হলেও তা হয় সংস্কারজ রূপ দর্শন। সত্য দর্শন হয় না।

বেদে সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষকে দেখার কথা বলা হয়েছে। তিনিই মানুষের স্বরূপ– আত্মার রূপ। ভাষ্যকাররা বাইরের সূর্যের মধ্যে আত্মার কল্যানতম রূপকে দেখার কথা বললেন। প্রাণসূর্যের বদলে ঐ বাইরের সূর্যের দিকে তাকিয়ে ত্রাটক করে ভারতবর্ষের বহু সাধকের চোখ নষ্ট হল। মানুষের কল্যাণ না হয়ে অকল্যাণ হল।

বেদ বলল, এ জন্মে যদি সত্য জানা হল তো হল নতুবা মহতী বিনাশ। কারণ পুনর্জন্ম নেই। পুরানকার ৮৪ লক্ষ জন্মের গল্প বলল, শুরু হল শ্রাদ্ধ প্রথা।

বেদে মানুষকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে, মানুষের ব্রহ্মত্বলাভ হলে কিভাবে তার প্রমাণ ফুটে ওঠে অপর বহু মানুষের অন্তরে সেকথাও বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে গুরু, পুরোহিতদের নির্দেশে গরুকে ভগবতী বলে মানা হয় আর মানুষকে গোময়, গোমুত্র খেয়ে শুদ্ধ হতে হয়।

ব্রাহ্মণদের ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র জপতে হয়। এই মন্ত্রে নিজেকে সাধারণ মানুষের সাথে এক করে দেখতে বলা হয়েছে। তারপর যে এক সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ থেকে সকলের চৈতন্য শক্তি আসছে তার ব্রহ্মতেজকে অনেকে সম্মিলিত ভাবে ধ্যান করতে বলা হয়েছে। কিন্তু ধর্মাচার্যদের উপদেশে ঘরের এক কোণে একাকী বসে ব্রাহ্মণ সন্তান এই মন্ত্র জপ করে এবং নিজেকে অন্যদের থেকে পৃথক ও শ্রেষ্ঠ ভাবে। "ধিমহী" শব্দটা বহুবচন – এর অর্থ 'আমরা ধ্যান করি' – 'আমি ধ্যান করি' নয় – অথচ ব্রাহ্মণরা সাড়ম্বরে পৈতে নিয়ে ঘরের কোণে বসে এই মন্ত্র জপ করছে গুরু/ পুরোহিতদের উপদেশে। এই পুরোহিতরা হালদার পুকুরের পাড়ে বাহ্যে করছেন।

কোম্পানী – নির্গুণ ব্রহ্ম।

চাপরাশী – আধিকারিক পুরুষ, অবতার পুরুষ। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের কথা বলছেন। তিনি এক দর্শনে তার দেহে মায়ের লীলাকাহিনী অপরকে বলবার আদেশ পেয়েছিলেন।

নোটিশ টাঙানো – দুভাবে তা করেন। ১) জীবনে দৃষ্টান্ত রেখে যান এবং ২) অমৃত বাণী দিয়ে যান।

১) জীবন দিয়ে বোঝানো – কয়েকটি উদাহরণ ক) ধনি কামারিনীকে ভিক্ষা মা করে সমাজে একটি বার্তা দিলেন। নিজেকে সাধারণ মানুষের সাথে এক করে দেখলেন।

রাত্রে আঁধারে রসকে মেথরের বাড়ীর ড্রেন পরিষ্কার করছেন আর কেঁদে কেঁদে বলছেন, "মা আমার ব্রাহ্মণ অভিমান ঘোচাও মা।"

খ) সূর্যমণ্ডল থেকে এক পুরুষ এসে তার সাথে কথা কয়েছেন। এই পুরুষ বাইরে সূর্যের ভিতর নেই – তিনি অন্তর মধ্যে দর্শন করেছেন। অর্দ্ধবাহ্য দশায় তাকেই বাইরে দেখেছেন বিক্ষেপ করে।

গ) পৈতে খুলে রেখে পঞ্চবটীতে সাধনায় বসলেন। পরে আর গায়ে পৈতে রাখতে পারতেন না।

ঘ) বাহ্য পূজা উঠে গেল। ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকতেন। বলতেন, 'এখন নরলীলা', মানুষের মধ্যে মায়ের লীলা দেখেন।

ঙ) মায়ের মৃত্যুর পর তর্পনাদি কর্ম করতে পারলেন না। কাঁদতে লাগলেন। হলধারী দাদা জানালেন, ঈশ্বর দর্শনের পর তর্পনাদি কর্ম থাকে না। মহাভারতে একথা আছে।

চ) সব মতের সাধন করে শেষে সব মত ও পথ ছেড়ে সাধারণ জীবনযাপন করতে লাগলেন আর সর্বদা ঈশ্বরের স্মরণমনন করতেন।

ছ) 'আমি জপ করব? হ্যাক থু।' জপ করতে গেলে ঠাকুরের সমাধি হয়ে যায় - - জপ করা যায় না।

২) অমৃত বাণী দান–যে সব বিষয়ে ধর্মাচার্যরা অপব্যাখ্যা করেছেন, সে বিষয়ে সাবধান করতে গিয়ে ঠাকুর বলেছেন –

ক)হাতি এত বড় জন্তু কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে না। মানুষে তার বেশি প্রকাশ। ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খুঁজবে মানুষে খোঁজ। অর্থাৎ গোমাতা বা অন্য কোন পশুপুজো নিষ্প্রয়োজন।

খ) মানুষ গুরু হতে পারে না – সচ্চিদানন্দই গুরু রূপে ভিতরে প্রকাশ পেয়ে শিক্ষা দেবেন। "আমায় যদি স্বপ্নে ধর্ম উপদেশ দিতে দ্যাখ জানবে সে সচ্চিদানন্দ, আমি নই।"

গ) 'শ্রাদ্ধান্ন খেও না।' এর এক মানে হয় শ্রাদ্ধ মিথ্যা, তাই শ্রাদ্ধান্ন খাইয়ো না। 'ঈশ্বর দর্শনের পর শ্রাদ্ধতর্পনাদি কর্ম থাকে না।' সচ্চিদানন্দগুরু লাভের পর এসব কর্ম করার দরকার নেই। এতে আত্মিক শক্তির হানি হয়।

ঘ) "মা আমার বাহ্য পুজো উঠিয়ে দিয়েছেন"। 'মানস পূজাই ভাল।' "মাটির প্রতিমায় পুজো হতে পারে আর জীয়ন্ত মানুষে হতে পারে না?" মা দেখিয়ে দিয়েছেন এখন নরলীলা। ব্যাকুলতা থাকলেই হল। 'ঈশ্বরের কৃপায় ঈশ্বর দর্শন'। 'স্বপন কি কম গা?' স্বপনে ঈশ্বরীয় দর্শন হয়। দর্শনের কথা ভক্তসঙ্গে আলোচনা করা ভাল। এতে অন্যের ভক্তি বিশ্বাস বাড়ে।

ঙ) কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি– ধর্ম কিনা বৈধী ধর্ম। জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান দর্শন, ভগবান লাভ। লোকে কালীঘাটে এসে দানধ্যানই করতে লাগল, কালীদর্শনই আর হল না।

চ) মানুষ স্বরূপত ব্রহ্ম। তোমরা এতগুলি বসে আছ, আমি দেখছি এক রামই এতগুলি হয়ে বসে আছে। ..... তুমি জান বা না জান তুমি রাম। ..... ইত্যাদি।

বাহ্যে করলে শান্তি হবে – আত্মিক শক্তির হানি হবে। শিল খেকো আম হয়ে যাবে যা ঠাকুর সেবায় লাগে না, নিজের খেতেও সন্দেহ হয়।

বেদের ভাষা প্রাক্ সংস্কৃত বা বৈদিক সংস্কৃত যা সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য নয়। তাছাড়া দীর্ঘদিন ধরে বহু ধর্মাচার্য এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নানা বিকৃতি ঘটিয়েছেন। তাই যুগাবতার যুগোপযোগী করে মানুষের দেহে ঈশ্বরের লীলার কথা তথা মানুষের দেবত্বলাভের কথা সহজ বাংলা ভাষায় বিবৃত করলেন। তাঁর জীবন ও বাণীর সংকলন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত হয়ে উঠল নতুন বেদ – হালদার পুকুরের নতুন সংস্করণ।

বেদ পঞ্চকোষ ও সপ্তভূমির কথা বলেছে। কিন্তু প্রতি ভূমির অনুভূতির কথা নিজের দর্শন অনুভূতির আলোকে আমাদের জানালেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি স্থূলে সূর্যমণ্ডলের পুরুষকে দর্শন করলেন, তবে তা বাইরের সূর্যের ভিতর নয়। এ যুগে কিভাবে ভক্তিভক্ত নিয়ে জীবন কাটাতে হবে তা নিজের জীবনে দেখালেন এবং ঈশ্বরীয় চর্চার উপাদান রেখে গেলেন।

দুর্ভাগ্য আমাদের, তাঁর দেহাবসানের স্বল্পকাল পরেই এই নতুন হালদার পুকুরের পাড়ে বাহ্যে করা শুরু হল।

'যত মত তত পথ', 'টাকা মাটি, মাটি টাকা', 'কেয়া জানে কোন ভেক্‌সে নারায়নজী মিল যায়', 'সচ্চিদানন্দই গুরু', 'সন্তানের মা চাই না'? – ইত্যাদি বহু কথার বিকৃত অর্থ করা হতে লাগল। মঠ মন্দির গড়া, গেরুয়া পরা, কানে মন্ত্র দেওয়া, মাটির প্রতিমা পূজা ইত্যাদি শুরু হল তার অনুগামীদের মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বৈদিক ঋষির পরিচয় আবিষ্কার ও তাকে অনুসরন করা সাধারণ মানুষের কাছে কঠিন হয়ে পড়ল।

সৌভাগ্যের কথা এযুগে আবার নতুন চাপরাশির আগমন ঘটল। শ্রীজীবনকৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দ গুরু রূপে লাভ করে রামকৃষ্ণময় হয়ে তাঁর সকল কথার মর্মার্থ ধরিয়ে দিলেন জগতকে তাঁর লেখা 'ধর্ম ও অনুভূতি' গ্রন্থের ১ম ও ২য় ভাগে। কথামৃতের সাথে সাথে এই গ্রন্থ পাঠে মানুষের নানাবিধ ঈশ্বরীয় দর্শন হয়, মানুষ কথামৃতের অমৃত পানের সুযোগ পায়। সুতরাং এই গ্রন্থ হল কথামৃতরূপ হালদারপুকুরের পরিশুদ্ধ পাড় ও বাঁধানো ঘাট।

কথামৃতে ঠাকুর শুদ্ধাভক্তির কথা বলেছেন, দ্বৈতবাদে ঈশ্বরীয় লীলার বর্ণনা করেছেন। নিজের ব্যষ্টির সাধনের কথা বলেছেন রূপক করে, গল্প করে। সাধারণ মানুষের ব্যষ্টির সাধন হয় না, দু'একটি অনুভূতিতে আভাস ফোটে মাত্র। এছাড়া ব্যষ্টির সাধনে ব্যক্তিগত সংস্কারও অনেক সময় রূপ ধারন করে। ফলে বেশিদিন ব্যষ্টির সাধনের দেহতত্ত্ব মানুষকে তৃপ্তি দিতে ও আত্মিকে সকলে এক – এই বোধে উত্তীর্ন করে তাদের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করতে পারে না। একজন মানুষের ষোল আনা ব্যষ্টির সাধন হলে তাঁর চৈতন্য তাঁর চিন্ময় রূপ ধরে মনুষ্যজাতির মধ্যে ব্যাপ্ত হয়। তাঁকে ভিতরে দেখে তাঁর সাথে আত্মিকে এক হলে সাধারণ মানুষও আত্মিক জগতের মাধুর্য আস্বাদনে সমর্থ হয়। উপলব্ধি করে আত্মিকে সকলে এক। এক সত্তা। এই আত্মিক একত্বই বাস্তব ধর্ম, এতেই জগতের প্রকৃত কল্যাণ। এই সত্য অনুধাবন করে পরবর্তীকালে শ্রীজীবনকৃষ্ণ নতুন পুকুর খনন করলেন। ঠাকুর বলেছেন, কুয়ো খোঁড়া হয়ে গেলে কেউ ঝুড়ি-কোদাল ফেলে দেয়, আবার কেউ তা তুলে রাখে পাড়ার অন্য কারও কাজে লাগবে বলে।

বাস্তবিক রামকৃষ্ণকথামৃতকে ভিত্তি করেই শ্রীরামকৃষ্ণের মতই নিজের উপলব্ধির আলোয় তিনি লিখলেন তাঁর জগৎব্যাপীত্বের কথা, আত্মিক একত্বের কথা 'ধর্ম ও অনুভূতি' গ্রন্থের ৩য় ভাগে ও বৈদিক সত্য নামক পুস্তিকায়। এখানে তিনি বৈদিক সত্যের স্পষ্ট পরিচয় তুলে ধরলেন। সৃষ্টি হল মহাবেদ। এই গ্রন্থকে নতুন হালদার পুকুর বা তাঁর নাম অনুসারে একে ঘোষ পুকুরও বলা যায়।

এখন, নতুন হালদার পুকুর হ'ল – শ্রীজীবনকৃষ্ণ ঘোষ রচিত 'ধর্ম ও অনুভূতি'র ৩-য় ভাগ ও বৈদিক সত্য নামক পুস্তিকা।

পাড় – পাঠচক্র, যেখানে ধর্ম ও অনুভূতির ৩-য় ভাগ পাঠ ও আলোচনা হয়।

জল – বহুত্বে একত্বের অনুভূতি। এই অনুভূতি হলে শুধু তৃষ্ণা মেটে না, পুষ্টি হয়, শান্তি ও তৃপ্তি লাভ হয়।

মেয়েরা – জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জগতের মানুষ।

বাহ্যে করা – এই পুকুরের পাড়ে কেউ বাহ্যে করলেও অর্থাৎ ভুল ব্যাখ্যা করলেও তা পুকুরের জলকে দূষিত করতে পারবে না। কেননা কারও না কারও স্বপ্নে ভুল ধরিয়ে সত্য জানিয়ে দেবেন। ঠিক যেন এই পুকুরের জলকে ঘিরে চারিদিকে কংক্রিটের গার্ডওয়াল দেওয়া আছে উঁচু করে। তাই নোটিশ মারার দরকার পড়ল না।

গার্ডওয়াল হল প্রমাণের কথা। কারও ব্রহ্মত্ব লাভ হলে তার প্রমান দেবে মনুষ্যজাতি – জাতি-ধর্ম-বর্ন নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ তাকে অন্তরে দর্শন করবে। আর তার সাথে তথা মনুষ্যজাতির সাথে আত্মিক একত্ব লাভ হলে তিনি সকল প্রকার বিধিবাদীয় ধর্মের সংস্কারমুক্ত হবেন। তিনি নিজেকে বিশেষ কোন ধর্মের লোক বলে দাবী করবেন না। তাঁর জীবনযাত্রা হবে অতি সহজ সরল। এই শর্ত পূরণ হলে তার কাছে মানুষ ঘোষ পুকুরের জলের কথা শুনবে। আর তাই কেউ এই জল দূষিত করতে পারবে না।

এই কথা কলকাতার সখের বাজারে গীতা ঘোষের বাড়িতে আয়োজিত পাঠচক্রে আলোচনা হবার পর দু'জন তাদের সম্প্রতি দেখা স্বপ্নের কথা জানালেন। স্বপ্নদুটি উপরে উল্লিখিত ভাবনাকে পূর্ণ সমর্থন করে।

দ্রষ্টা সবিতা ঘোষ দেখছেন (৩০/০১/২০১৬)– বাপের বাড়ি গেছেন। ওখানে চন্দ্রা পুকুর বলে একটা বড় পুকুর আছে। কিন্তু স্বপ্নে দেখছেন, সেটা যেন ছোট হয়ে এঁদো পুকুর হয়ে গাছে। পাশে একটা ইঁটের পাঁচীর উঠেছে। তার পাশে নতুন একটা পুকুর হয়েছে। তার চারপাশ উঁচু করে বাঁধানো।একজনকে বললাম, এভাবে বাঁধিয়ে দিলে চারপাশ থেকে পুকুরে জল ঢুকবে কেমন করে? আর জল না ঢুকলে পুকুরে জল হবে কেমন করে? সে বলল, পুকুরে ঠিক জল হবে। এটা ঘোষ পুকুর। পুকুরটা ঘোষেদের বলে লোকেরা ঘোষ পুকুর বলছে। ..... স্বপ্ন শেষ।

দ্বিতীয় স্বপ্নের দ্রষ্টা মনি দেবনাথ দেখছেন, (২৩/০১/২০১৬) – একটা বিরাট পুকুর – স্বচ্ছ জল। সেখানে জলের উপর একটি হাঁড়িতে ভাত চাপিয়েছেন। আগুন নেই, অথচ ভাত ফুটছে। দ্রষ্টার মেয়ে ও তার বন্ধুরা অনেকে এল। দ্রষ্টা তাদের বলল, ভাত হয়ে গেছে, খেয়ে নাও। ওরা ভাত খেতে বসে পড়ল ..... ঘুম ভাঙল।

এটি সবিতা ঘোষের দেখা ঘোষ পুকুরের বৈশিষ্ট্য। চন্দ্রা পুকুরের জল তথা ভক্তিরস মানুষ পান করেছে। এখন ঘোষ পুকুরের ভাত অর্থাৎ একত্ব লাভে মানুষ শান্তি ও তৃপ্তিলাভ করছে এবং হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছে।

ভবিষ্যতে আরও একটি পুকুর তৈরী হবে, যেটি হবে বহু সাধারণ মানুষের দর্শন অনুভূতির সংকলন এবং যা বহুত্বে একত্ব প্রতিষ্ঠার পরিণতির উদাহরণ হবে। তখনই নিখিল মানব-আত্মা হবে পরিতৃপ্ত।

পাঠ প্রসঙ্গে

● **"মিছরীর রুটি সিধে করেই খাও আর আড় করেই খাও মিষ্টি লাগবে" – শ্রীরামকৃষ্ণ।**

১. মিছরীর রুটি – ব্যষ্টির সাধনে–সহস্রার।

এই রুটি খাওয়া – সহস্রারে মন গিয়ে নানাবিধ সমাধি লাভে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ।

সিধে করে খাওয়া – আগমের সাধনে সমাধি।

আড় করে খাওয়া – নিগমের সাধনে সমাধি।

২) বিশ্বব্যাপীত্বে– সহস্রারে নিজের দর্শনে নিজের ব্রহ্মসত্তার পরিচয় লাভ-ই হল সিধে করে খাওয়া। যেমন ভগবান হওয়ার স্বপ্ন ইত্যাদি। যখন অপরের দর্শনে নিজের ব্রহ্মসত্তার প্রমাণ লাভ হয়–উপলব্ধি হয় যে আত্মিকে এক আমিই আছি। মানুষ বাইরে বহু হলেও আত্মিকে এক। মনুষ্যজাতির মধ্যে ব্যপ্ত হয়ে তাঁর যে ভূমানন্দ তা হল আড় করে খাওয়া।

৩) সমষ্টিতে– ক) সমষ্টি চৈতন্য তথা নির্গুণের ঘনমূর্তি হয়ে উঠেছেন যিনি তাঁকে অন্তরে দেখে তাঁর অনুসত্তা লাভ হলে বারবার তাঁর সাথে নানাভাবে একত্বের অনুভূতি হয়-- সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সেই হল মিছরীর রুটি খাওয়া–ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করা।

ব্যক্তিগত ভাবে সমষ্টিচৈতন্যের সাথে ক্ষনিকের জন্য এক হওয়ার অনুভূতি হল সিধে করে খাওয়া আর অপর বহু মানুষের একত্বের অনুভূতি শুনে বহুত্বে আত্মিক একত্ব বোধে বোধ করা হল আড় করে মিছরীর রুটি খাওয়া।

খ)অন্য এক অর্থে সাধারণ লোকেদের জন্য মিছরীর রুটি – শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

সিধে করে খাওয়া– সোজাসাপ্টা পড়ে ঈশ্বরীয় আনন্দ লাভ।

আড় করে খাওয়া – ঠাকুরের কথার দেহতত্ত্বে ব্যাখ্যা শুনে আনন্দলাভ, ঈশ্বরীয় দর্শন ও অনুভূতি লাভ। ধর্ম ও অনুভূতি গ্রন্থের ১ম ও ২য় ভাগের সাহায্যে এই রুটি আড় করে খেতে হয়।

গ) নতুন মিছরীর রুটি – ধর্ম ও অনুভূতির ৩য় ভাগ এবং "বৈদিক সত্য ও একজন হিন্দু হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণ" নামক গ্রন্থ।

সিধে করে খাওয়া – বিশ্বব্যাপিত্বের ব্যাখ্যা পড়া ও শোনা এবং তার স্বপক্ষে অনুভূতি লাভ।

আড় করে খাওয়া – একত্বের বিষয়ে লেখাগুলি অনুধাবন ও আত্মিক একত্বের অনুভূতি লাভ এবং তা মননে আনন্দ উপভোগ।

● **ঠাকুর বললেন, "যার যেমন পুঁজি সে জিনিসের সেই রকম দাম দেয়।"**

আত্মিক শক্তির পুঁজি অনুযায়ী তিনি মানুষকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন–

জীবকটি, ঈশ্বরকটি ও অবতার। আবার তিনিই বলেছেন, চাঁদা মামা সকলকার মামা। তবে তার একথা জগতে প্রতিষ্ঠা করলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ সর্বজনীন হয়ে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের অন্তরে চিন্ময় রূপ ধরে বিচিত্র ভঙ্গিমায় ফুটে উঠে।

তিনি এক স্বপ্নে দেখেছিলেন, বাবুর বাগান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়লেন --হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় দেখছেন একজন এক ঝুড়ি কালো কালো বেগুণ বিক্রি করছে। উনি তাকে অতিক্রম করে একটু এগিয়ে গিয়ে ভাবলেন একটা বেগুণ কিনলে হত। ফিরে গিয়ে দেখেন, সব বেগুণ বিক্রি হয়ে গেছে। উনি তখন আবার হাঁটতে শুরু করলেন, একটু এগিয়ে সামনে পড়ল এক মুদির দোকান। তার পাশে একটি নতুন ঘর। তার ভিতর ওনার বন্ধু বসন্তবাবু রয়েছে। আর পিছনের সাদা দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে অক্টোগোনাল একটি ঘড়ি। স্বপ্ন শেষ।

এই স্বপ্নে জানা গেল তাঁর আত্মিক বিকাশের এক পর্বে বেগুনওয়ালা বলে কেউ থাকবে না – অর্থাৎ জীবকটি ঈশ্বরকটি ভেদ উঠে যাবে। বেগুন – নাই গুণ যার – অবস্তু। বেগুনওয়ালা – যারা পার্থিব বস্তু লাভের নিরিখে ঈশ্বরের ও ঈশ্বরীয় চর্চার মূল্যায়ণ করে। শ্রীজীবনকৃষ্ণকে যারা ভিতরে দেখবে ও অনুশীলন করবে তারা আর সেভাবে ঈশ্বরের মূল্যায়ণ করবে না। তাদের কাছে ঈশ্বর যে আর কথার কথা থাকবে না – অন্তরের ব্যথা হয়ে উঠবে। তারা আর জীবকটি থাকবে না। পরে একত্ব প্রতিষ্ঠা হলে সাধারণ মানুষও অনন্ত অফুরন্ত আত্মিক শক্তির অধিকারী হবে, প্রকৃত অর্থে তাদের জীবনে বসন্ত আসবে এবং অষ্টপ্রহর অর্থাৎ প্রতিমুহূর্তে এই আত্মিক তেজ ও একত্ব বোধ তাদের ব্যবহারিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবে (মুদির দোকান যেমন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা মেটায়)।

এই প্রসঙ্গে জীবনকৃষ্ণের বহু পূর্বের একটি স্বপ্ন স্মরণযোগ্য। তিনি দেখছেন – বিরাট অশ্বত্থ গাছ। তাতে অসংখ্য কচি কচি পাতা, ভারী সুন্দর লাগছে দেখে। মনে হচ্ছে বসন্ত এসেছে। .....

উপনিষদ্ বলছে – world tree rooted in Brahman. জগৎরূপী বৃক্ষের মূল ব্রহ্মে প্রথিত। সেই ব্রহ্মের সাথে একত্ব প্রতিষ্ঠা হলে মানুষ অফুরন্ত আত্মিক শক্তির অধিকারী হয় – তার জীবনেই প্রকৃত অর্থে বসন্ত আসে তখন তার বয়স যাই হোক না কেন। আর এ বসন্ত ক্ষণস্থায়ী নয় – এ চিরবসন্ত, চিরকল্যাণময়।

● **'এক জমিদার রেগে গিয়ে একজনকে খুব মারছিল। তখন এক সাধু জমিদারকে থামাতে গেলে জমিদারের সব রাগ গিয়ে পড়ল সাধুটির উপর। তাকে খুব করে মারলে, সে অজ্ঞান হয়ে গেল। জ্ঞান ফিরলে তাকে দুধ খাওয়ানো হল। তখন একজন জিজ্ঞেস করল, কে দুধ খাওয়াচ্ছে চিনতে পারছ? সাধুটি বলল, যিনি আমায় মেরেছিলেন তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন।'**

এখানে জ্ঞান ফেরা মানে চৈতন্য লাভ – তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা। এখন কথা হচ্ছে

সাধুটি জমিদারের হাত থেকে মার খাওয়া লোকটিকে বাঁচাতে গেল কেন? তখন তো তার মনে হওয়া উচিত ছিল যে ঈশ্বরই একরূপে ঐ লোকটিকে মারছেন, আমার বাঁচাতে যাবার দরকার কি? বাঁচাতে গেলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করা হবে।

বস্তুত জমিদারের হাতে মার খাওয়ার পরই সাধুর চৈতন্য বোধে বোধ হল। ব্যবহারিক জগতে বারবার আঘাত খাওয়া ও সেবা পাওয়া এবং দুধ খাওয়া অর্থাৎ ঈশ্বরীয় অনুভূতিতে ঈশ্বর-ই কর্তা জানা গেলে ধীরে ধীরে সাধকের বোধে বোধ হয় যে ঈশ্বরই সব করছেন।

এ বিষয়ে সখের বাজারের একজনের একটি স্বপ্ন প্রণিধানযোগ্য। উনি দেখছেন -- একবার স্বামী কর্তৃক উৎপীড়িত হবার ঘটনা স্মরণে গভীর দুঃখ অনুভব করছেন – হঠাৎ বৃহস্পতি নামে এক ভদ্রলোক এসে হাসি মুখে সামনে দাঁড়াল। তারপর হাসতে হাসতে বলল, ও সব ঘটনা তো আমিই ঘটিয়েছি। মুহুর্তে সব দুঃখ আনন্দে পরিবর্তিত হল। বৃহস্পতি– বৃহৎ যে পতি – জগৎস্বামী – শ্রীভগবান।

রবীন্দ্রনাথের গানে আছে –

"আরো বেদনা আরো বেদনা
প্রভু দাও মোরে আরও চেতনা।"

এই বেদনার সাথে সাথে ঈশ্বরীয় দর্শন ও অনুভূতি হলে তবে পূর্ণ চেতনা লাভ হয়।

● **''ভগবান বিষ্ণুর বাবার একটা গাধা ছিল। সেটি পাওয়া যাচ্ছিল না। বিষ্ণু খুঁজতে খুঁজতে গড়পারে এসে দেখে, এই তো বাবার সেই গাধা। সেই যে ঘাড়ে চাপলেন আর নামার লক্ষণ নেই।'' — শ্রীজীবনকৃষ্ণ।**

গড়পারে বিষ্ণু তার বাবার গাধা খুঁজে পেয়ে তার পিঠে চেপে বসল। ১৯০৫-এ, ১২-বছর বয়সের বালক জীবনকৃষ্ণের দেহে সচ্চিদানন্দগুরু রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকাশ পেলেন। তিনি প্রায় রাত্রেই স্বপ্নে দর্শন করতেন ঠাকুর তাঁকে কাঁধে ও পিঠে নিয়ে কলকাতা শহর ঘুরে বেড়াচ্ছেন – পরে গোটা পৃথিবী ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। শেষের দিকে শ্রীজীবনকৃষ্ণ ভয় পেতেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বপ্নে দেখা দিলে। বুঝতেন এতে তার ঘাড়ে দায়িত্ব চাপছে। ঋণ বাড়ছে। রামকৃষ্ণের পরিচয় জগতে জানানোর দায়িত্ব তার ঘাড়ে চাপছে। রামকৃষ্ণের পরিচয় মানে রামকৃষ্ণের জীবনে প্রকাশিত সত্যের পরিচয়, আত্মা বা জগৎব্যাপ্ত চৈতন্যের পরিচয়। বাস্তবিক চিন্ময় শরীরে বহু মানুষের অন্তরে ফুটে উঠে, তিনি ভগবান রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর মহিমা প্রকাশ করতে লাগলেন। পরবর্তীকালে ঠাকুরের অমৃতবাণীর মর্মার্থ লিখে প্রকাশও করলেন। ১৯৫৮ সালের ৪ঠা জুনের পর বিষ্ণু নামলেন ঘাড় থেকে। কিন্তু বিষ্ণুর বাবা তাঁর পিঠে চড়ে বসলেন। তাঁর চিন্ময়রূপে তখন আর মানুষ ভগবানকে দেখছেন না, দেখছেন পরমব্রহ্মকে। শেষে স্পষ্ট হল তার পরিচয়, পরমব্রহ্মও নয় তিনি পরম একের মহিমার ধারক ও বাহক। তাঁর রূপে মানুষ দর্শন করছে আদি পুরুষকে, ভগবানের বাবাকে,

ভগবানত্বের চেয়েও অনেক উচ্চ আত্মিক অবস্থার চৈতন্যকে। গাধা মানে সহজ, সরল ও নিষ্কাম মানুষ, যিনি সত্যের গুরুভার বইবার উপযুক্ত।

● **অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দর্শন।**

অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দর্শন হল ঊর্ধ্বাঙ্গ পুরুষ ও নিম্নাঙ্গ নারী দেখা। পুরুষ – আত্মা। নারী – দেহ। বস্তুতত্ত্বের সাধনে, ১ম স্তরের অনুভূতিতে শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেখেছিলেন, তার ঊর্ধ্বাঙ্গ পুরুষ কিন্তু কটিদেশ থেকে নিম্নাঙ্গ নারী হয়ে গেছে। অর্থাৎ তিনি আত্মা পুরুষ বা ব্রহ্ম (আত্মার রূপ তারই রূপ) আর তার দেহটি প্রকৃতি – সেই আত্মার আধার – ধারক ও বাহক। তার দেহের যে চিন্ময় রূপ অপরে অন্তরে দেখে তা তাদের আত্মিক সত্তার রূপ বা প্রকৃত রূপ (Real form)।

তাই ২য় স্তরে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি হিসাবে সাধারণ মানুষ দেখেন তার মাথাটা জীবনকৃষ্ণের মাথা আর ধড় তার নিজের। তিনি পুরুষ হলে ধড়টা পুরুষের, নারী হলে ধড়টা নারীর। কেননা প্রতিটি মানুষই অর্ধনারীশ্বর। তার দেহটি নারী আর তার চৈতন্যসত্তা হল পুরুষ। এ যুগে এই পুরুষ তথা চৈতন্য সত্তার রূপ হল শ্রীজীবনকৃষ্ণের রূপ।

● **''কতকগুলো কানা একটা হাতির কাছে এসে পড়েছিল। একজন বলল, এই জানোয়ারটির নাম হাতি। হাতি কেমন জিজ্ঞাসা করায় ওরা হাতির গায়ে হাত দিয়ে কেউ বলল, হাতি একটা কুলোর মত, কেউ বলল জলের জালার মত, কেউ বলল থাম্বার মত, কেউ বলল দড়ির মত। তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যেটুকু দেখেছে বা অনুভব করেছে সে মনে করেছে ঈশ্বর এমনি।''**

হাতি – মন – অখণ্ড মন – শুদ্ধ মন। শুদ্ধ মনও যা শুদ্ধ আত্মাও তা। তাই এখানে হাতি আত্মা তথা অখণ্ড চৈতন্যের প্রতীক।

আমাদের মনের অনেকখানি জগতে লিপ্ত, বিষয়ে লিপ্ত। পুরো মনটা কুড়িয়ে আনা যায় না।

১২ বছর বয়স থেকে যদি কারও মন ঈশ্বরমুখী হয়ে যায়, বিষয়জ্ঞান বা দেহজ্ঞান না জাগে তাহলে ২৫ বছর বয়সে ষোল আনা আত্মা বা ভগবান দর্শন হতে পারে, পুরো হাতিটাকে সে দেখতে পায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই অবস্থা লাভ হয়েছিল। তিনি জগতে প্রথম ভগবান দর্শন করেছিলেন। এরপর তিনি শ্রীজীবনকৃষ্ণকে হাতে ধরে হাতির কাছে নিয়ে গিয়ে হাতি দর্শন তথা ভগবান দর্শন করিয়ে দিয়েছিলেন। জগতে ২য় ভগবান দর্শনকারী ব্যক্তি হলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ।

গুরু যেন সেথো – শ্রীরামকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দগুরু হিসাবে শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহে ফুটে উঠেছিলেন।

জগন্নাথ তো ঠুঁটো – হাত ধরে নিয়ে যাবেন কি করে? এখানে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন মানে তাকে গ্রাস করছেন। জগন্নাথের ক্রিয়া চৈতন্যে, স্থূল হাত দিয়ে নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ তার দেখা হাতিটার কথা গল্প করে বলেছেন – মানুষ বুঝতে পারেনি। জীবনকৃষ্ণ মডেল দেখিয়ে হাতির কথা বলায় মানুষের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব হচ্ছে। সাধারণ মানুষ তো আর হাতির কাছে গিয়ে সম্পূর্ণ হাতি দেখতে পারবে না – সে একযুগে একজন পারে – যার বস্তুতত্ত্বে সাধন – যিনি ঊর্ধ্বরেতা পুরুষ। মডেল দেখানো মানে ২য় স্তরের অনুভূতি দান করে বোঝানো। এতে মানুষ সহজেই বুঝল যে রাম, কৃষ্ণ, কালী ইত্যাদি রূপ দর্শন আংশিক ভগবান দর্শন, যেমন ঐ হাতিকে কুলো, দড়ি, থাম্বা ইত্যাদি রূপে দেখা। চালাক লোকেরা শেষে বোঝে মডেল নয় ষোল আনা ভগবানকে দেখে ভগবানের সত্তা লাভকারী মানুষটির রূপেই তাদের রূপাতীত পূর্ণ ভগবান দর্শন তথা সত্যিকার হাতি দেখা সম্ভব। তার সত্তা পেয়ে তারাও শুদ্ধমনের অধিকারী অর্থাৎ ছোট ছোট হাতি হয়ে ওঠে। তখন তারাও অপরের ভ্রান্ত সংস্কার দূর করতে সাহায্য করে।

● ঠাকুর গল্প বললেন, একজনের পাহাড়ের উপর একটা কুঁড়ে ঘর ছিল। সেখানে একদিন ঝড় উঠল। লোকটি বলল, পবনদেবের ঘর বাবা শান্ত হও। ঝড় বাড়তে লাগল। তখন লোকটি বলল, হনুমানের ঘর বাবা শান্ত হও। ঝড়ে ঘর দুলতে লাগল। এবার সে বলল, লক্ষণের ঘর বাবা লক্ষণের ঘর। তবুও থামে না দেখে বলল, রামের ঘর বাবা রামের ঘর। শেষে ঘর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। তখন লোকটি, 'যা শালার ঘর' বলে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে এল।

ঠাকুর এই উপমায় নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। ঝড় – সময় হল। পবনদেব–মহাবায়ু। হনুমান – ভাগবতী তনু। লক্ষণ – জীবাত্মা। রাম– শুদ্ধাত্মা–নির্গুণব্রহ্ম। নির্গুণে লয় হয়ে পরে দেহজ্ঞান মুক্ত হয়ে তত্ত্বজ্ঞানে বেঁচে থাকা।

প্রথম স্তরের অনুভূতিতে ইষ্টমূর্তি দর্শন, আত্মা-সাক্ষাৎকার, পরে জড় সমাধি লাভ বা নির্গুণের অনুভূতি হলে জীবন্মুক্তি লাভ সম্ভব। তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে এসব অনুভূতি হয় না। তাহলে সেক্ষেত্রে গল্পটা কেমন হবে?

গল্পটা হবে এই রকম যে লোকটা কুঁড়ে ঘরের ভিতর ছিল, সঙ্গে ছিল একটি বন্ধু এবং তার মামা। ঝড় উঠল। তখন বন্ধুটি চলে গেল। মামা ওর হাত ধরে ঘরের বাইরে নিরাপদ স্থানে নিয়ে এল। তারপর আরও এগিয়ে এক জায়গায় বসে মামা রান্না করা মাছ খাওয়াতে লাগল।

আমাদের সাধন হয় না। সাধন হয় একযুগে একজন মানুষের – তিনি সর্বজনীন হয়ে, চাঁদামামা হয়ে বহুর অন্তরে চিন্ময়রূপে প্রকাশ পান। তখন ঝড় ওঠে – সময় হয়– বন্ধুটি ঘর থেকে চলে যায়। সাংসারিক আসক্তি কাটতে থাকে। তারপর মামা হাত ধরে তাকে ঘরের বাইরে আনেন – জীবন্মুক্ত অবস্থা দান করেন তাঁর আত্মিক সত্তা দানে, ব্রহ্মত্বদানে।

পরে মাছ রান্না খাওয়ান – অর্থাৎ আত্মিক অনুভূতি দান ও অনুশীলনের সুযোগ করে দেন। তবে ধারণা হয় যে ঈশ্বরই কর্তা আমি অকর্তা – আমি তার একত্বের এক কণা। শেষে মামা-ই পরম বন্ধু হয়ে ওঠে। বন্ধুর অভাব দূরে যায়।

● ভাগবত পণ্ডিত পাঠ শেষে রাজাকে নিত্য বলেন, রাজা বুঝেছ? রাজা বলে, আগে তুমি বোঝ।

নিজে না বুঝলে অপরকে বোঝানো যায় না, অপরে যে বুঝছে না তা তাদের আচরণ ও কথাবার্তা থেকে বোঝা যায়। বিশেষ করে রাজা বা ঐ জাতীয় লোকেদের পক্ষে ঈশ্বরত্ব বোঝা সম্ভব নয় – বুঝলে সে আর রাজ্য চালাতে পারবে না। যেমন, মথুরবাবু ঠাকুরকে ধরে বসলেন, বাবা আমাকে সমাধির আস্বাদন দাও, তোমার যেমন ভাব হয় আমাকে তেমন ভাব দান কর – আমি ঈশ্বরের ভাবে ডুবে থাকব। ঠাকুর বললেন, মথুর এসব তোমার জন্য নয়। তবুও মথুরবাবু ঠাকুরের পা ছাড়েন না, জোর করেন। ঠাকুর বললেন, বেশ, মা চাইলে হবে।

কয়েকদিন পর একদিন মথুরবাবুর ভাব হ'ল। তিনি জগন্মাতার ভাবে বিহ্বল হয়ে কাঁদতে থাকেন – মুখ চোখ লাল, কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে গেছে। জমিদারীর কোন কাজ করতে পারেন না। শেষে ঠাকুরের পা জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার ভাব তোমাকেই সাজে তুমি এ ভাব ফিরিয়ে নাও। ঠাকুর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়ায় উনি আবার স্বাভাবিক হলেন।

রাজা ভাগবত পণ্ডিত রাখেন প্রজাদের জানানোর জন্য যে তিনি খুব ধার্মিক। সাধনভজন করার জন্য নয়। আবার ভাগবত পণ্ডিত যখন ঠিকঠিক ঈশ্বরতত্ত্ব বোঝেন তখন তিনি কুটিচক হয়ে যান। তিনি আর রাজবাড়িতে ভাগবত পাঠ করতে যান না। তিনি মেয়েকে পাঠিয়ে দেন রাজাকে বলতে যে তিনি এখন বুঝেছেন। মেয়ে অর্থাৎ তার কাছে যারা ভাগবত পাঠ শিখেছে তাদের অর্থাৎ, তার উত্তরাধিকারীরা ঘোষনা করে ভাগবত পণ্ডিত এখন বুঝেছেন, তাই কুটিচক হয়েছেন।

ভাগবত পণ্ডিত ভাগবত বোঝার পর সংসার ত্যাগ করেন না, তবে নির্লিপ্ত হয়ে, আসক্তি ত্যাগ করে সংসার করেন।

● 'একজন লোক বাহ্যে থেকে ফিরে এসে বলল, গাছতলায় একটি লাল রঙের জানোয়ার দেখলাম। অপরজন বলল, আমিও সে জানোয়ারটিকে দেখেছি। সে লাল হবে কেন? সে নীল। আরেকজন বলল, আমি স্পষ্ট দেখেছি, সে লালও নয়, নীলও নয়, সে হলুদ। শেষে ঝগড়া বেঁধে গেল। তাদের ঝগড়া দেখে একজন বলল, ব্যাপার কি? সব শুনে বলল, আমি ঐ গাছতলায় থাকি। আমি ওকে ভাল করে জানি। তোমরা যা বলছ সব সত্যি। সে কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও নীল, কখনও দেখি কোন রঙই নাই'।

বাহ্যে করতে গিয়ে প্রাণীটির দেখা মিলল – ব্যাকুলতা জাগলে চিত্ত শুদ্ধ হয় ও ইষ্টমূর্তি দর্শন হয়। গাছতলার লোক – অবতার। সে কখনও লাল, কখনও নীল ইত্যাদি- কারণশরীর বা ভাগবতী তনু আত্মায় পরিবর্তিত হলে অবতারের নিরাকার আত্মা সাক্ষাৎকার হয় ও কারণশরীরের রহস্য ভেদ হয়। এক কারণশরীরই যে ইষ্টমূর্তি ও আরও নানা সংস্কারজ রূপ নিয়ে (রাম, কৃষ্ণ, কালী ইত্যাদি) দেখা দেয় সেটি বুঝতে পারেন। তিনি আরও বোঝেন যে ষষ্ঠভূমির এই সংস্কারজ ঈশ্বরীয় রূপদর্শন হল আংশিক ভগবান দর্শন। অপরপক্ষে, আত্মাদর্শন হল পূর্ণ ভগবান দর্শন।

আত্মা সাক্ষাৎকার হলে মানুষটা সব ঈশ্বরীয় রূপদর্শনকে, রঙীন গিরগিটি দর্শনকে, সত্য বলে স্বীকার করেও তার ঊর্ধ্বে সত্যের পূর্ণরূপটি জানতে পারে, গিরগিটিকে সম্পূর্ণ রূপে দেখতে পায়। এ যেন সাদা গিরগিটি দেখা।

কখনও কোন রঙই নাই – নির্গুণ আত্মা। স্থিত সমাধিতে বোধাতীত অবস্থায় যাকে লাভ করা যায়।

আত্মা সাক্ষাৎকার সাধারণ মানুষের হবে না। তাই তাদের কী করে ধারণা হবে যে বহুরূপীর একটি সত্যকার তথা পূর্ণ রূপ আছে এবং কখনও আবার তার কোন রঙ-ই নাই?

আত্মা সাক্ষাৎকারীর রূপ সর্বজনীন ও সর্বকালীন হলে বোঝা যায় ঐ রূপ নিরাকার ঈশ্বরের নিত্যসাকার রূপ। তিনি সকলের মধ্যেই আছেন – তিনি পরম এক। রামকৃষ্ণের ভাষায় স্ফটিক সাকার – তিন পুরুষে আমীর। বেদমতে সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ। আত্মাসাক্ষাৎকারী মানুষটির চিন্ময়রূপে সাধারণ মানুষ যখন আত্মা বা ভগবান বা ব্রহ্ম দর্শন করে তখন সে বুঝতে পারে সংস্কারজ ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন ঠিক ঠিক ভগবান দর্শন নয়। তখন গিরগিটিটাকে সম্পূর্ণ রূপে দেখতে পায়, সাদা গিরগিটি দেখতে পায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্থূলে সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষকে দর্শন করে বুঝলেন, ইনি ভবিষ্যতের নিত্যসাকার – রংহীন গিরগিটি –এতে ধর্মীয় সংস্কারের ও কল্পনার কোন রং নেই। প্রকৃত রঙহীন স্বচ্ছ মানে নির্গুণ। যিনি নির্গুণ আত্মার সাথে এক হয়েছেন –তিনি নির্গুণ ব্রহ্মের সাকার রূপ হয়ে যান।

ঝগড়ারত মানুষরা যারা শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এল তারা নানাবিধ ঈশ্বরীয় রূপ দেখল। বিভ্রান্তি দূর হল। উদার হল। কিন্তু তারা কেউ পূর্ণাঙ্গ গিরগিটিকে (সাদা) এবং রংহীন গিরিগিটিকে (স্বচ্ছ বা কালো) দেখেনি। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষকে ইষ্টমূর্তি দর্শন করাতে সক্ষম হলেও কারও মধ্যে আত্মা বা ভগবান রূপে জীবদ্দশায় ফুটে উঠতে পারেন নি। আবার নির্গুণের ঘনমূর্তি দর্শন করাতেও পারেন নি।

অবশ্য তাঁর সন্নিধানে যারা এসেছিলেন তারা কেউ সম্পূর্ণ গিরগিটিকে বা রংহীন গিরগিটিকে দেখতে চায়নি। তারা গিরগিটির নানা রঙ দেখেই, ইষ্টমূর্তি দেখেই তৃপ্ত হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা করে তার কথা মেনে নিয়েছিলেন মাত্র।

পরবর্তীকালে এলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। তিনি প্রকৃত নিষ্কাম ছিলেন। এমনকি ভগবানকেও

দেখতে চাননি। কিন্তু যথার্থ নিষ্কাম হওয়ায় ভগবান তাকেই নির্বাচন করলেন তার পূর্ণ প্রকাশের আধার হিসাবে।

১২ বছর ৪ মাস বয়সে এক রাত্রে স্বপ্নে সচ্চিদানন্দগুরু হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণ জেগে উঠলেন তার দেহে। নানান অনুভূতি দানের পর ২৪ বছর ৮ মাস বয়সে আত্মাসাক্ষাৎকার করিয়ে দিলেন। ৩৭ বছর বয়সে নির্গুণ আত্মার উপলব্ধি হল। রংহীন গিরগিটির সত্তায় সত্তাবান হলেন। অনেক পরে অজস্র মানুষের অন্তরে চিন্ময়রূপে ফুটে উঠে প্রথমে তাদেরকে সাদা (সব রঙই তাঁর রঙ এটি জানা) এবং এযুগে রঙহীন গিরগিটি (স্বচ্ছ বা কালো) দেখার চাহিদা মেটাতে লাগলেন। মানুষ তাকে অখণ্ডসচ্চিদানন্দ ও নির্গুণের ঘনীভূত রূপ হিসাবে দর্শন করে সংশয়মুক্ত হতে লাগল।

- **শিবরাত্রিতে শিব পূজার মর্মার্থঃ-**

শিবরাত্রিতে শিবপূজার বিশেষত্ব আছে। চার প্রহরে চার বার পূজা হয়।
১। প্রথম প্রহরে জল ও দুধ দিয়ে শিবলিঙ্গ ধুয়ে দেওয়া হয়। তখন শিবের নাম ঈশান।
২। দ্বিতীয় প্রহরে দই দিয়ে শিবলিঙ্গ ধুয়ে দেওয়া হয়। তখন শিবের নাম বামদেব।
৩। তৃতীয় প্রহরে ঘি দিয়ে শিবলিঙ্গ ধোয়া হয়। তখন শিবের নাম অঘোরনাথ।
৪। চতুর্থ প্রহরে মধু দিয়ে শিবলিঙ্গ ধোয়া হয়। তখন শিবকে বলা হয় সদ্যোজাত।

১। **জল ও দুধ দিয়ে ধোয়ানো** – এর অর্থ যোগের কথা, অনুভূতিমূলক ধর্মকথা পাঠ ও শ্রবণে দেহস্থ চৈতন্য আরও স্পষ্টতর হয়ে বোধে ধরা পড়ে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত এবং ধর্ম ও অনুভূতি পাঠ ও শ্রবণ হল জল দিয়ে দেহস্থ শিবচৈতন্যকে ধোয়ানো, মিথ্যা সংস্কারের গ্লানি থেকে মুক্ত করা।

২। **দই** হল ঈশ্বরদর্শন কারী মানুষের অমৃতবানী শ্রবণে মন অন্তর্মুখী ও সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে জেগেওঠা ঈশ্বরীয় দর্শন ও অনুভূতি। দই দিয়ে ধোয়ানো মানে নিজের ও অন্যের ঈশ্বরীয় দর্শন ও অনুভূতির মননে শিবচৈতন্যের স্পষ্টতর পরিচয় লাভ। তাঁর সর্বজনীনতার ধারণা লাভ।

৩। **ঘি** হল দুধের নির্যাস – বিশেষ জ্ঞানের অনুভূতি। সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ দর্শন ও আরও অন্যান্য দর্শন থেকে আত্মিকে শুধু একজনই আছেন, তিনি সকল প্রাণ, সকল রস ও সকল তেজের উৎস ও পরিণতি, এবং একজন মানুষের রূপে তার প্রকাশ নিজের ও অন্যের দর্শন থেকে এই বোধে উত্তরণ।

৪। **মধু** হল তূরীয় অবস্থার দর্শন ও অনুভূতি–অহংশূণ্য অবস্থায় যেসব অনুভূতি হয়। তখন জগৎ ব্যাপ্ত অখণ্ডচৈতন্যের সাথে একত্বলাভ হয় – বহুত্বে একত্বের প্রকাশ অনুভবে

আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পূর্ণতা পায়। এক চৈতন্যের সাগরে অসংখ্য মানুষরূপী চৈতন্যের ঢেউ তথা একত্বের মাধুর্য দর্শন ও অনুভবে জীবন ধন্য হয়।

এবার বিভিন্ন প্রহরে শিবের বিভিন্ন নামকরণের কারণ বিচার করা যাক।

১। প্রথম প্রহরে শিবের নাম **ঈশান** – ঈশান মানে মহাদেব। বাইরে দেবত্বের যে মহিমা শোনা যায় তার চেয়ে অধিক দেবত্বের পরিচয় লাভ হয় যখন একজন ব্রহ্মবিদ পুরুষের শ্রীমুখ নিঃসৃত অমৃতবানী তথা তাঁর উপলব্ধির কথা শোনা হয়।

২। দ্বিতীয় প্রহরে শিবের নাম **বামদেব** – বাম মানে কল্যাণ। সাধক একজন মানুষের রূপে অন্তরে যে দেবত্বের প্রকাশ দেখেন, সেই দেবরূপ সর্বজনীন, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে তিনি আছেন, নিজের ও অন্য অনেকের দর্শনের মননে এই বোধ জাগলে শিবের কল্যাণময় রূপটি ধরা পড়ে।

৩। তৃতীয় প্রহরে তিনি **অঘোরনাথ** – অঘোর মানে শান্ত – নির্বিকার – নির্ঘৃণ্য অবস্থা। আত্মিকে এক তিনিই আছেন আর কেউ নেই – মানুষের ভিতর প্রকাশ পেয়ে তিনি একথা জানিয়ে দেন। তাকে অন্তরে পেয়ে মানুষ সমদর্শী হয়, অভয়পদ লাভ করে, নির্বিকার ও শান্ত হয়ে যায়। অঘোরনাথ শিবের পরিচয় লাভ করে।

৪। চতুর্থ প্রহরে শিবের নাম **সদ্যোজাত।** সেই পরম একের (Absolute one) সাথে একত্বলাভ হলে বোঝা যায় সদ্যোজাতের ন্যায় তার দেবত্বের চরম সক্রিয়তা – তিনি সর্বদাই নব নব ভাবে নিজেকে সৃষ্টি করে চলেছেন। তাঁর সতত ক্রিয়াশীল ব্রহ্মত্ব মানুষকে প্রতিমুহূর্তে পরিচালিত করছে, বাহ্যিক ভিন্নতা সত্ত্বেও আত্মিকে বহুত্বে একত্ব উপলব্ধিতে জীবনের চরম সার্থকতা লাভের পথে।

● **"ছুঁচে মাটি মাখানো আছে, কাঁদলে মাটি ধুয়ে যাবে, তখন চুম্বক পাথরে টেনে লবে।"– শ্রীরামকৃষ্ণ।**

ছুঁচ – জীব। চুম্বক পাথর – ঈশ্বর। মাটি – দেহজ্ঞান। ছুঁচে সাধারণ মাটি মাখানো নেই, এঁটেল মাটি আছে যা শক্ত করে ধরে থাকে ছুঁচকে। অর্থাৎ দেহজ্ঞানের সাথে মিশে আছে আঁঠার ন্যায় নানা ব্যক্তিগত সংস্কার। তাই কাঁদলে এই মাটি ধুয়ে যায় না। দেহজ্ঞান কমে গিয়ে ঈশ্বরলাভ হয় না।

সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে, মানবব্রহ্মকে অন্তরে দর্শন করে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে ঈশ্বরীয় অনুশীলন করলে দেহজ্ঞান কমবে ও সংস্কার কাটবে। ক্রমে ঈশ্বরের সাথে একত্বলাভ হবে। ঈশ্বররূপ চুম্বক পাথরের সঙ্গে ঘর্ষণে ছুঁচের মাটি সরে যাবে ও চৌম্বক

আবেশ লাভ হয়ে চুম্বক সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ হবে। নতুবা সাধক ঈশ্বর মনে করে নিজের কল্পনাকে দেখবে ও সেই মিথ্যা নিয়েই জীবন কাটাবে।

যাদের বস্তুতত্ত্বে সাধন তাদের ক্ষেত্রে একটু অন্যরকম। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলেছেন, ঈশ্বরকে যে দেখা যায়, তাঁকে দেখার জন্য কাঁদতে হয় তাই তার জানা ছিল না। ঠাকুর কৃপা করে হঠাৎ একদিন গুরু রূপে ভিতরে দেখা দিলেন। তারপর ভগবান দর্শন করিয়ে দিলেন। চুম্বক পাথর ছুঁচকে টেনে নিল। কালক্রমে নিজেই চুম্বক পাথর তথা ভগবান হয়ে গেলেন। তাঁর ভগবানত্বের পরিচয় অপর কিছু মানুষের মধ্যে প্রকাশ পেল তাঁর চিন্ময় রূপ ধরে। তাদের সেইসব দর্শন ও অনুভূতি মনন করে, নিরন্তর ঈশ্বরীয় অনুশীলনে থেকে নিজের চৌম্বকত্ব তথা ব্রহ্মত্বের পূর্ণ পরিচয় লাভ করলেন।

তিনি দেখেছিলেন, তাঁর বিছানাটা ডবল হয়ে গেছে। সেই বিছানায় ৩/৪ ফোঁটা মধু পড়ে গেছে। হাত দিয়ে তা মুছতে গিয়ে পুরো বিছানার চাদরটা মধুতে আপ্লুত হয়ে গেল। মধু–চৈতন্য। মধু মোছা মানে অনুশীলন। চাদরটা মধুতে আপ্লুত হয়ে গেল—তাঁর চৈতন্য জগৎব্যাপী হ'ল।

● **মায়া কি?**

মায়া মানে ভ্রান্তি (illusion) – জগৎ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা। "আমি এই দেহ"-- এই বোধ হল মায়ার উৎসমূল (fountain head)। দেহ থেকেই নতুন দেহ সৃষ্টি হয়। মায়ার দরুণ বোধ হয় দেহসুখের সামগ্রীসমূহ আমার এবং দেহগত সম্পর্ক বা রক্তের সম্পর্ক আছে যাদের সঙ্গে সেই মানুষগুলি আমার আপনার জন, অন্যেরা পর। তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন, "নিজের লোকগুলিকে ভালবাসার নাম মায়া আর সকলকে ভালবাসার নাম দয়া।" তবে দয়াময় শ্রীভগবানকে ভিতরে না দর্শন করলে এই ভালবাসা জাগে না। Family tree বা পরিবার বৃক্ষ যে world tree বা মনুষ্যজাতিরূপ বৃহৎ বৃক্ষেরই অতি ক্ষুদ্র এক অংশ, ছোট্ট একটি উপশাখা মাত্র তা উপলব্ধি করতে পারে না মায়াবদ্ধ মানুষ।

আত্মসাক্ষাৎকার ও নানা দর্শন অনুভূতি সাপেক্ষে একজন উপলব্ধি করে, "আমি দেহ নই আমি আত্মা" – শাশ্বত এক চেতন সত্তা। তিনি মায়ামুক্ত হন। এই মুক্ত পুরুষকে অবশ্যই হতে হবে ঊর্ধ্বরেতা পুরুষ। তার দেহটি হবে নিষ্কাম। কামহীন দেহের লক্ষণ হল – তাঁর দেহ থেকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ হয়ে যাবে। তাঁর চোখে সকল রমনীই জননী এবং তিনি কারও কাছ থেকে কোন প্রকার দান গ্রহণ করতে পারবেন না।

এই মুক্ত পুরুষকে যে অন্তরে দর্শন করে তার উপলব্ধি হয় ঐ পুরুষ তার স্বরূপ (Real form)। ঠাকুর বলছেন, "আমার মধ্যে আর একজন রয়েছে, সেই সব করে।" তার গুরু, বাবা ও কর্তা বোধ লোপ পায়। সেই মুক্ত পুরুষকে আবার পরিবারের সকলে অন্তরে দর্শন করলে বোঝা যায়, সংসারটা আমার নয়, সংসারটা ভগবানের তথা ঐ সর্বজনীন মানুষটির। তখন সংসারের সকল সদস্যের প্রতি আসক্তিশূণ্য হয়ে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা

যায়। পরিবারের বাইরে অন্য অনেকেও যখন শোনায় যে তারাও ঐ মানুষটিকে বিভিন্নভাবে তাদের অন্তরে আত্মা বা স্বরূপ হিসাবে দর্শন করছে তখন ধীরে ধীরে বোধের মধ্যে আসে যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে একজনই রয়েছেন। আমরা সকলে তাঁর একত্ব অর্থাৎ তিনি একাই আছেন – সে কথা ঘোষণা করছি। আমরা সকলে যেন মনুষ্যজাতিরূপী বিরাট একটি বৃক্ষের অসংখ্য পাতা, আর ঐ মুক্ত আত্মা সর্বজনীন সর্বকালীন মানুষটি ঐ বৃক্ষের গুঁড়ি। এই ভাবে ঐ মুক্ত পুরুষটির সাথে একত্ব অনুভবে সাধারণ মানুষও মুক্তির স্বাদ পায়। আমার পরিবার, আমার জাতি, আমার সম্প্রদায়, আমার দেশের মানুষ – এই মায়াজাল ক্রমেই সংকুচিত হয় আর সকলেই স্বরূপত এক, এই শুদ্ধ চৈতন্যের (divine consciousness) বিস্তার হতে থাকে, যতই সর্বজনীন মানুষটির প্রকাশ হতে থাকে সর্বশ্রেণীর মানুষের অন্তরে। ধীরে ধীরে চেতনায় এই বোধ জাগে যে – "বসুধৈব কুটুম্বকম্", কেননা এক-ই যে বহু হয়েছে। বহু নেই – বহুরূপতাই মায়া– মিথ্যা – একই সত্য।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলছেন, "তোমরা এতগুলি বসে আছ, আমি দেখছি এক রামই এতগুলি হয়েছে।" এইটি মায়ামুক্ত পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি। জগতের মানুষ দেহাত্মবুদ্ধি নিয়ে কর্ম করে বেড়াচ্ছে – তাই বাস্তবজগৎ মায়াময়। এই মায়াময় জগতে পূর্ণ মায়ামুক্ত পুরুষের বাণী ও তাঁকে নিয়ে নানা দর্শন অনুভূতির অনুশীলনে কিছুক্ষণের জন্য হলেও জগতের সত্যরূপ দর্শন করা যায় – মায়াময় সংসারের ঘূর্ণিপাকে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

স্মৃতিকথা

অনাথনাথ মণ্ডল

১। একদিন জীবনকৃষ্ণের মুখে জানতে পারি তিনি নাকি একবার সার্কাস দলের gymnast-এর সাথে লড়ার জন্য যোগাযোগ করেছিলেন। খুব অবাক হয়েছিলাম কথাটা শুনে। তিনি সেদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "আগে আমার স্বাস্থ্য ছিল দেখবার মত। যখন parallel bar-এ উঠে exercise করতুম, তখন লোকে তা দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে যেত। মঠের ওঙ্কারানন্দ স্বামী আমার exercise দেখেছে। আমাকে কতকগুলো লোক বলেছিল সার্কাস দলের gymnast-দের সঙ্গে লড়তে। যোগাযোগ করে পরে আর লড়া হয় নি।"

২। সর্বদা আনন্দে থাকলেও কখনও কখনও তাঁর গলায় আক্ষেপের সুর শোনা যেত। একদিন উনি বলছেন, 'এই যে সুব্রতর কপালে আমাকে দেখা, কেউ কিছু বুঝতে পারে নি। এ পর্যন্ত একটা মাথা পেলুম না যে জিনিসটাকে ধরতে পারে।' যদি সুব্রত আর ঐ মহিলাটি বুঝতে পারত, সোজা ইংল্যাণ্ড থেকে এখানে চলে আসত। প্রচার? কার প্রচার? সুব্রত তখন ভাবত, যার কথা বলছি, সে তো আমার ভেতর। তখন, 'হারানিধি পাইনু বলি, হৃদয়ে লইনু তুলি, রাখিতে না সহে অবকাশ।' এই কথা বলে উনি মুহুর্মুহুঃ সমাধিস্থ হতে লাগলেন।

৩। শ্রীজীবনকৃষ্ণ মাঝে মাঝে তাঁর ইংল্যাণ্ড যাত্রা ও সেখানকার লোকেদের বিষয়ে গল্প বলতেন। একদিন বললেন, কলকাতা থেকে আমি, শিশির ঘোষ ও অপর একজন একসঙ্গে একই জাহাজে বিলাতে যাত্রা করি। শিশির ঘোষ তার বাড়ী থেকে ঘরে ভাজা গজা নিয়ে গেছিল। সুয়েজ ক্যানেলে যখন জাহাজ ঢুকল, ওদের দুজনের sea-sickness হওয়াতে আমি একাই সেই গজাগুলো খেয়ে ফেললুম। অপর ভদ্রলোক ছিলেন চন্দননগর কলেজের French-এর প্রফেসর। আমাদের জাহাজ যখন ফ্রান্সের ক্যালে বন্দরে থামল, আমরা তিনজনে বন্দরের কাছে বাজারে গিয়েছিলুম। ওখানে খুব ভাল আঙুর পাওয়া যায়। French-এর প্রফেসর ও আমি একটা দোকানে আঙুর কিনতে গেলুম। প্রফেসর French ভাষায় কথা বলছে, কিন্তু দোকানী এক বর্ণও বুঝতে পারছে না। তার French জানার দৌড় দেখে আমি শেষে purse খুলে ধরে আমাদের প্রয়োজন মত আঙুর কিনলুম।

লণ্ডনের লোকেরা খুব সৎ ও অতি সুসভ্য। একবার ওখানকার Tailoring shop থেকে একটা ব্রাউন রং-এর সুট কিনতে গিয়েছিলুম। তা Tailor আমার মাপ নিয়ে without advance-এ সুট তৈরী করে আমার বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেল।

নিতাই পাত্র

শ্রীজীবনকৃষ্ণ একদিন কথা প্রসঙ্গে জয়রামবাটির এক অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছিলেন।

বললেন – জয়রামবাটি গেছি। Gong-এ (খাওয়ার ঘণ্টা বাজতে) খেয়েছি। ১২ টায় বসেছি, সাড়ে ১২ টার ভিতর উঠেছি। লাইব্রেরী রুমে ঘণ্টাখানেক গড়িয়ে নিয়েছি। তখন সে ঘরে বাইরের লোককে বড় একটা ঢুকতে দিত না। যাইহোক সে ঘরে আমি, কিশোরী মহারাজ (প্রেসিডেণ্ট), রামময় মহারাজ, আর একজনের কি নাম বললেন – এই চারজন শুয়েছি। ঘুম থেকে উঠে আলমারি থেকে সামনে যেটা পেয়েছি, একটা বই বার করে নিয়েছি। তখন ওরা সব উঠে পড়েছে। আমি বলছি – মহারাজ, ভগবান যে দেহে প্রকাশ পান, তা তিনি আসেন কোথা থেকে? তারা বলল বাইরে থেকে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "না মহারাজ, তিনি দেহের ভেতরেই থাকেন। বলেই ও প্রসঙ্গ শেষ করে বই পড়তে লাগলাম।"

বরেন্দ্রনাথ মিত্র

১। ১৯৬৬ সালে জীবনকৃষ্ণ যখন মধুপুর যান, আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর সাথে সেখানে যাওয়ার এবং কিছুদিন কাটানোর। সে সময়কার অনেক কথাই মনে পড়ছে। ওখানে ধীরেনদা তাঁকে একদিন একটা পত্রিকা বের করার কথা বললেন। উনি সব শুনে বললেন হ্যাঁরে, বের করতে পারিস তো ভালই। তোদের অনুভূতি ছাপলে জগতের কল্যাণ হবে। আমাদের অনুভূতি লিখে রাখতে বলেছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন, আজ থেকে তোরা খাতা করবি। প্রত্যেকে পঞ্চাশটা করে অনুভূতি লিখে রাখবি।

২। একদিন ওনার সাথে এক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে একটা উঁচু জায়গা থেকে নীচে নামতে হবে। বেশ কষ্ট। তাই বললাম, আমার কাঁধে চাপুন, আমি পার করে দিচ্ছি। ঠাকুর শুনেই বললেন, কখনও না। আমার হাত ধরে অনেক কষ্টে নামলেন।

৩। মধুপুরে রামদা বাজার করতেন। রামদা অসুস্থ হওয়ায় আমি বাজারে যেতে লাগলাম। প্রায় দু মাইল হেঁটে বাজারে যেতে হত। আসার সময় টাঙ্গায় আসতুম। কিছুদিন পর আমারও জ্বর হল। সন্ধ্যায় পাঠের সময় অসুস্থতা বোধ করি। কাউকে কিছু না বলে, ঠাকুরের ঘরে না শুয়ে আমাদের ঘরে এসে শুয়ে পড়ি। সেদিন রাত্রে কিছু খাইনি। পরদিন সকালে ঠাকুর রামদাকে বললেন, দেখ্‌ত এখানে ভাল ডাক্তার আছে কিনা। তাঁকে ডাক্‌। তারপর উনি আমার কাছে বসে আমার মাথাটা ওঁর কোলের উপর তুলে নিলেন। মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। কি কষ্ট হচ্ছে না হচ্ছে জিজ্ঞাসা করলেন। ধীরে ধীরে আমি কয়েকদিনে সুস্থ হয়ে উঠলাম। ওষুধ খেতে হল না। সেদিন বুঝেছিলাম কি গভীর ভালবাসায় তিনি আমাদের কাছে রেখেছিলেন।

৪। একদিন দুই মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ঠাকুরকে ডেকে বাইরের বারান্দায় কি বলছিলেন।

তাদের কথা শুনে ঠাকুর খুব রেগে গেলেন এবং Get out বলে তাদের তাড়িয়ে দিলেন। আর কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এসে আমাকে বললেন, "টেঁপু, খালি এই কথাটা মনে রাখবি, দশ হাজার কেন, বিশ হাজার টাকা দিলেও ভুলে যাস নি"। কী ভুলে যাব, পরিষ্কার করে বললেন না।

বঙ্কিম চক্রবর্তী

১। পাঠ চলাকালীন জীবনকৃষ্ণ একদিন বললেন, মানুষ যেমন নিজেকে ঠকায় তেমনি আবার পরকেও ঠকায়। শুনবি? তবে শোন্‌। তখন আমি মঠে ও দক্ষিণেশ্বরে খুব যেতাম। মহারাজরা আমায় যে কত ভালবাসতেন তা আর কি বলব। একদিন ললিতমোহন সিংহ (যিনি হেয়ার স্কুলে অঙ্কের টিচার ছিলেন) আর আমি দক্ষিণেশ্বরে যাই। সেখানে দুজনে খুব খানিকটা ধ্যান করলাম। তারপর দুজনে আদ্যাপীঠে গেলাম। সেখানে কুমুদ আছে। সে আমার সহপাঠী ছিল। খুব ভালবাসত। আমাদের দুজনকে দেখে কুমুদেরও আনন্দের সীমা নাই। আমরা তিনজনে বেলতলার চাতালে বসে আছি। এমন সময় সিদ্ধবাবা নামে এক সাধু আমাকে দেখিয়ে বলল, 'এর কথা বলছিলাম।' কুমুদ আমায় বলল, 'সিদ্ধবাবা তোমার ধ্যান দেখে অবাক হয়ে গেছেন।' তিনি তো আমার হাত কামড়াতে লাগলেন। ইচ্ছে যে শক্তি হরণ করবেন। যাইহোক, সেদিন আর তাঁর সঙ্গে কোন কথা হল না। একদিন তাঁর সাথে শ্যামবাজারের মোড়ে দেখা। সেদিন তিনি পুরী যাবেন, তাই ব্যস্তভাব। আমি বললাম, মহারাজ আপনার ভগবান দর্শন হয়েছে? সিদ্ধবাবা তো জোরে মাথা নেড়ে হাত ঘুরিয়ে বললেন 'হ্যাঁ বাবা হয়েছে।' 'আচ্ছা, আর একদিন তোমার সাথে কথা হবে।' এরই পাঁচ-ছ মাস পরে আবার দেখা। তখন বলে, ভগবান দর্শন করলে এই আনন্দ আর সেই আনন্দ! আমি হেসে বললাম, "আপনার বেশ ভগবান দর্শন হয়েছে!" কি জানিস্‌? এ হল ব্রহ্মবিদ্যা। যেই ভগবানের নাম করা বা শোনা যাবে অমনি সমাধি হবে। কথাটা বলতে বলতেই জীবনকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন। ....লোকেনের দাদা, বৈকুণ্ঠ মহারাজকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'মহারাজ, আপনার ভগবান দর্শন হয়েছে?' তিনি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, 'না, সেরকম কিছু দর্শন হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে রূপটুপ জ্যোতিটোতি কিছু দর্শন হয়েছে। আমি টেবিলে হাত ঠুকে বললাম, 'মহারাজ আপনি সাধু হবার যোগ্য। কেননা আপনার মধ্যে প্রবঞ্চনা নাই।'

২। পাঠের সময় একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের খাওয়ার প্রসঙ্গ উঠল। একদিন তিনি বিভিন্ন ভক্ত বাড়ীতে এত খেয়েছিলেন কি করে জিজ্ঞাসা করায় জীবনকৃষ্ণ বললেন, "কেমন করে খেতেন তিনিই জানেন"। তবে শোন একটি কাহিনী। একবার গিরিশবাবুর স্ত্রী আর গনুর মা দুজনে ভীম নাগের দোকানে সরভাজা দেখে মনে করলেন, আহা ঠাকুরকে যদি খাওয়ানো যেত! তারপর যুক্তি করে দুজনে দোকান থেকে সরভাজা কিনে দক্ষিণেশ্বরে রওনা হলেন। সরভাজার ওজন হল পাঁচ পোয়া। তাঁরা তো গিয়ে দেখলেন ঠাকুর সেখানে নাই। খবর নিয়ে জানলেন মহেন্দ্র মাষ্টারের বাড়ী গেছেন। তাঁরা সরভাজা নিয়ে মা ঠাকরুনকে বারবার

করে বলে দিলেন যেন সরভাজা ঠাকুরের সেবায় দেওয়া হয়। ভুল না হয়। তারপর দুজনে মহেন্দ্র মাষ্টারের বাড়ী এসে ঠাকুরকে সমস্ত ঘটনা বললেন। ঠাকুরও ফিরে গিয়ে রাতে সেই সরভাজা আর তার সাথে এক পোয়া/ দেড় পোয়া চিনি, মিছরী কি গুড় যা হয় খেলেন। মা ঠাকরুনও ভয় পেয়েছিলেন পাছে ঠাকুর পেট ছাড়েন। যা হোক, তাঁর কিছু হয় নি।

৩। "মহাপ্রভুর কি স্ত্রীলোক ভক্ত ছিল না?" – জীবনকৃষ্ণকে একজন এই প্রশ্ন করায় তিনি বললেন, স্ত্রীলোক নিয়ে মহাপ্রভুর একটা গল্প শোন। মহাপ্রভু যতদিন পুরীতে ছিলেন, ততদিন প্রতি বছর বাংলা থেকে রথের সময় বহু ভক্ত যেতেন তাঁকে দর্শন করতে। নবদ্বীপের মধুখুড়ো নামে এক ময়রা একবার তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে পুরীতে গেল। মহাপ্রভু তাঁকে খুড়ো বলতেন। মহাপ্রভু তো তাঁকে খুব মেলানি দিলেন। তখন মহাপ্রভুর কাছে মধু খুড়ো প্রার্থনা জানালেন খুড়িটিও যেন তাঁর দর্শন পায়। একথা শুনে মহাপ্রভু পার্ষদদের বলে দিলেন, 'মধু খুড়োকে বলে দাও, খুড়িটি যেন না আসে।'

দিলীপ কুমার ঘোষ

শ্রীজীবনকৃষ্ণ একদিন বললেন, শ্রীকৃষ্ণ বলে ভারতে কেউ ছিল না। সে সম্পর্কে কোন historical reference পাই না। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম ভাগবতে ভাগবতকার ভগবানত্ব সম্বন্ধে যা বলেছে তার মধ্যে সত্য আছে তো? জীবনকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, কবিরা ভাবে (ভাবাবস্থায়) ওরকম লেখে। Wordsworth লিখল,

O cuckoo shall I call thee Bird,
Or a wandering voice?

অর্থাৎ তুমি কি পাখি, না একটা স্বর। পাখির একটা রূপ হল – সে পাখি, আরেকটা রূপ হল – একটি নাদ মাত্র। যার আত্মাসাক্ষাৎকার হয়েছে, বিশ্বরূপ দর্শন হয়েছে, আবার বীজবৎ-এর অনুভূতি হয়েছে, শেষে নাদভেদ হয়েছে, কেবল সে-ই বলতে পারে একথা। তবে কি Wordsworth–এর এসব হয়েছিল? না, কখনই না। কবিরা ভাবে ওরকম দু-একটা কথা লেখে।।

ভূমিকা

ঠাকুর বললেন, 'যার নিজের মান সম্পর্কে হুঁশ হয়েছে সে-ই মানুষ।' মান মানে ওজন। নিজের ওজন কি করে জানব? উদ্ভিদের ওজন মাপার সময় আমরা শুষ্ক ওজন নিই। প্রথমে তাকে ওভেনে (oven) শুকিয়ে নিয়ে তারপর ওজন করা হয়। তেমনি বিষয়-জল দেহ থেকে বেরিয়ে গেলে তবে নিজের শুষ্ক ওজন পাওয়া যাবে। আত্মিকস্ফুরণ ও তার সঠিক অনুশীলনে বিষয়-জল বেরিয়ে যায়। নিজের স্বরূপ আত্মাকে দেখা যায়। এই আত্মার ওজন মাপার ক্রিয়া শুরু হয় যখন ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট কাটে ও স্থান ও কালের নাশ হয়। স্থান নাশের অনুভূতি হল, স্বপ্নে কোন নতুন জায়গা দেখা, পরে বাস্তবে ঐ স্থানে গিয়ে দেখা যে, স্বপ্নে যা দেখা গিয়েছিল বাস্তবে তা হুবহু মিলে যাচ্ছে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ এই ভাবে গোটা কলকাতাকে দেখলেন স্বপ্নে। বাস্তবের কলকাতার সঙ্গে যার কোন ফারাক নেই। বুঝলেন কলকাতা যেমন বাইরে তেমনি তার ভিতরেও। অর্থাৎ কলকাতার কয়েক লক্ষ মানুষের প্রাণশক্তির নির্যাস বাটখাড়া হিসাবে চাপালেন তাঁর আত্মার বিপরীতে। কিন্তু সমান হল না দাঁড়িপাল্লার দু'দিক।

তাই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান স্বপ্নে দেখে শেষে বিশ্বরূপ দর্শন করলেন। এক দর্শনে শূণ্যে উঠে উপর থেকে সমগ্র পৃথিবীকে দেখলেন। পরে বিশ্ববীজবৎ দর্শন হল। বীজ রূপে জগৎ তার ভিতরে। বুঝলেন সমগ্র মনুষ্য জাতির প্রাণের নির্যাসের ঘনীভূত রূপ হল তাঁর আত্মা। পরবর্তীকালে তার প্রমান দিল জগতের মানুষ তাঁকে স্বপ্নে সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ রূপে দেখে।

যাইহোক, বিশ্বরূপ দর্শন ও বিশ্ববীজবৎ দর্শনে স্থানের সম্পূর্ণ নাশ হয়। স্থান ও কাল ওতপ্রোত। শাড়ীর পাড়ের মত, শাড়ীর জমির উপর যেন ভিন্ন রঙের সূতোর বুনোট। কালের লয়ের অনুভূতিতে সাধক দেখেন চেনা জায়গা কিন্তু অজানা একটি ঘটনা ঘটছে। পরে বাস্তবে ঠিক সেই ঘটনা ঘটে। সাধক বোঝেন, হবে নয়, সব হয়েই আছে। জগতে তিনকাল। সাধক বর্তমান কাল, অতীত কাল ও ভবিষ্যৎ কালের বিভিন্ন ঘটনা দেখতে পান নিজের দর্শনে। উপলব্ধি হয় তিনকাল নেই– আছে এককাল–চিরন্তন বর্তমান।

কালের নাশ হলে মানুষের সঙ্গে তার কাল ব্যবধান থাকে না। তিনি সর্বকালীন হন। কেউ তাঁকে শিশু রূপে অন্তরে দ্যাখেন, আবার প্রাচীন পুরুষরূপে দেখেন, কখনও বা বন্ধুরূপে দেখেন। স্থানের নাশ হলে সবার সাথে স্থান ব্যবধান ঘুচে যায় - তিনি সর্বজনীন হন। অসংখ্য মানুষ তাঁকে ভিতরে দেখে তাঁর সর্বজনীনতার প্রমান দেয়। স্থান ও কালের লয় হওয়ায় সাধক নিজের সর্বজনীন ও সর্বকালীন আত্মিক সত্তাকে জানতে পারেন। আত্মার প্রকৃত ওজন জানতে পারেন।

তাঁর আত্মার অসীম ভার অপর সকল মানুষের স্থান কালের পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়

(causes space time bending) তাদের জীবন তাঁকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় তাদের অজান্তেই। আইনস্টাইন বলেছেন মহাবিশ্ব যেন এক রাবারের পাতলা চাদর। সেখানে নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ সকল রয়েছে নানা আকৃতির ও ভরের বলের মত। বলগুলির ভর অনুযায়ী রাবারের চাদরে ছোট বড় গর্তের মত জায়গা তৈরী হয়। বেশি ভরের বস্তু অবতল ক্ষেত্র (depressed area) তৈরী করে, ফলে পাশের ছোট ওজনের বস্তু তার চারপাশে ঘুরতে থাকে।

আত্মিক জগতেও এই নিয়ম খাটে। তাই আত্মাসাক্ষাৎকারীকে অন্তরে দর্শন করে তাঁর সাথে একত্ব লাভ হলে সাধারণ মানুষেরও স্থানের নাশ হয় ও পরস্পরের আত্মীয় হয়ে ওঠে আর তাদের কালের লয় হওয়ায় তারা কালাতীত তথা মৃত্যুঞ্জয় সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে।

যে মানুষ তার আত্মার মান জেনেছেন তিনি মান-হুঁশ তথা মানুষ হয়েছেন - তিনি সর্বজনীন ও সর্বকালীন মানব হয়ে ওঠেন। তাঁকে অন্তরে দর্শন করে অপর সকল মানুষ জীবসীমা অতিক্রম করে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হতে পারে।

আমাদের সৌভাগ্য আমরা সেই মানুষকে পেয়েছি অন্তরে- নানান অনুভূতি দানে জীবের সংস্কার দূর করে তার সাথে এক করে নিচ্ছেন, মানুষ করে তুলছেন। এই উত্তরণেরই কিছু সাক্ষ্য বহন করছে বর্তমান পত্রিকা।।

২৬ কার্ত্তিক, ১৪২৩

হৃদয়কমল দল ফুটিল

● গত ৩১.০৫.২০১৬ তারিখে রাত্রে স্বপ্নে দেখছি---রিলিজিয়ান অ্যাণ্ড রিয়েলাইজেশন (বঙ্গানুবাদ) বইটি পড়ছি। একটা পাতা পড়া শেষ হতেই আমার সামনে শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহের একটা অংশ ফুটে উঠল। পরের পাতা পড়া হতেই দেহের আরেকটা অংশ ফুটে উঠল। ধীরে ধীরে পাতার পর পাতা পড়ে ফেললাম। তারপর দেখলাম, আমার সামনে স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে। বইটি যতক্ষণ খোলা ছিল ততক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। বই বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।... ঘুম ভাঙল। এই প্রথম আমি জীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখলাম। ভীষণ আনন্দ হল।

শতদল সাহা(জামবুনি), ষষ্ঠ শ্রেণী

ব্যাখ্যাঃ নতুন প্রকাশিত রিলিজিয়ান অ্যাণ্ড রিয়েলাইজেশন (বঙ্গানুবাদ) বইটি পড়লে দেহেতে ঈশ্বরের বিকাশ সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক ধারনা লাভ হবে।

● আমার স্বামী জীবনকৃষ্ণের ভক্ত। কিন্তু আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখিনি বলে অত বিশ্বাস নেই। কিন্তু গত ২৪শে মে রাত্রের স্বপ্নটা আমাকে খুব অবাক করেছে। দেখছি - একটা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছি। আমার পাশে ব্রুসলীর মত দেখতে একজন বলিষ্ঠ পুরুষ। দুজনের হাতেই বরফের চাঁই। নদীতে জল কম। একটা জাহাজকে অনেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পিছনে জলের স্রোত আসছে– তবে জল কম। জল বাড়ানোর জন্য আমরা দুজন বরফ ঠুকে ফাটিয়ে নদীর জলে ফেললাম। অমনি জলস্তর খুব বেড়ে গলে। আমি ডুবে গেলাম। ঐ ভদ্রলোক আমাকে টেনে তুলে পাড়ে নিয়ে এলেন।... ঘুম ভাঙল। মনে হল, আরে, ঐ ভদ্রলোক যিনি আমাকে বাঁচালেন, তার মুখটা তো ফটোতে দেখা জীবনকৃষ্ণের সাথে হুবহু এক। বেশ অবাক হলাম। কিন্তু স্বপ্নে ব্রুসলীর কথা মনে এল কেন? পাঠে গিয়ে ব্যাখ্যা শুনে তৃপ্ত হলাম।

পূজা ধীবর, অবিনাশপুর

ব্যাখ্যাঃ- জাহাজ -অহং- এর জাহাজ। একটু একটু করে সরছিল। কিন্তু জীবনকৃষ্ণকে ভিতরে পেয়ে ভক্তি থেকে জ্ঞানে উত্তীর্ন হলে (বরফ ফাটিয়ে জল বের করায়) সেই জ্ঞানের (জ্ঞান গঙ্গার) স্রোতে অহং ভেসে গেল। ব্রুসলী – কিংবদন্তী ক্যারাটেবিদ্। শ্রীজীবনকৃষ্ণ তার চিন্ময়শরীরে বহু মানুষের মধ্যে ফুটে উঠে তার আত্মিক শক্তির কসরৎ দেখাচ্ছেন। টেনে পাড়ে তুললেন – দেহ রক্ষা করলেন তাঁর লীলা দেখাবেন বলে।

● দেখছি – আমরা পুরীতে গেছি। জগন্নাথদেব দর্শনে গিয়ে ভিড়ে মা বাবার থেকে হারিয়ে গিয়ে ভুল পথে হাঁটতে হাঁটতে সূর্যদেবের মন্দিরে পৌঁছালাম। সেখানে

ভগবানকে অর্থাৎ সূর্যদেবকে প্রণাম করতে ঢুকলাম। পুরোহিতরা আমাকে প্রণাম করতে দিল না। তারা বলল, ওখানে নাকি একটা গর্ত আছে, সেখানে মাথা ঢুকিয়ে দিলে তবে প্রণাম করতে দেবে। কিন্তু গর্তটি খুবই ভয়ানক। পুরোহিতরা আমাকে মারার পরিকল্পনা করছিল। তারা এর আগেও অনেক নিরীহ মানুষের প্রাণ নিয়েছে। আমি রাজী হইনি কিন্তু তারা জোর করে আমাকে সেই ভয়ানক গর্তে মাথা ঢোকাতে বাধ্য করে। কিন্তু তখনই আশ্চর্য এক সুন্দর আলো আসে আর তারপর সূর্যদেবকে সাদা রঙের ধুতি পরে আসল চেহারায় আমি দেখতে পাই। চারদিকে আলো। ওই পাপী পুরোহিতগুলোকে বিনাশ করে আমাকে আশীর্বাদ দিলেন।.... স্বপ্ন ভাঙ্গল। এই স্বপ্নে দেখা সূর্যদেবতার সাথে শ্রীজীবনকৃষ্ণের চেহারার আশ্চর্য মিল দেখে খুব অবাক হলাম। স্বপ্নটা মনে করলেই আমার দেহ মনে অদ্ভুত এক আনন্দের শিহরণ জাগছে।

চৈতালী ভট্টাচার্য, বেহালা

ব্যাখ্যাঃ-অন্তরের অন্তঃস্থল হতে সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ আসেন। তাঁকে দেখা যায় তাঁর কৃপায়। তিনি সমস্ত ধর্মীয় কুসংস্কার (পুরোহিতদের) নাশ করেন।

● দ্রষ্টা স্বপ্ন দেখছে – সে একটা মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে একটা বৃদ্ধ এসে তাকে যেন বলছে তার কাজটা করে দিতে। এর জন্য কাউকেই সে পাচ্ছে না। বৃদ্ধ বলল, তুই পারবি ওই সূর্য থেকে একটা টুকরো ভেঙ্গে এনে দিতে ? দ্রষ্টা বলল, ওই সূর্যের কাছে যাবো কী করে? ওখানে গেলে তো সূর্যের তাপে পুড়ে মরে যাবো। বৃদ্ধ বলল, কিছু হবে না। বৃদ্ধের হাতে যে লাঠিটা ছিল তার থেকে দড়ি বেরিয়ে দ্রষ্টার কোমরে আটকে গেল এবং ওই দড়ির সাহায্যেই দ্রষ্টা উপরে উঠতে লাগল। কিছু দূর যাবার পর দ্রষ্টা চিৎকার করে বলল, আমি আর পারছি না, আমাকে নিচে নামাও। এই ভাবে সূর্যের কাছে পৌঁছাতে গিয়ে দ্রষ্টার মাথার চুল গায়ের চামড়া মাংস সব গলে গলে পড়ে গেল। সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তার যেন কোন অস্তিত্বই নেই। তার হাতের ছোট্ট লাঠিটা দিয়ে সূর্যকে বারি মারতে লাগল। অনেকক্ষণ পর সূর্যের এক টুকরো ভেঙ্গে ফেলল। টুকরোটা নিয়ে সেই বৃদ্ধকে বলতে লাগল তাকে নিচে নামানোর জন্য । নিচে আসার পর দ্রষ্টা বৃদ্ধকে সূর্যের সেই খণ্ডটুকু দিল। বৃদ্ধ খুব খুশি হয়ে বলল এইটা এনে খুব উপকার করলি তুই। এইটা আমার আয়ু, বেঁচে থাকার শক্তি। দ্রষ্টা তার শরীরের যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, তার যেন কোন অস্তিত্বই নেই। সে বৃদ্ধের পা ধরে বলছে তার শরীরটা আগের মতো করে দিতে । তখন বৃদ্ধ তার হাতের লাঠিটা দ্রষ্টার গায়ে ঠেকাতেই দ্রষ্টা আবার নিজের শরীর ফিরে পেল। এরপর দ্রষ্টা বৃদ্ধকে বলল, তোমার এত বড় একটা কাজ করে দিলাম আমাকে কিছু দেবে না? বৃদ্ধ বলল, আমি তো তোর সাথে সব সময় আছি, আবার কী চাই? যা বাড়ি চলে যা। দ্রষ্টা বৃদ্ধের সাথে গল্প করবে বলে পকেট থেকে খাবার বার করে যেই পিছনে ঘুরেছে তখন আর কাউকে দেখতে পেল না। ... ঘুম ভাঙল। বোধ হ'ল স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ শ্রীজীবনকৃষ্ণ।

কুনাল মণ্ডল, কাঠডাঙ্গা, কলকাতা

ব্যাখ্যাঃ-শ্রীজীবনকৃষ্ণ আত্মিকে সূর্যসম পরম এক। মানুষ তাঁর একত্বের এক কণা – তাঁর সাথে ওতপ্রোত। সেটা উপলব্ধি করাচ্ছেন। তারপর মানুষ তাদের উপলব্ধির কথা তাঁকে জানালে, তিনি যে শাশ্বতপুরুষ তা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।

● দেখছি – জীবনকৃষ্ণের ফটো সামনে রেখে প্রার্থনা করছি মনে মনে। সামনে পরীক্ষা। মনে মনে বলছি, ঠাকুর দেখো। ফটোতে জীবনকৃষ্ণের রূপটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ সেখানে এক মহিলার ছবি ফুটে উঠল। ভাবছি – ইনি কী করে জীবনকৃষ্ণ হবেন? তখন আর একজন মহিলা সেখানে এলেন। তিনি ফটোর মহিলাকে দেখিয়ে বললেন, ইনিই জীবনকৃষ্ণ।... ঘুম ভাঙল।

সায়েরী রাউত, বেহালা

ব্যাখ্যাঃ- মহিলার ছবি– শ্রীজীবনকৃষ্ণ যে জগৎচৈতন্য, তাই তাঁকে নারী রূপে দেখলেন দ্রষ্টা। জগতের অন্য মানুষ প্রমাণ দিলে বোঝা যায় যে তিনি জগৎচৈতন্য

● গত ৩১.১১.২০১৬ তারিখ বৃহস্পতিবার দুপুর বেলা স্বপ্ন দেখছি– মনে হচ্ছে একটা ফাঁকা ডাঙায় কোন একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আমি অংশগ্রহণ করেছি সেখানে। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছি। পুরস্কার আনতে গিয়ে দেখছি মেডেল (Medal) হিসাবে Religion and Realisation বইটি এবং স্মারক হিসাবে শ্রীজীবনকৃষ্ণের একটি ছবি আমাকে দেওয়া হ'ল। খুব আনন্দ হ'ল।

স্বপ্নে ঘুম ভাঙল। দেখছি বরুণ দাদুর ঘরে চৌকিতে বরুন দাদু এবং স্নেহময়দা দু'জনে বসে আছেন আর আমি স্বপ্নটি বলছি। পুরো স্বপ্নটা বললাম কিন্তু প্রতিযোগিতার বিষয়টি কী, সেটা পরিষ্কার করে বলতে পারলাম না। একথা শুনে স্নেহময়দা বললেন, প্রতিযোগিতার বিষয়টা কী সেটাও তো বুঝতে হবে। এই প্রতিযোগিতা কীসের প্রতিযোগিতা সেটা না বুঝলে কী করে হবে?...

এবার সত্যি সত্যিই ঘুম ভেঙে গেল।।

মনোজ গায়েন, সুলতানপুর, বীরভূম

ব্যাখ্যাঃ- ফটো ও বই– শ্রীজীবনকৃষ্ণকে নিয়ে দর্শনের অনুধ্যান ও Religion & Realisation গ্রন্থটি অনুশীলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবেন দ্রষ্টা।

প্রতিযোগিতা– এই সত্যকার আধ্যাত্মিক চর্চার যোগ্যতা মানে পৌঁছবার পরীক্ষা। ভোগমুখী মনকে হারিয়ে দ্রষ্টার যোগমুখী মনের জয় লাভ।।

স্বপন মাধুরী

হালদার পুকুর

● গত ২৪/০৫/২০১৬ তারিখে স্বপ্নে দেখছি – এবারের মানিকের প্রচ্ছদটা দেখতে পাচ্ছি - হালদার পুকুরের ছবি। সেটা জীবন্ত হয়ে উঠল। দেখি সত্যিকার হালদার পুকুর – তার পাড়ে ছোট বয়সের জীবনকৃষ্ণ বসে রয়েছেন। পা দোলাচ্ছেন। আর ছোট ছোট পাথর ছুঁড়ছেন পুকুরে। উনি যেন প্রতিদিন এমনটা করেন আর ভাবেন পূর্ববর্তী ধর্মের বিকাশ ও তার গুরুত্ব বিষয়ে। কিন্তু আজ উনি শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মচিন্তা নিয়ে ভাবছেন।... দেখতে দেখতে ঘুম ভেঙে গেল।

সব্যসাচী ঘোষ, চারুপল্লী

ব্যাখ্যাঃ- ছোট জীবনকৃষ্ণ – জীবনকৃষ্ণের নতুন বিকাশ।
তিনি ভাবছেন পূর্ববর্তী ধর্মের বিকাশ নিয়ে, পাথর ছুঁড়ছেন – তিনি ভাবছেন ও ছোট ছোট অনুভূতি দান করে আমাদের ভাবাচ্ছেন।

আমরা আভাস পাচ্ছি – ভবিষ্যতে জীবনকৃষ্ণ সৃষ্ট হালদার পুকুর তথা ধর্ম ও অনুভূতির নতুন সংস্করণ হবে – যা হবে সর্বসাধারণের ব্যবহার উপযোগী অর্থাৎ সমষ্টির সাধনের ধর্মগ্রন্থ।

প্রথম হালদার পুকুর – বেদ – সেখানে ব্যষ্টি ও বিশ্বব্যাপিত্বের আভাস।

দ্বিতীয় হালদার পুকুর – শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত – ব্যষ্টির সাধনতত্ত্ব।

তৃতীয় হালদার পুকুর – ধর্ম ও অনুভূতি গ্রন্থের ৩য় ভাগ, বিশ্বব্যাপিত্বের সাধন বিষয়ক।

ভবিষ্যৎ হালদার পুকুর – সমষ্টির ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ।

● আজ দুপুরে (১১.০৬.১৬) একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নে দেখছি – বিরাট মাকড়সার জাল – এর শেষ নেই – সেই জালের মাঝখানে মাকড়সার বদলে বসে রয়েছেন ছোট্ট জীবনকৃষ্ণ। খুব অবাক হলাম।.... ঘুম ভাঙল।

সুস্মিতা দে, বেহালা

ব্যাখ্যাঃ- মাকড়সা – ঊর্ণনাভ – ব্রহ্ম- শ্রীজীবনকৃষ্ণ। আমাদের ক্ষুদ্র জগতের গণ্ডী পেরিয়ে তাঁর জগতে ঠাঁই পাওয়াই লক্ষ্য।

● দেখছি (২৯/৮/১৬)– পুরন্দরপুর হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা প্রার্থনা লাইনে দাঁড়িয়ে গাইছে – 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে...' গানটি। এই গান শেষ হলে 'জনগণমন' শুরু হ'ল। ছেলেদের সামনে মঞ্চে দাঁড়িয়ে ওদের পরিচালনা করছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। গানটির

প্রথম স্তবক গাওয়ার পর পরের স্তবকগুলি শ্রীজীবনকৃষ্ণ আগে গাইছেন, পরে ছাত্রছাত্রীরা গাইছে। আমি দূরে দাঁড়িয়ে শুনছি– পাশে অরুপদা।

অভিজিৎ রায়, ইলামবাজার, বীরভূম

ব্যাখ্যাঃ- জাতীয় সঙ্গীতের ২য় স্তবক থেকে ঈশ্বরের কথা আরও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

বৃহৎ নৌকা

● দেখছি– আমার কোলে আমার সন্তানকে নিয়ে একটা নৌকা করে চলেছি জলের উপর দিয়ে। হঠাৎ দেখি পাশ দিয়ে বিরাট জীবনকৃষ্ণ জলের উপর হেঁটে চলেছেন। ছেলেটা বলল, মা, আমরা ঐ নৌকায় চাপব না? আমি বললাম, হ্যাঁ ঐ নৌকায় (জীবনকৃষ্ণকেই নৌকা বলছি) চড়ব।

স্বস্তিকা চ্যাটার্জী, চারুপল্লী, বীরভূম

ব্যাখ্যাঃ- সন্তান – আত্মা সন্তান – ব্যষ্টি চৈতন্য। জীবনকৃষ্ণ সমষ্টিচৈতন্য। ব্যষ্টি চৈতন্য সমষ্টিচৈতন্যে লীন হলে ভবসমুদ্র পারাপারে কোন চিন্তা থাকে না।

● দেখছি (২/৬/২০১৬)– দোতলায় আছি। নীচে একতলায় তাকিয়ে দেখি ওখানে জীবনকৃষ্ণ রয়েছেন। একটু আগে ঝড়ে ঘরে যেন অনেক নোংরা, খড়কুটো ঢুকে গেছে। উনি হাতে করে ঐ খড়কুটো তুলে পরিস্কার করছেন ঘরটা। হঠাৎ দেখি আমারই একটা সত্তা, ছোট্ট শোভন ওপর থেকে নেমে এল, ঐ ঘরে ঢুকল, জীবনকৃষ্ণের পিছু পিছু খড়কুটো কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। .... স্বপ্ন ভাঙ্গল।

শোভন ধীবর, অবিনাশপুর, বীরভূম

ব্যাখ্যাঃ- ঝড় – সংসারে মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে। দেহে গ্লানি জমে। শ্রীভগবান তা পরিস্কার করে দেন। তবে আমাদেরও সামান্য হলেও ঘর পরিস্কার অর্থাৎ গ্লানিমুক্ত করার কাজে ভূমিকা থাকে। তা হল স্বপ্নদর্শন গুলি অনুশীলন করা ও বিশেষ জীবনযাপন করা।

● গত রাত্রে জীবনকৃষ্ণকে বিশেষভাবে স্মরণ করে শুয়েছিলাম। ভোর রাত্রে স্বপ্ন দেখছি– আমাদের বাড়িতে বোলপুরের জয়কৃষ্ণ এসেছে। খালি গায়ে ধুতি পরে বসে আমাদের কথামৃত পাঠ করে শোনাচ্ছে। খুব স্পষ্ট দেখলাম।... ঘুম ভাঙল। বেশ আনন্দ হল।

সুমিতা বিশ্বাস, সখেরবাজার

ব্যাখ্যাঃ- এই স্বপ্নে দ্রষ্টার জীবনকৃষ্ণের অমৃতকথা বিশেষ ভাবে জানা শুরু হ'ল। তাই এতো আনন্দ।

সেজে নাও

● দেখছি – একটা ছোট মেয়ের বিয়ে। কিন্তু তাকে সাজানো হচ্ছে না। বর

এলো। বেশ স্মার্ট। দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখি বর স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ। বর এসে গেছে দেখে কনে কাঁদতে লাগল ওর এখনও সাজ গোজ করা হয়নি বলে। সাজা সম্পূর্ণ না হলে তো বিয়ে হবে না। কী করা যায়। তখন জীবনকৃষ্ণ আমায় বললেন, আমার সাজার জিনিসটা দেখি। আমি তাড়াতাড়ি ওনাকে আমার 'ধর্ম ও অনুভূতি' বইটা দিলাম। উনি সেটা নিয়ে গিয়ে কনের হাতে দিয়ে বললেন, 'এবার এটা নিয়ে সেজে নাও'।.. ঘুম ভাঙল।

আরাধনা চ্যাটার্জী, বেলঘরিয়া, কোলকাতা

ব্যাখ্যাঃ- যুবক বর – জীবনকৃষ্ণের নতুন বিকাশ। 'ধর্ম ও অনুভূতি' অনুশীলনে দেহ ও মন পবিত্র হয় – ধারণাশক্তি বাড়ে। কনে রূপে সেজে ওঠা হয় – ঈশ্বর রূপ বরের সাথে মিলনের উপযুক্ত হয়ে পড়ে।

● গত আগষ্ট মাসে এক রাত্রে স্বপ্নে দেখছি – আমার সুতোর গুটিগুলো ছড়ানো রয়েছে। কোনটি একচল্লিশ নম্বর এর সুতো তা বুঝতে পারছি না। হঠাৎ এক অজানা ভদ্রলোক এসে একটা গুটি হাতে তুলে নিয়ে বলল, এটা একচল্লিশ নম্বরের সুতো। আমি তো অবাক। লোকটি এগিয়ে এসে সুতোটা আমার গায়ে জড়িয়ে দিল। তারপর সুতোর ভিতর যে কাঠিটি থাকে সেটি আমার মাথায় গেঁথে দিল। আমিই যেন একচল্লিশ নম্বর সুতোর গুটি।...

রেনু মুখার্জী, সখেরবাজার

ব্যাখ্যাঃ- অজানা মানুষ – ভগবান। সাধারণ মানুষকে তাঁর সাথে এক করে নিয়ে দ্বিতীয় স্তরে একচল্লিশ নম্বর সুতো করে নিচ্ছেন – ঈশ্বরত্ব দান করছেন।

পৌত্র

● আমার আশ্চর্য এক অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করছি। ৭ই জ্যৈষ্ঠ ভোরবেলা ঘুম ভাঙল। দেখি ফোনটার রিং বাজছে। ধরে দেখি মায়ের ফোন। কিন্তু ফোনের ওপ্রান্ত থেকে মা সাড়া দিচ্ছে না। স্নেহময়মামার গলা শুনতে পাচ্ছি । বোলপুরে গেছে মা। ওখানকার পাঠ শুনতে পাচ্ছি। ভাবলাম মা তাহলে আমাকে পাঠটা শোনানোর জন্য ফোন করেছে। আমি কিছুক্ষণ মন দিয়ে পাঠ শুনলাম। তারপর হঠাৎ ফোনটা কেটে গেল। রাত্রে মা ফিরলে বললাম, তুমি ফোনটা কেটে দিলে কেন? কী সুন্দর পাঠ শুনছিলাম। মা অবাক। বলল, আমি তো তোকে ফোন করিনি। তখন পাঠের কীসব কথা শুনেছি তা বললাম। মা বলল, হ্যাঁ ঐসব কথাই হচ্ছিল। কী করে এমনটা হয়?

রনিত পাল, আড়িয়াদহ, দক্ষিণেশ্বর

● স্বপ্নে দেখছি (৮.০৬.২০১৬) – শ্রীধরদার নাতি হয়েছে। আমাকে দেখে বলল, এসো এসো একটা মিষ্টি খাও। নাতি হয়েছে আনন্দের খবর। মিষ্টি খেলাম। পরদিন আবার ওদের বাড়ি যেতেই রামু অর্থাৎ শ্রীধরদার ছেলে রাম আমাকে মিষ্টি দিতে এল।

বললাম গতকাল মিষ্টি খেয়ে গেছি। তোর ছেলে হয়েছে বলে তোর বাবা খাইয়েছে। ও তবুও জোর করে মিষ্টি খাওয়াল। বললাম, তোর ছেলেকে এখনও দেখা হয়নি। বলল, ওকে আলাদা রাখা হয়েছে ওর immunity (রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা) জন্মাবে বলে। তারপর ও সকলের সাথে দেখা করবে।.. ঘুম ভাঙল।

কৃষ্ণসাধন পাল, কালীমোহনপল্লী, বোলপুর

ব্যাখ্যাঃ- শ্রীধর – সত্ত্বগুণের সকল ঐশ্বর্যধারী শ্রীরামকৃষ্ণ। রাম–এক–একত্ব স্থাপনকারী শ্রীজীবনকৃষ্ণ। এখন চৈতন্যের নতুন বিকাশের প্রস্তুতি চলছে।

দুটো বাঁশ

● দেখছি (২.০৩.২০১৬)– প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসবে বলে ঘরের সামনে দুটো বাঁশ পুঁতেছি। উদ্দেশ্য ওনার বক্তৃতা দেবার জন্য মঞ্চ গড়ব। হঠাৎ দেখি উনি এসে গেছেন। এসেই একটা বাঁশ ধরে উপরে উঠতে শুরু করলেন। এদিকে মা চা করেছে ওনার জন্য। চা আর খাওয়ানো হল না। হঠাৎ ঝড় এল। বাঁশ দুটো উড়তে শুরু করল। মোদীজী দ্বিতীয় বাঁশটাকেও ধরে ফেললেন। তারপর দুটো বাঁশকে ধরেই উড়তে লাগলেন। আমি পিছু পিছু ছুটছি। শক্তিপুর গ্রামে এসে (আমার জন্মস্থান) উনি নিচে নেমে পড়লেন। আমি ওনাকে লুফে নিলাম। তারপর মাটিতে নামালাম। উনি বললেন, নির্মলের বাড়ি যাব। আমি ওর বাড়িটা কোথায় মনে করতে পারছি না। তখন হঠাৎ ওর ভাই বিনয়কে দেখতে পেলাম। ওকে বললাম, নির্মলের বাড়িটা দেখিয়ে দাও। ও দেখিয়ে দিল। নির্মলের বাড়ি গিয়ে নরেন্দ্র মোদি চা খেতে চাইল। আমি বললাম, মা তো চা করেছিল আপনার জন্য। আপনি খেলেন না।.. ঘুম ভাঙল।

রুদ্রনাথ দত্ত, গড়গড়িয়া

ব্যাখ্যাঃ- দুটো বাঁশ – দুটো অবলম্বন। (১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত এবং (২) ধর্ম ও অনুভূতি (৩য় ভাগ)। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী – ব্যষ্টির ভগবান, ব্যষ্টি চৈতন্য। উড়তে লাগল – অনুশীলন হতে লাগল। অনুশীলনের ঝড়। শক্তিপুরে নামল – সহস্রারে মন এল। যথেষ্ট আত্মিক শক্তি লাভ হল। তাই নরেন্দ্র মোদীকে ধরা গেল – ধারণা হল। বিনয়– নিরহঙ্কার অবস্থা। নির্মলের ঘর গেল– দ্রষ্টার দেহ নির্মল হল। মোদি এখন চা খেল – দ্রষ্টার আধারে ভগবান নিজের রস নিজে আস্বাদন করতে লাগলেন।।

● স্বপ্নে দেখছি – এক দাদা এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। মনে হল মাথায় ব্রেনসেলের পরিবর্তন হয়ে গেল। আবার মনে হল এর ফলে আমাকে কলকাতায় পাঠে যেতেই হবে।...

সনাতন সাহা, পাটুলি, কাটোয়া

কোরান পড়া

● স্বপ্নে দেখছি (৬.৭.১৬)– এক জায়গায় বিরাট ভোজসভার আয়োজন হয়েছে। ভিতরে ও বাইরে খাওয়ানো হচ্ছে। আমি শুধু মাত্র একটা তোয়ালে পরে ভিতরের ঘরে ভোজ খেলাম। তারপর হাত ধোয়ার জন্য জল খুঁজছি। কিন্তু কোথাও জল পাচ্ছি না। বাইরে এসে দেখি এক পাত্রে জল রয়েছে। হাত ধোয়ার জন্য ঐ জল চাওয়াতে এক মধ্যবয়স্ক ন্যাড়া মাথা, খালি গা, ধুতি পরা লোক চিৎকার করে বললেন, এতে হাত ধোয়া হবে না।এটা গরম জল। তখন বাইরের ভোজসভা থেকেও একজন জোরে বলে উঠলেন, হাত ধোওয়ার জন্য কোনও জল পাওয়া যাবে না।...

স্বপ্ন ভাঙলে বুঝলাম ন্যাড়া মাথা ভদ্রলোক স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ।

সবিতা পাল, ইলামবাজার

ব্যাখ্যাঃ- নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন প্রয়োজন। 'জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ'। ভিতরে ও বাইরে খাওয়া চলছে– অন্তরে দর্শনে ও বাইরে অনুশীলনে আনন্দের যজ্ঞ। ব্যবহারিক জগতে মন এলে আত্মিক আনন্দের রেশ কেটে যায়। ভগবান কৃপা করে ব্যবহারিক জীবনকে অনুকূল করছেন তাপ যোগাচ্ছেন, ব্রহ্মানন্দের রেশ কাটতে দিচ্ছেন না – হাত ধুতে দিচ্ছেন না।

● দেখছি (১৬.৬.১৬) – কয়েকজন বন্ধু মিলে এক জায়গায় আছি। প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে –ভিজে যাচ্ছি। সূর্যও দেখা যাচ্ছে আকাশে। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থামল। তখন দেখি আমার সাথে যারা ছিল তারা প্রত্যেকে এক একজন জীবনকৃষ্ণ। আবাক হলাম।... ঘুম ভাঙল।

অর্ণব চ্যাটার্জী, গড়গড়িয়া

ব্যাখ্যাঃ- প্রতিটি মানুষ স্বরূপত জীবনকৃষ্ণ তথা ব্রহ্ম।

● দেখছি (২১.৭.১৬) – একজন বলছে, তুই কোরান পড়বি? তাহলে তোকে বিশেষ একজনের কাছে নিয়ে যাই চল।যার কাছে নিয়ে গেল তাকে দেখে বেশ শ্রদ্ধা হচ্ছে। ওনার ঘরে প্রচুর বই। একটা বই সোনার মত চক্‌চক্ করছে। ওটা দেখতে চাইলাম। উনি বললেন, এটা কোরান শরীফ। এটা তোমাকে পড়ে শোনাই। উনি যত পড়ছেন আমি বলছি আরে এগুলোতো আমি জানি। এসব কথা তো শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকথামৃতে আছে। তখন উনি বললেন, তাহলে তো তোমার কোরান পড়া আছে। আর নতুন করে পড়ার কিছু নাই।... ঘুম ভাঙল।

সমপর্ণ চক্রবর্তী, বোলপুর

ব্যাখ্যাঃ- কোরান ভক্তিবাদের গ্রন্থ। ভক্তিবাদের সম্পূর্ণ গ্রন্থ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত।

অক্সিজেন সিলিণ্ডার

● দেখছি (৬.৮.১৬) – সব সময় ছোট একটি অক্সিজেন সিলিণ্ডারের মতো সিলিণ্ডার নিয়ে ঘুরছি। মনে হচ্ছে ওটা প্রাণ। একটা বড় হলঘরে ঢুকলাম। বিশেষ কে একজন বক্তৃতা দেবে। একজন বলল, আপনার I card (পরিচয় পত্র) আছে? বললাম না। তখন ও বলল, তাহলে তো আপনাকে এখান থেকে বেরোতে দেবে না। শুনে চম্‌কে উঠলাম।..

অরুণ ব্যানার্জী, শিমুরালী, নদীয়া

ব্যাখ্যাঃ- আত্মিক একত্বের বোধ জাগলে ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে গেলে মানুষটা ভগবৎচর্চা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না।

● দেখছি (১০.৮.১৬) – আয়নার সামনে চুল আঁচড়াতে গিয়ে চুলে আটকে যাচ্ছে চিরুনী। তখন হাত দিয়ে চুল সরিয়ে দেখি মাথায় একটা গাছ। তার একদিকে একটা নীল রঙের কলি রয়েছে আর অপর দিকে সবুজ ডাল থেকে লাল রঙের একটি ফুল ফুটেছে। দেখে অবাক হলাম। তারপর হাতে করে নেড়ে চুল দিয়ে ওটা ঢেকে দিলাম।...

দেবরঞ্জন চ্যাটার্জী, চারুপল্লী, বোলপুর

ব্যাখ্যাঃ- বিশ্বব্যাপী এক চৈতন্যের ধারণা জাগছে আর সাথে সাথে সত্যিকারের ঈশ্বরে প্রেম জাগছে।

● দেখছি (১৬.১০.১৬) একজন গরীব মহিলাকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এসেছি বাড়িতে ওকে কিছু খাওয়াব বলে। আমি তাকে খিচুড়ি খাওয়াচ্ছি। চামচ দিয়ে খাওয়াতে যাচ্ছি। যেই না মহিলাটা খাবার মুখে নিল অমনি ওকে আর দেখতে পাচ্ছি না, তার জায়গায় শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দেখছি। এরকম বারবার হতে লাগল। যখন চামচ সরিয়ে নিচ্ছি তখন মহিলাটিকে দেখছি আর যখন খাবার ওর মুখে দিচ্ছি তখন দেখি জীবনকৃষ্ণ খাচ্ছেন। জীবনকৃষ্ণকে দেখে প্রচণ্ড আনন্দ হতে লাগল।...

দিশা গাঙ্গুলী, খড়গপুর

পরম পুরুষ

● দেখছি (২৬.৭.১৬)– আমি শুয়ে আছি । হঠাৎ দেখি আমার পাশে জীবনকৃষ্ণ শুয়ে আছেন। আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনি এখানে? উনি বললেন, হ্যাঁ। আমি এখানে শুলাম। তোর কি কোন অসুবিধা হচ্ছে? আমি বললাম, না, না, অসুবিধা কেন হবে? একটু পর দেখি আমি মারা গেলাম। তখন আমার দেহ থেকে একটা প্রদীপের শিখা বেরিয়ে ওনার দেহে ঢুকে গেল। ঘুম ভাঙল। মনে প্রশ্ন জাগল, কে এই জীবনকৃষ্ণ? ইনিই কি আমার ও সকলের প্রাণের উৎস পুরুষ?

গদাধর দাস, গড়গড়িয়া

● দেখছি (২৩.০৮.১৬)– সূর্যের মধ্যে একজন বসে আছে। হাঁটু মুড়ে। কিছুক্ষণ পর শুধু আউটলাইন দেখছি তার। আউট লাইনটা ধর্ম ও অনুভূতি বইয়ের প্রচ্ছদে আঁকা জীবনকৃষ্ণের মত। সূর্যের তেজ বাড়ছে। তার আলোয় পথ দেখে আমার বাবা ঘরে এলো সাইকেল নিয়ে। কে যেন বলল– এই হলো সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ।.. ঘুম ভাঙল।

সোমা ঘোষ, চারুপল্লী

ব্যাখ্যাঃ- সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ পরমব্রহ্ম হতে জীবের উৎপত্তি ও তাতেই লয়। তাঁকে অন্তরে দেখলে বাবা অর্থাৎ ব্যষ্টি চৈতন্যের বিকাশ পূর্ণতা পায়– (cycle complete হয়) ও সমষ্টি চৈতন্যের জাগরণ হয়। মানুষ ধীর হয়, শাশ্বত শান্তি পায়।

● দেখছি–উপর নিচে পরপর সাতটি পদ্ম। প্রতি দুটি পদ্মের মধ্যে একজন মানুষের দেহাংশ দেখা যাচ্ছে। উপরের পদ্মের দিকে চোখ পড়তেই দেখি (সপ্তম পদ্মটির উপর) শ্রীজীবনকৃষ্ণের মুখ। বুঝলাম জীবনকৃষ্ণই বসে আছেন। তাঁর দেহে বিভিন্ন অবস্থানে পদ্মগুলি শোভা পাচ্ছে।..

শিখা চ্যাটার্জী, ইলামবাজার

ব্যাখ্যাঃ- দেহে সপ্তভূমি বা পদ্মে সাধন হলে চৈতন্যের পূর্ণ বিকাশ হয়–আর এই চৈতন্যের স্বরূপ হলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ।

শকুন

● দেখছি – শ্মশানে একটা মৃতদেহ মাটিতে পোঁতা ছিল, দুটো শকুন কবর থেকে তুলে সেই মৃতদেহটাকে পুরো খেয়ে ফেলেছে। শুধু মাথাটা অক্ষত আছে। শকুন দুটো খুব সুন্দর দেখতে। ঠোঁট দুটো আর পা দুটো লাল রঙের।...

রুপা মাজি, আমতলা, দঃ ২৪ পরগনা

ব্যাখ্যাঃ- দুটো শকুন – দ্বৈতবাদ। কবর থেকে তুলল – দ্বৈতবাদ তথা ভক্তি প্রাথমিক ভাবে দেহ সুখে ডুবে থাকা মানুষকে আলোয় তুলে আনে। শকুন দুটো দেখতে সুন্দর.. দ্বৈতবাদ খুব মিষ্টি। মাথা অক্ষত থাকে – দেহে ঈশ্বরীয় আনন্দ ভোগ করলেও পরবর্তীকালে তার ভক্তির উন্মাদনা তথা গোঁড়ামি চিন্তার জগতে শুভ পরিবর্তন আনতে পারে না।

● আজ (২৮.১০.১৬) দুপুরে স্নেহময়ের জুলাই মাসের পাঠের কপিটা পড়ছিলাম। এক সময় চোখ বুজে এল। দর্শন শুরু হল। দেখছি একস্থানে কাঠের বেঞ্চিতে

একজন লোক বসে রয়েছে। তারপর দেখি শ্রীজীবনকৃষ্ণ রিমোট হাতে নিয়ে টিপলেন আর বেঞ্চি সমেত ঐ লোকটা ওখান থেকে উড়ে গিয়ে বিপরীত দিকে গিয়ে বসল।.. দর্শন মিলিয়ে গেল। চম্‌কে উঠলাম্।

শিপ্রা নাথ, শীলপাড়া, বেহালা

ব্যাখ্যাঃ- মানুষের আত্মিক অবস্থার পরিবর্তনের চাবিকাঠি তথা রিমোট শ্রীজীবনকৃষ্ণের হাতে।।

● স্বপ্নে দেখছি (১.১১.১৬)– রাতের আকাশে Golden Galaxy. Galaxy-টা তরঙ্গের মতো ভেসে মিলিয়ে গেল। কে যেন বলল এখন যা ইচ্ছা চাও। আমি জীবনকৃষ্ণকে দেখতে চাইলাম। হঠাৎ দেখি শ্রীজীবনকৃষ্ণের মুখমণ্ডল একটা কয়েনের মধ্যে – পরে শুধু ওনার আউটলাইন – পরে ওর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে পেলাম।...

অতনু মাইতি, কাঠডাঙ্গা, সরশুনা

ব্যাখ্যাঃ- জীবনকৃষ্ণ পূর্ণ পুরুষ – পরে রামকৃষ্ণকে দেখার তাৎপর্য হল– স্থায়ী অচঞ্চল প্রেম হলে এই পূর্ণ পুরুষকে ধারণা করা যায়।

ত্রিমাত্রিক

● এক রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম –আমার স্ত্রী যেন রিক্সা চালায়। ওর রিক্সাটা পাশে রেখে দু'জন রিক্সাওয়ালা বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছে। আমি দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হলাম। ও তো বোলপুরে থাকে। কিন্তু খড়গপুরে রিক্সা চালায় কেমন করে। আমি একটা চাকরী করি। কোন অভাব নাই। আমাকে না জানিয়ে ও এরকম অদ্ভুত কাজ করে কেন? আর ভাবতে পারছি না। রেগে গিয়ে স্ত্রীকে বললাম, তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে? চল, বাড়ি চল এক্ষুনি। লোকে দেখলে আমাকে কী বলবে! আমার কথা শুনে ও রিক্সাটা চালিয়েই বাড়ি এল।... এই স্বপ্ন দেখে এত আশ্চর্য হয়েছি যে কী বলব!

দেবকুমার ব্যানার্জী, খড়গপুর

ব্যাখ্যাঃ- খড়গপুরে—জ্ঞানখড়্গ লাভ হয় যেখানে, আত্মিক জ্ঞানের জগতে। রিক্সা যেমন তিন চাকায় ভর দিয়ে চলে তেমনি মানুষের জীবনও ত্রিমাত্রিক। দেহগত ব্যবহারিক জীবন , মানসিক প্রবৃত্তিগত জীবন ও আত্মিক জীবন নিয়ে পূর্নাঙ্গ জীবন গঠিত হয়। বোলপুরে থাকে কিন্তু খড়গপুরে রিক্সা চালায়—অনুশীলনে যুক্ত থাকার কারণে সাধারণ মানুষ জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করে। ঐ আত্মিক জ্ঞান দিয়ে তার ত্রিমাত্রিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়।

● দেখছি (২৭.০৬.২০১৬)– আমাদের তিনজনকে একটা সাপে কামড়েছে। আমাকে, কন্যাসম পাশের ফ্ল্যাটের প্রণয়ীকে, আর আমার বান্ধবী প্রিয়াশ্রীকে। সাপটাকে খুঁজছি। হঠাৎ মাথায় হাত পড়তেই অনুভব করলাম আমার মাথায় চুলের ভিতরেই সাপটা রয়েছে। তাকে টেনে বের করে মাটিতে ফেললাম। এই সময় হাতে আবার কামড়ে দিল। মনে হল, ভয়ের কিছু নাই।.. ঘুম ভাঙল। খুব অবাক হলাম।

শাশ্বতী মল্লিক, সখেরবাজার, কোলকাতা

ব্যাখ্যাঃ- দ্রষ্টা নিজে – দ্রষ্টার আত্মিক জীবন, কন্যাসম প্রণয়ী—দ্রষ্টার স্থূল দেহগত জীবন, কারন দেহ আত্মারই সৃষ্টি– কন্যা। বান্ধবী প্রিয়াশ্রী – দ্রষ্টার সাংস্কৃতিক জীবন।
এই তিন জীবন-ই শক্তি (তেজ) পায় আত্মিক জীবনের মূলে যে চৈতন্য শক্তি (কুণ্ডলিনীশক্তি-প্রতীকে সাপ), সেখান থেকে।।

দাও সবে ছেড়ে

● স্বপ্নে দেখছি (২৮.০৫.২০১৬) – বাড়িতেই আছি। ঘরে অনেকগুলি পাখি রয়েছে। সেগুলিকে ধরে খাঁচায় ভরে উপরে উঠে ব্যালকুনিতে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলাম।

অমনি ওগুলো খুব ছোটো হয়ে উড়ে গেল। এবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি নিজেকে বেশ বড় দেখাচ্ছে।... অবাক হলাম।

প্রিয়াঙ্কা দাস দালাল, গড়গড়িয়া

ব্যাখ্যাঃ- অনেক পাখি – প্রাণের নানাবিধ প্রকাশে নানাগুণের প্রকাশ। কাব্যগুণ, সঙ্গীতশিল্পগুণ, নাট্যগুণ, সাংগঠনিক গুণ ইত্যাদি।

ব্যালকুনি – মন উপরে উঠলে সংকীর্নতা মুক্ত হয়। সমষ্টির নিরিখে বিচার করলে নিজের গুন সকল অনেক ছোট বলে প্রতিভাত হয় এবং আমি শিল্পী, ডাক্তার, গায়ক, কবি, সমাজ সংস্কারক ইত্যাদি উপাধি ত্যাগ হয়ে যায়। তখন নিজের স্বরূপ জানা যায়, নিজের মহত্তম সত্তার পরিচয় লাভ হয়।

● দেখছি (৭.০৬.২০১৬) – কড়াই-এ জল ফোটাচ্ছি। ওটার মধ্যে (জলে) একটা কালো কাঁকড়া বিছে। মুখে 'প্রেম মুদিত মনসে কহ জীবনকৃষ্ণ নাম'– গানটা গাইছি। কিছুক্ষণ পর দেখি বিছেটো আর কালো নেই, সাদা ধবধবে হয়ে গেছে – তবে জীবিত। তখন দেখি নাতনি বড় হয়ে গেছে। ফোন করে ওর এক বান্ধবীকে বলছে, সাদা বিছেটা হল জীবনকৃষ্ণ। ঐ কথাটা কানে যেতেই আমি চমকে উঠলাম।.. ঘুম ভাঙল।

রীনা দাস, বোলপুর

ব্যাখ্যাঃ- কালো কাঁকড়া বিছে – দ্রষ্টার সত্তা, যখন অহং আছে।
প্রেমভরে জীবনকৃষ্ণ নামের অনুশীলনে তাপ পাচ্ছে ও ক্রমে অহং নাশ হয়ে স্বরূপ লাভ তথা জীবনকৃষ্ণের সত্তা লাভ হচ্ছে।
নাতনী – পরের প্রজন্ম। তারা সহজেই ধারণা করতে পারবে।

একত্বের ফল

● দেখছি – আমি সমুদ্রের ধারে বসে আছি। সূর্যের মধ্যে জীবনকৃষ্ণ। তাঁর সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে। হঠাৎ দেখি আমার দেহটা স্বচ্ছ (transparent) হয়ে গেছে। সূর্য রশ্মি আমার দেহ ভেদ করে গিয়ে সমুদ্রে মিশে যাচ্ছে।...

অর্পিতা চ্যাটার্জী, বেহালা

ব্যাখ্যাঃ- সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ – পরম এক।
সূর্যরশ্মি – ব্রহ্মত্ব। এই ব্রহ্মত্ব লাভ হয়ে অহংনাশ হলে একত্ব লাভ হয়। তখন তার মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মত্ব জনসমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ে।

● দেখছি - আমাদের বাড়ির নতুন তৈরী ঘরটায় (বাস্তবে হয়েছে) কিছু প্রেতাত্মা রয়েছে। মনে হল পাঠ করলে ওরা চলে যাবে। পাঠের বই নিয়ে পাঠ করতে লাগলাম। বাবাকে ঘটনাটা বললাম। বাবাও দেখল প্রেতাত্মা রয়েছে। তখন ভয় পেয়ে ছুটে নিচে নেমে এল। আর চিৎকার করে বলতে লাগল – পাঠ করতে হবে, পাঠ করতে হবে।..

পায়েল রুজ, বোলপুর

ব্যাখ্যাঃ- ভূত – পঞ্চভূতে গঠিত দেহকে যে আমি ভাবে। নতুন ঘরে প্রেতাত্মা – নিজের তৈরী ঘর দেহজ্ঞান বাড়াতে সাহায্য করে। তাই ঈশ্বর কর্তা আমি অর্কতা – এই বোধ মনের গভীরে সঞ্চারিত করার জন্য পাঠের বিশেষ প্রয়োজন।

● দেখছি – অসংখ্য আমি – খুব ছোট থেকে খুব বড়, বিভিন্ন সাইজের। একজন এত বড় যে গভীর সমুদ্রে নেমে দেখে কোমর পর্যন্ত জল। সমুদ্রের জলও যেন যথেষ্ট নয় তার ডোবার জন্য।... অবাক হলাম। ঘুম ভাঙল।

সাগর ব্যানার্জী, বোলপুর

ব্যাখ্যাঃ- নিজের একটা মহত্তম সত্তা আছে – তাকে জানতে হবে।

ক্যালিব্রেশন অনুযায়ী

● দেখছি– আমার ননদ ক্ষমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, ওকে বেশ সুন্দরী দেখাচ্ছে। ভারী সুন্দর একটা শাড়ী পরে আছে। হঠাৎ মনে হল, আরে ক্ষমা তো এমন দেখতে নয়। আর ঐ দামী শাড়ীটা ওকে কল্পনা দিয়েছে।..

বিশাখা চ্যাটার্জী, জামবুনী

ব্যাখ্যাঃ- ক্ষমা – পৃথিবী, জগৎ। ক্ষমা চলে গেল – যে জগৎ চলে গেল অর্থাৎ অতীত জীবন। খুব সুন্দরী – অতীত জীবনকে খুব সুন্দর বোধ হয়। কল্পনার দেওয়া শাড়ী – কল্পনার রঙ লাগায় অতীতকে ভাল লাগে । দ্রষ্টা বর্তমানে আরও বেশি ভগবানের কৃপা পাচ্ছে তা উপলব্ধি করতে বলছে।

● দেখছি (১.৮.১৬)– আমাদের হাসপাতালে কোন বিভাগীয় অফিসার এসেছে। বিরাট লম্বা চওড়া চেহারা। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ক্যালিব্রেশন অনুযায়ী তোমার ওজন কত জান ? আমি বললাম তা জানি না। তবে আমার ওজন ৫৪ কিলোগ্রাম ৫০০গ্রাম। উনি বিরক্ত হয়ে বললেন, ক্যালিব্রেশন (Calibration) অনুযায়ী ওজনটা তাহলে জান না? ওনার কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল।...

তরুণ ব্যানার্জী, জামবুনি, বোলপুর

ব্যাখ্যাঃ- ক্যালিব্রেশন অনুযায়ী – **আদর্শ** জীবনের সাথে সঙ্গতি রেখে **বয়স** অনুযায়ী। ওজন কত? – আত্মার মহিমা ও গুরুত্ব কতটা বুঝেছ? **আত্মিক একত্ব সম্বন্ধে কতটা ধারণা লাভ হয়েছে?** বয়স হচ্ছে। দীর্ঘদিন জীবনকৃষ্ণচর্চায় যুক্ত আছো। নিজের মান (ওজন) সম্বন্ধে যেন হুঁশ থাকে। **প্রত্যেক কথার যেন ওজন থাকে।**

ছায়ার সাথে যুদ্ধ

● দেখছি (৭/৭/১৬) – আমি একটা জঙ্গলে বেড়াতে গিয়েছি – একা। তখন বিকাল বেলা। পিছনে সূর্য। সামনে আমার লম্বা ছায়া পড়েছে। আমি ছায়াটাকে নিজের

পায়ের তলায় আনার জন্য ছোটাছুটি করতে লাগলাম। আর ছায়াটাও আমার সাথে সাথে সরে সরে যেতে লাগল। আমার খুব রাগ হল এই ভেবে যে ছায়াটা আমার নিজের অথচ আমিই তাকে কব্জা করতে পারছি না? আমি খুব রেগে এলোমেলো ছুটতে ছুটতে একটা গাছে ধাক্কা লেগে পড়ে গেলাম। পড়ার সময় দেখলাম যে আমি ছায়াটার উপরেই পড়ছি। যখন পড়লাম ছায়ার উপর, সেই মূহূর্তে হাজার সূর্যের আলোর ঝলকানি দেখা গেল। আর তারপরেও আমি নিচে পড়তে থাকলাম। ক্রমশ দেখতে পেলাম অনেক নিচে কিছু গরু চরছে। আমি প্রচণ্ড বেগে একটা গরুর উপর পড়লাম। সাথে সাথেই গরুটা শুদ্ধ আমি মাটির ভিতর সেঁদিয়ে গেলাম। শুধু মাটির উপর থাকল গরুটার একটা শিং।...

সৌম্যদীপ মণ্ডল, বোলপুর

ব্যাখ্যাঃ- ছায়া – অহং। পরম জ্যোতিস্বরূপ আত্মা দর্শন হলে অহং এর রূপান্তর ঘটে ও নিয়ন্ত্রণে থাকে। গরু – জগৎ । মাটির ভিতর ঢুকে গেল - জগৎকে ভিতরে পেয়ে অন্তর্মুখ হল। শিং – ব্যবহারিক জগতে ফোঁস করার অস্ত্র। প্রতীক দর্শনে (২য় স্তরের দর্শনে) এই তত্ত্ব জানা গেল এই স্বপ্নে।

● দেখছি (২০.০৭.১৬) একটা কাক ঘরে ঢুকল। তাকে তাড়া করে বাইরে বের করে দিয়ে দরজা লাগিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পর দেখি ও ভিজে গেছে ও দরজার নিচ দিয়ে কিভাবে আবার ঘরে ঢুকে পড়েছে। কাছে এসে আমার স্বামীকে ও আমাকে নমস্কার করল। তারপর ওর সব পালক খসিয়ে দিল। শেষে মারা গেল। অবাক হয়ে দেখতে দেখতে ঘুম ভাঙল।

স্বপ্না সিনহা, সখের বাজার

ব্যাখ্যাঃ- কাক - কাকভূশণ্ডী – অবতারবাদী। ভিজে গেছে – অধিক কৃপা পেল। পালক খসিয়ে দিল– ব্যষ্টির সাধনে অবতারবাদের জ্ঞানের অহংকার খসে পড়ল (ত্যাগ করল)। মারা গেল – রূপান্তর ঘটল। সমষ্টির ধর্ম বুঝবে।

হীনযান মহাযানের পারে

● দেখছি (১৭.৮.২০১৬)– ভোরবেলা। আলো ফুটেছে। একটা নদীর ব্রীজের উপর দিয়ে হাঁটছি। নিচ দিয়ে নদীর জল বয়ে যাচ্ছে। স্বচ্ছ জল। জলের ভিতর মাছ গুলোও দেখা যাচ্ছে। প্রকৃতি অপরূপ সাজে সজ্জিত। ধীরে ধীরে পূর্বদিকে লাল সূর্য উঠল। কী আশ্চর্য, তার লাল আলোয় সব কিছু লাল হয়ে গেল। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি আমার রঙও লাল হয়ে গেছে। নদীর জল লাল, মাছগুলো লাল। প্রকৃতিও মিষ্টি লাল আলোয় রঙীন হয়ে গেছে। দেহের ভিতর থেকে অদ্ভুত এক আনন্দ জেগে উঠে দেহ-মন আলোড়িত করল। ঘুম ভাঙল।

দীপা দাস, আবাডাঙ্গা

ব্যাখ্যাঃ- ঠাকুরের কথা– চালাক লোকের প্রার্থনা, হে গামলার রঙের অধিকারী পুরুষ, তোমার রঙে রাঙিয়ে দাও – জগৎবাসীর অন্তরাত্মার এই প্রাথর্না আজ পূর্ণ হতে চলেছে।

● দেখছি (৭.৯.১৬)– আমি আর স্নেহময়মামা দুজনে একটা রথ দেখতে গেছি। রথের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'হীনযান ও মহাযানের মধ্যে কোনটা He আর কোনটা She ?' আমি বললাম, মহাযানটা He আর হীনযানটা She. এই উত্তর শুনে মামা বললেন, এতদিন ধরে পাঠে এসেও ভুলভাল বকছে। আমি তখন বলছি, ওহ্ সরি। হীন মানে তো কিছু নাই, তাই ওটা পুরুষ হবে। সুতরাং হীনযানটা He হবে। আর মহাযানটা She হবে। বলতে বলতেই ঘুম ভাঙল। উত্তরটা ঠিক হল কিনা জানা হল না।

রণিত পাল, আড়িয়াদহ, কোলকাতা

ব্যাখ্যাঃ- হীনযান He এবং মহাযান She অর্থাৎ ব্যষ্টি চৈতন্য ও বিশ্বব্যাপিত্বের বা জগৎ চৈতন্যের কথা বলে এতদিন জানা ছিল। কিন্তু এবার ধর্মে নূতন যান– নূতন ধ্যানধারণা আসছে। জানা যাচ্ছে He বা She নেই, dualism নেই, দ্বৈতবাদ মিথ্যা - সব একের-ই প্রকাশ।।

চরৈবেতি

● ১৮.০৭.২০১৬ তারিখে স্বপ্নে দেখছি– এক জায়গায় গেছি। প্রসাদ দিচ্ছে। সবাই বলছে অপূর্ব আস্বাদ। সেখানে পরিচিত বলতে শুভাশিস ছিল। ওকে বললাম, চল প্রসাদ খাই। শুভাশিস বলল, দেখ, দেখ, কেমন গু মেশাচ্ছে ঐ প্রসাদে! একজন বলল, তাই তো এত সুন্দর টেস্ট হচ্ছে ওর। আমি নিজেও দেখলাম, প্রসাদে গু মেশানো হচ্ছে টেস্ট বাড়ানোর জন্য। তাই দেখে আমার বমি চলে এল।...

সুরজিৎ রুদ্র, বোলপুর

ব্যাখ্যাঃ- গু = অন্ধ কুসংস্কার। কুসংস্কার বশে মানুষ অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় থাকা প্রসাদও অমৃত বলে খায়।প্রকৃত প্রসাদ হল ঈশ্বরের প্রসন্নতার পরিচয় লাভ– মূলত অন্তরের দর্শনে।।

● দেখছি (১৫.০৯.২০১৬)– কে যেন আমার দু'কানে হাত দিয়ে রয়েছে। হাত সরালো, তখন কান দুটি দেখতে পেলাম। দেখি দুটি কান-ই রূপোর হয়ে গেছে। খুব অবাক হলাম।...

মনোজ গায়েন, সুলতানপুর

ব্যাখ্যাঃ- রূপোর –চৈতন্যময়। চৈতন্যের কথা শোনার উপযুক্ত হল কান।।

খবরের কাগজ

● দেখছি (০৫.০৯.২০১৬)– ছোট্ট একটা মাটির বাড়ি। শ্রী জীবনকৃষ্ণ রয়েছেন ওখানে। আমি গেছি। দেখি ওনার বেশ বয়স হয়েছে। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। আমাকে খবরের কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন, নে পড়। যেন পড়ে শোনাতে হবে। তবে কোন রাজনৈতিক খবর নেই। শুধু ধর্মজগতের খবর। বর্ণালীর মতো ছোট একটি মেয়ে কাজ করে ওনার ঘরে। ওকে ইঙ্গিত করে বললেন, আমাকে চা-টা এখনও দিল না। ও আমাকে দেখছেই না। মেয়েটি ও আমি দু'জনেই ওনার কথা শুনে হেসে উঠলাম।

শ্রীধর ঘোষ, চারুপল্লী

ব্যাখ্যাঃ- খবরের কাগজ – সাম্প্রতিক খবরের উল্লেখ যেখানে থাকে। জীবনকৃষ্ণের ধর্ম - - প্রতিদিন এগিয়ে যাওয়ার ধর্ম। এই ধর্মকে বুঝতে হবে।

● শ্বশুরের শ্রাদ্ধ প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল। মা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, তুই যদি শ্রাদ্ধ করিস তাহলে তোর কী ক্ষতি হবে? আমি বললাম, 'আমার গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে।' এ কথায় মা কিছু বুঝল না। রাত্রে স্বপ্নে দেখছি– এক জায়গায় শ্রাদ্ধ হচ্ছে। সেখানে আমার মৃত বাবার ছবি রাখা আছে। তাতে মালা দেওয়া আছে। একটু এগিয়ে দেখি সেখানেও শ্রাদ্ধের আয়োজন হয়েছে – হয়তো বা বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। সেখানে বাবার ছবির সাথে সাথে আমারও ছবি সাজানো। আর আমার ছবিতেও মালা পরানো। তার সামনে আমি বসলাম। ভাবছি– এটা কী হচ্ছে? আমি জীবিত অথচ আমারও শ্রাদ্ধ হচ্ছে! ... স্বপ্ন ভাঙল।

বুঝলাম শ্রাদ্ধ করলে আমিও মৃতের দলে চলে যাব। চৈতন্য জাগ্রত থাকবে না। মনে পড়ল জীবনকৃষ্ণের কথা – মৃতের শ্রাদ্ধ মৃতরা করুক, আয় আমরা অমৃতের অনুধ্যান করি। মা স্বপ্ন শুনে বলল, এবার বুঝে গেছি।

শুভাশিস্ দাস, বোলপুর

পাঠ প্রসঙ্গে

● **শ্রীম-র একটি স্বপ্নঃ-**

কথামৃতকার শ্রীম স্বপ্ন দেখেছেন – চারিদিকে জলে জল। কতকগুলি ছোট নৌকা ভাসছে। দ্রষ্টা ও কয়েকজন একটি জাহাজে উঠেছেন। হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসে নৌকাগুলি উল্টে গিয়ে ডুবে গেল। দেখা গেল একজন ব্রাহ্মণ হেঁটে সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছেন। দ্রষ্টা বললেন, কোথায় যাচ্ছেন? উনি বললেন, ভবানীপুর। দ্রষ্টা বললেন, আপনার কষ্ট হচ্ছে না ? উনি বললেন, জলের নীচে সাঁকো আছে। তাই জলের উপর হেঁটে যেতে আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না। দ্রষ্টা বললেন, আমি আপনার সাথে যাব। ব্রাহ্মণ বললেন, তোমার জাহাজ থেকে নামতে দেরী আছে। আমার এখন তাড়া আছে। তুমি এই পথ দেখে রাখ। পরে এই পথ ধরে এসো।.....

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, তোমার স্বপ্ন শুনে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। তুমি শীঘ্র মন্ত্র লও।

ব্যাখ্যাঃ নৌকা = মানুষ গুরু। জাহাজ = সচ্চিদানন্দ গুরু। ব্রাহ্মণ = ব্রহ্মবিদ পুরুষ– শ্রীরামকৃষ্ণ। ভবানীপুর যাচ্ছি = জগন্মাতা অর্থাৎ অখণ্ড চৈতন্যে লয় হতে যাচ্ছি। তাড়া আছে = বেশীদিন দেহ থাকবে না (আর মাত্র ৪ বছর)। কিন্তু শ্রীম'র হাতে সময় আছে = এখনও তিনি অনেকদিন দেহ নিয়ে থাকবেন (প্রায় ৫০ বছর)। জাহাজ থেকে নামা = সচ্চিদানন্দ গুরু বোধ থেকে সরে এসে সচ্চিদানন্দের সাথে একাত্ম হওয়া, তাঁর জীবন ও বাণীর স্মরণ মননে তাঁর সত্তা লাভের মাধ্যমে। কষ্ট হচ্ছে না = আপনা থেকে দর্শন অনুভূতি হচ্ছে ও জোটপাট হওয়ায় ঈশ্বরীয় চর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তাই যোগযুক্ত থাকার অসুবিধা হচ্ছে না। জলের নীচে সাঁকো আছে = নির্লিপ্ত হয়ে ভবসমুদ্র পার হবার জন্য আছে অসংখ্য দর্শন অনুভূতি ও উপলব্ধির পরম্পরা যা ভিতরের জিনিস, উপর থেকে দেখা যায় না। শীঘ্র মন্ত্র লও = এখানে মন্ত্র নেওয়া মানে দীক্ষা নেওয়া নয় – তাহলে শ্রীম দীক্ষা নিতেন। শ্রীম ঠাকুরের কথার অর্থ ধরতে পেরেছিলেন। এর অর্থ তোমার উপযুক্ত আধার হয়েছে, আমার উপলব্ধির কথা মন্ত্র জ্ঞানে গ্রহণ কর। কেননা আমার আত্মিক অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা জগতের অন্য মানুষেরও উত্তরণের সহায়ক সাঁকো হিসাবে কাজ করবে।

● **সমাধির পর নতুন কথা।**

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একজায়গায় মহাপ্রভুর কথা উদ্ধৃত করে বলছেন, ভেকের আদর করতে হয়। তাই মহাপ্রভু গাধাকে ভেক পরিয়ে সাষ্টাঙ্গ দিয়েছিলেন। কথামৃত ১ম ভাগ, ২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদে দেখি, ঠাকুর সমাধি থেকে নেমে এসে একজন গেরুয়াধারীকে দেখে বলে উঠলেন, একটা কি পরলেই হলো? চণ্ডী ছেড়ে হলুম ঢাকী। আগে চণ্ডীর গান করতাম এখন ঢাক বাজাই।....

অর্থাৎ ঈশ্বর থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। গেরুয়া পরে লোককে জানাচ্ছে দেখ গো আমি সন্ন্যাসী হয়েছি– নিজের ঢাক নিজে পেটাচ্ছে – অহং এর বশবর্তী হয়ে।

ঠাকুরের জীবন থেকে প্রচলিত কথা না নিয়ে নতুন কথাগুলি নিতে হবে। সমাধি থেকে নেমে এসে সাধারণত তিনি নতুন কথা বলতেন। সমাধির মধ্যে নতুন তেজ লাভ করে ফিরতেন।

● **শ্যামপুকুরে গেলে জানতে পারবে তেলীপাড়া কোথায়।**

শ্যামপুকুর মানে সহস্রার। শ্যাম দেখা দিয়ে যদি কৃপা করে মনটিকে সহস্রারে টেনে তোলেন তবে শ্যামপুকুর যাওয়া যায়– শ্যামের ঐশ্বর্য দেখা যায়। তারপর তাকে আঁকড়ে ধরে জীবন কাটালে, কুল ত্যাগ হলে, শ্যাম-ই নিয়ে যাবে তেলী পাড়া – যেখানে তেল অর্থাৎ চৈতন্য লাভ হয়। ঈশ্বর কর্তা আমি অকর্তা বোধ হয়।

সুশীলবাবু একদিন পাঠে যাননি। পরে জীবনকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন, সুশীলবাবু আপনি পাঠে যাননি কেন? উনি বললেন, আমার নাতনীর বিয়ে ছিল। জীবনকৃষ্ণ বললেন, আপনার বিয়ে হলে মানা যেত, বড়জোর আপনার মেয়ের বিয়ে হলেও মানা যেত – কিন্তু নাতনীর বিয়ে বলে পাঠে যাওয়া হল না? আপনার এখন 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' অবস্থা। কুল ত্যাগ না করলে শ্যামকে পুরোপরি পাওয়া হবে না।

● **ঠাকুর বললেন, মহামায়ার মায়া কী দেখালে - একটা জ্যোতির্বিন্দু সারা জগৎ ঢেকে ফেললে।**

এখানে জ্যোতি মানে বাহ্য জ্ঞানের আলো যা সত্যকে ঢেকে ফেলে। এক-কে জানতে দেয় না। মানুষ সামান্য একটু বাহ্য চৈতন্য নিয়ে ভাবে জগতের সবকিছু জেনে গেছি। এই-ই মায়া। এই সবজান্তা মনোভাব আত্মিক সত্য তথা পরম একেকে জানার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

'দিনের আলোর আড়াল টানি
কোথায় ছিলে নাহি জানি
অস্তরবির ওপার থেকে চরণ বাড়ালে
আমার রাতের স্বপনে।'

বহির্মুখী মন আপনা হতে অন্তর্মুখী হলে বাহ্যচেতনা সরে যায় ও অন্তর্চেতনা জেগে ওঠে -- প্রকৃত সত্য পরিস্ফুট হয়। মানুষ মায়ামুক্ত হয়।

আবার ঠাকুরের এই দর্শনে সাধারণ মানুষের জন্য অন্য একটি বার্তা আছে। আমরা যখন পাঠে যাই, ঈশ্বরচর্চায় যুক্ত থাকি তখন মায়া সংকুচিত হয়– বিন্দুবৎ, অন্য সময় মায়া জগৎ ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। আমাদের জীবত্ব পূর্ন নাশ হয় না। দেবী অসুরদলনী, মহিষাসুরমর্দিনী রূপে প্রকাশ পান। তাই পূর্ণ মায়ামুক্ত অবস্থা হয় না। তবে ভবিষ্যতে পরম একের সাথে একত্বলাভ হলে সাময়িক কালের জন্যও মায়ামুক্ত অবস্থা হতে পারে।

● মহাপ্রভুর মতো মানুষকে খুন করা কী করে সম্ভব হল?

মহাপ্রভু যখন প্রথম পুরীতে যান তখন জগন্নাথ দর্শন করে বিহ্বল হয়ে জগন্নাথকে আলিঙ্গন করতে যান। পাণ্ডারা হৈ হৈ করে ছুটে যান তাকে মারতে। সেই সময় বাসুদেব সার্বভৌম মশায় মন্দিরে আসেন। তিনি ছুটে গিয়ে মহাপ্রভুকে জড়িয়ে ধরেন। পাণ্ডাদের হাত থেকে রক্ষা করে তাঁকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। পাণ্ডারা সার্বভৌম মশায়কে শ্রদ্ধা করত। তাই আর বাড়াবাড়ি করেনি। আশ্চর্যের বিষয় সার্বভৌম মশায় তখন মহাপ্রভুকে চিনতেন না।

কিন্তু এই ঘটনার ২৪বছর পর মহাপ্রভু একদিন শান্তিপুর থেকে অদ্বৈত প্রভুর একটি চিঠি পেলেন। তাতে লেখা ছিল, 'আউল, বাজারে না বিকায় চাউল।' অর্থাৎ আপনার কথা জগতের মানুষ নিচ্ছে না। এই চিঠি পড়ে মহাপ্রভু অত্যন্ত হতাশ হন ও চুপ হয়ে যান। কারও সঙ্গে বাক্যালাপ করতেন না। এই সময় ব্যর্থতার জ্বালায় পীড়িত হয়ে হয়ত বা তিনি মনে মনে ঠিক করেন যে দেহ ছেড়ে দেবেন।

এদিকে তিনি পাণ্ডাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন। খবর এল রাজা প্রতাপ রুদ্রের যুদ্ধ করে দেশে ফিরতে দুদিন দেরী হবে। এই সময় পাণ্ডারা তাকে খুন করে। চরম হতাশা গ্রাস করায় তার আত্মিক শক্তি নিস্তেজ হয়েছিল। তিনি দেহ ছাড়বেন মনস্থ করায় জোট পাট হ'ল অন্যরকম। তাই তাকে খুন করা সম্ভব হ'ল।

মহাভারতে আমরা দেখি দ্রোণাচার্য অবধ্য। অর্জুন তাকে হারাতে পারছে না। ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রোণকে বধ করার জন্যই যার জন্ম, সেও কিছু করতে পারছে না। কৃষ্ণের পরামর্শে যুধিষ্টির বলল, 'অশ্বত্থামা হত'। অমনি দ্রোণাচার্য পুত্রশোকে অধীর হয়ে অস্ত্রত্যাগ করে রথে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন গিয়ে তার মস্তক ছেদন করল। শোকে মুহ্যমান হওয়ায় তিনি শক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাকে মারা সম্ভব হয়েছিল।

ঠিক তেমনি চূড়ান্ত হতাশা মহাপ্রভুকে গ্রাস করায় ও মনে মনে দেহ ছেড়ে দেবার ইচ্ছা পোষণ করায় তাকে খুন করা সম্ভব হয়েছিল – অন্যথায় তা ছিল অসম্ভব।

একথা পাঠে বলার সময় (০২/০৭/২০১৬) জয়ন্তী দাসের দর্শন হল – এক বাটি ভর্তি সুন্দর পায়েস। সেখান থেকে একটু খানি মাটিতে পড়ে গেল, অমনি তা শুকিয়ে জগন্নাথের আট্‌কে প্রসাদের মত হয়ে গেল। জগন্নাথের আট্‌কে প্রসাদ চৈতন্যলীলা তথা অপার্থিব ঈশ্বর প্রেমের, রাগানুগা ভক্তির স্মারক। তিনি খুন হলেও তাঁর মহিমা কিছু মাত্র ক্ষুন্ন হয়নি। তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের যে বিশেষ প্রকাশ হয়েছিল তা স্মরণে আজও আমাদের পরাভক্তির আস্বাদন লাভ হয়। তাই টাটকা এক বাটি পরমান্ন পাওয়া গেল যা স্বরূপত আট্‌কে প্রসাদ।

● মন , বুদ্ধি চিত্ত ও অহংকার।

চিত্ত মানে হৃদয়াবেগ। রামকৃষ্ণ বলছেন, কারও কষ্ট দেখলে ভিতর থেকে যে 'আহা' বলে সেটা চিত্ত।

এই আবেগ বাদ দিয়ে মননশীলতা যখন চলছে তখন সেটা মনের ক্রিয়া।

মননশীলতায় মস্তিষ্কের বুদ্ধির ক্রিয়া যখন প্রাধান্য পাচ্ছে অর্থাৎ যা সকলে ভাবতে পারে না তখন মন না বলে বুদ্ধির ক্রিয়া বলি।

আবার মনকে যখন অহংকার চালিত করছে – মনের স্বাভাবিক গতি থাকছে না – তখন বলি অহংকারের ক্রিয়া।

চিত্ত, বুদ্ধি ও অহংকারের সাথেও মন যুক্ত থাকে কিন্তু মনের স্বাভাবিক ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। মন তখন চিত্ত, বা বুদ্ধি বা অহংকার দ্বারা চালিত হয়। কিন্তু আত্মা সাক্ষাৎকার করে অহংশূন্য হলে মন শুদ্ধমন হয়।তখনকার কথায় ঠাকুর বলেছেন, শুদ্ধমনও যা শুদ্ধবুদ্ধিও তা, শুদ্ধআত্মাও তা।

● দীর্ঘ সময় পর একটি স্বপ্নের নতুন অর্থ উপলব্ধি

শ্রীজীবনকৃষ্ণের সঙ্গ ধন্য শ্রীজিতেন চ্যাটার্জী শ্রীনিকেতন থেকে চলে যাবার পর এক স্বপ্নে স্নেহময় গাঙ্গুলী দেখেছিলেন;

এক শীতের সকাল। সকলে Hall ঘর থেকে বেরিয়ে রোদে বসছে, রোদ পোহাতে। দ্রষ্টাও বের হতে গিয়ে দেখেন ঘরের ভিতর জীবনকৃষ্ণ বসে রয়েছেন। তখন ভাবলেন, এনাকে ছেড়ে কোথায় রোদ পোহাতে যাবেন। ইনিই তো সূর্য। তখন ওনার কাছে গিয়ে বসলেন। উনি খুব খুশি হলেন। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন – 'জিতুর কথা বলবি তো বাবা?' দ্রষ্টা বললেন, 'আপনি শক্তি দিলেই বলব।'...

প্রায় ৩০ বছর পর এই স্বপ্নের মানে Flash করল। জিতুর কথা বলা মানে জিতু যা বলত (তার কথার মূল সুরটি)– তা বলবি। সেটি হল – জীবনকৃষ্ণ ক্রমাগত এগিয়ে চলেছেন। পুরোন খাপে ফেলে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা নয়, নতুন ভাবে ভাবতে হবে, স্বপ্নের মধ্যে নতুন কোন বার্তা আছে কিনা তার খোঁজ করতে হবে আমাদের।

জিতুর এই দৃষ্টিভঙ্গি, স্বপ্নের নতুন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা ও অন্য স্বপ্ন থেকে তার সমর্থন পেয়ে আত্মিক জগতে এগিয়ে চলার কথা বলতে হবে। আর তার জন্য চাই অধিক আত্মিক শক্তি। তাই দ্রষ্টা বলছেন, 'আপনি শক্তি দিলেই বলব।'

● যোগের প্রকার ভেদঃ-

যোগ মানে নির্গুনের সাথে যুক্ত হয়ে থাকা। দেহের ভিতর যে অজানা শক্তি আছে তার স্ফুরণ। যোগ আট প্রকার। যথা—

১. জ্ঞানযোগ
২. কর্মযোগ
৩. ভক্তিযোগ বা মন্ত্রযোগ
৪. লয় যোগ
৫. হট যোগ

৬. অভব যোগ
৭. রাজযোগ
৮. মহাযোগ

১. **জ্ঞানযোগ** – শাস্ত্র পাঠ ও অনুশীলন করে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ব্যক্তি নিরপেক্ষ অনন্ত শক্তি রয়েছে সে কথা ধারণা করা। মানুষ ব্রহ্ম – এই সত্য জানা।

২. **কর্মযোগ** – নির্লিপ্ত ভাবে সংসারে কর্তব্যকর্ম করে ও যাগ-যজ্ঞ, পূজা, ইত্যাদি নিষ্ঠাভরে করে, 'আমি না, ঈশ্বরই কর্তা, তিনিই সব করেন' -এটি ধারণা করা।

৩. **ভক্তিযোগ** – ঈশ্বরের একটি রূপ কল্পনা করা ও গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করা, শেষে ঐ কল্পিত রূপ দর্শন ও আমি না, ঈশ্বরই কর্তা – এই জ্ঞান লাভ। একে মন্ত্রযোগও বলে। মন্ত্রের অনুধ্যান হল জ্ঞানযোগ আর মন্ত্র অসংখ্যবার জপ করা হল মন্ত্র যোগ।

৪. **লয় যোগ** – একদল মানুষ ভাবল, ভক্তি যোগে মানুষ তো তার কল্পিত ঈশ্বরকে দেখে, সে তো প্রকৃত ভগবান দর্শন নয়। নিরাকার ধ্যানের মাধ্যমে রূপ থেকে অরূপে পৌঁছাতে হবে। তবে সিদ্ধিলাভ। অরূপে, নিরাকারে অখণ্ডে মন লীন হওয়াকে বলে লয়যোগ – এতে দেহের ভিতরের তেজ কিছুটা হলেও জাগে। এ কিন্তু অখণ্ড সচ্চিদানন্দলাভ নয়।

৫. **হট যোগ** – যোগ সাধনা করতে গিয়ে শরীর সুস্থ থাকা একান্ত প্রয়োজন তা সাধকরা বুঝলেন। কেউ কেউ শরীরচর্চার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করল। নেতি ধৌতি ইত্যাদি কায়সাধনকেই জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ সাধনের পথ বলে মনে করল। তারা হল হটযোগী। হটযোগে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ সাধন সম্ভব হয় না।

৬. **অভব যোগ** – অভব মানে 'নয় ভব' অর্থাৎ আর জন্ম হয় না। কূর্মপুরাণে অভবযোগ বলতে লয় যোগকেই বোঝানো হয়েছে। লয় হলে আর জন্ম হয় না। প্রকৃত অভব যোগে শুধু মনের লয় নয় দেহের অভ্যন্তরেও পরিবর্তন ঘটে। তবে স্থিত সমাধি হয় না। জড় সমাধি পর্যন্ত হতে পারে । ফলে ঈশ্বর হয়ে ওঠা, জগতে যার প্রমাণ ফোটে, তা হয় না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের মূহুর্মুহু সমাধি হত। যতবার সমাধি থেকে নামতেন ততবার নতুন শক্তি লাভ করে নতুন মানুষ হয়ে যেতেন, আগের অবস্থা লয় পেত। কিন্তু চিৎস্বরূপ ভাব অবস্থা লাভ হত না। অভব যোগে আপনা হতে দর্শন হলেও ব্যাকুলতা থাকা দরকার। সাধনক্রমের সব অনুভূতি হয় না, কিছু অনুভূতি দ্বিতীয় স্তরেরও হয়।

৭. **রাজযোগ** – এই যোগে আপনা হতে আত্মিক স্ফুরণ হয় ও ব্যষ্টির সাধনের সকল অনুভূতি পূর্ণমাত্রায় হয়। এক একটি সাধন শেষ হতে ১২ বছর ৪ মাস সময় নেয়। রাজযোগে স্থিত সমাধি লাভ হয় **ও মন স্থায়ীভাবে সহস্রারে অবস্থান করে**। পরিণতিতে সাধকের ঈশ্বরত্ব লাভ হয় এবং দেহে মহাযোগের সূচনা হয়। রাজযোগই প্রকৃত যোগ, স্বাভাবিক (Nutural) ধর্ম। এই যোগ হলে প্রথমে স্থূল দেহ থেকে সিদ্ধকায়া – পরে

দিব্যকায়া – পরে প্রণব তনু ও শেষে শাশ্বত তনু লাভ হয়। সাধক চিন্ময় দেহধারী হয়ে সর্বকালীন হয়ে যান।

৮. **মহাযোগ** – 'মহাযোগে সমুদয় একাকার হইল'। মহাযোগ হলে দেহীর চিন্ময়রূপ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের অন্তরে ফুটে ওঠে ও আত্মিকে সব মানুষই যে এক – এই সত্য প্রকাশ পায়। মহাযোগ বস্তুত রাজযোগেরই পরিণত অবস্থা যা শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহেই প্রথম পরিস্ফুট হতে দেখা গেল। রাজযোগী শ্রীজীবনকৃষ্ণকে অন্তরে দেখে সাধারণ মানুষের দেহেও রাজযোগ স্ফুরিত হচ্ছে। তবে যেহেতু সাধারণ মানুষের মধ্যে অনুপরিমান চৈতন্য জাগ্রত হয় তাই তার effect কম। তাই অভব যোগের মত সেখানে ব্যাকুলতা প্রয়োজন হয় আত্মিক একত্বের লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য।

● **অবতারের মধ্যে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য্য।**

একথার উল্লেখ রামায়ণেও আছে। রাম কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে বধ করে বিভিষণকে লঙ্কার রাজা করল।

কুম্ভকর্ণ তমোগুণের ও রাবণ রজোগুণের প্রতীক আর বিভিষণ পরিবর্তিত শুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রতীক।

অবতার শুদ্ধাভক্তিতে হরিনাম নিয়ে থাকেন, অবতারত্বের পারে গেলে ত্রিগুণাতীত অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, ধারণা হয়। তখন বিশুদ্ধসত্ত্ব গুণও থাকে না। এই অবস্থার প্রমাণ দেয় জগৎ। সমস্ত শ্রেণীর মানুষ তার চিন্ময়রূপ অন্তরে দেখে সে কথা জানায়। তাকে পোস্তার গুন্ডাও দেখে, ঘোর নাস্তিক লোকও দেখে, মুসলমান কসাইও অন্তরে দেখে জানায়।কিন্তু অবতারকে শুধুমাত্র ভক্তরা দেখে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন তার প্রমাণ।

ঠাকুর বলেছেন – গভীর বনে ফুল ফুটেছে, মৌমাছি কিন্তু সন্ধান করে যায়। অন্য মাছি সন্ধান পায় না।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন – ঠাকুর এ কথায় বলতে চাইছেন তার সহস্রদল পদ্ম (সহস্রার) প্রস্ফুটিত, তাই কেবল যারা ভক্ত তারাই তার কাছে আসছেন। আর এখানে হয়েছে তার বিপরীত। সহস্র সহস্র নরনারীর সহস্রদল পদ্ম বিকশিত হচ্ছে আর আমি সেখানে উদয় হচ্ছি।

বেদ এতদিন অপূর্ণ ছিল। ঈশ্বর নিজের রস নিজে পান করেন – এখানেই সেকথা প্রমান সমেত পূর্ণ হয়েছে।

● **ঠাকুরের পূর্ণকে দর্শনঃ-**

ঠাকুর এক দর্শনে দেখলেন, কুয়াশার ভিতর থেকে পূর্ণ বেরিয়ে এল। তার সাথে দৌড়াদৌড়ি করে খেললেন। পরে তৃষ্ণা পেল। পূর্ণ জল খেয়ে ঠাকুরকেও জল এগিয়ে দিল। কিন্তু পূর্ণর দেওয়া জল এঁটো বলে খেলেন না ঠাকুর। তখন পূর্ণ হাসতে হাসতে ঐ জল ফেলে নতুন এক গ্লাস জল এনে দিলে। এখানে পূর্ণ কে?

ঠাকুর বললেন, পূর্ণকে নিয়ে মোটে ৩১জন অন্তরঙ্গ। পূর্ণ এই ভক্তের জগতের প্রতীক।

ঠাকুরের মুখে অমৃতকথা শুনে ভক্তের দল তৃপ্ত, কিন্তু তার কথা শুনে ভক্তদের দর্শন অনুভূতি ও উপলব্ধি কতটা কী হয়েছে তার কোন feed back ঠাকুর নেন নি। তাদের কিছু প্রশ্ন গ্রহণ করেছেন ও উত্তর দিয়েছেন মাত্র। ফলে তারাও কালীর রঙটি কালো হ'ল কেন—এ জাতীয় হাল্কা প্রশ্ন করেছে। একমাত্র মাস্টার মশাইকে বলছেন, আমাকে তোমার কী বোধ হয় ? সেদিন কী কী কথা হয়েছে বলো তো শুনি। সব কথা শুনে আবার ভুল সংশোধন করে দিতেন। বলতেন, না আমি ওটা বলিনি এটা বলেছিলাম। তুমি কি স্বপ্ন দেখেছ বলো। খুব ভালো স্বপ্ন ইত্যাদি।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, 'তোরাই আমার গুরু, আমার যে জগদ্‌গুরু।' তোদের দর্শন থেকে আমি শিখি। তোরাই জানালি যে আত্মিকে মনুষ্যজাতি আর আমি এক। (মনুষ্যজাতির এঁটো জল–তাদের দর্শনের শিক্ষা গ্রহণ করে)।

● কালী জিভ বের করে থাকেন কেন?

১) সাধকের সাধনার একটি অঙ্গ হল আত্মগুপ্তি। মহাকালী অবস্থা প্রাপ্ত মানুষ যখন দেখেন তিনি কালের গণ্ডী অতিক্রম করে শাশ্বত হয়ে গেছেন, তখন নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেছেন বলে জিভ বের করে যেন লজ্জা প্রকাশ করেন।

২) জিভ বের করে তা দাঁত দিয়ে চেপে ধরলে কোন কথা বলা যায় না। এর অর্থ, সাধক বোঝেন কথা বলে অপরকে চৈতন্যের কথা বোঝানোর আর দরকার হবে না – তাঁর দেহের রূপ ধরে তাঁর চৈতন্য অন্যের অন্তরে প্রকাশ পেলেই তারা বুঝবে যে ইনি সর্বজনীন ও সর্বকালীন চৈতন্যসত্তা। স্থূল দেহ নিয়ে তা বলে দিতে হয় না। স্থূলে চুপ থাকেন। জানেন, এ দেহ না থাকলেও তাঁর চৈতন্য ক্রিয়াশীল থাকবে।

● 'একটা জাহাজের মাস্তুলে একটা পাখি বসেছিল– হুঁশ নেই – জাহাজ গঙ্গা পেরিয়ে সাগরে পড়লে পাখির হুঁশ হল – চারিদিকে জল আর জল। ডাঙ্গা খুঁজতে সে বিভিন্ন দিকে উড়ে গেল, কোথাও কোনো ডাঙা না পেয়ে ফিরে এসে জাহাজের মাস্তুলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল।'

সাধন জগতের বিভিন্ন পর্যায়ের কথা এখানে বলা হয়েছে।

ব্যষ্টির সাধনে, সুষুম্না বেয়ে জাহাজ অর্থাৎ দেহবোধ সাগরে অর্থাৎ সহস্রারে এসে পড়ল। স্থূল বোধ সূক্ষ্ম হল।

পাখির হুঁশ হল– ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রথম আত্মাসাক্ষাৎকার হল। মন শুদ্ধমন হল। হুঁশ হল। তখন মন পাখি বা আত্মাপাখীর ওড়া শুরু হল। পরে বেদান্তের সাধনে জড় সমাধি হল। তাঁর মনপাখি স্থির হল। বোধ হল যেটুকু জানা যাচ্ছে নিজের ভিতর থেকেই, বাইরে কিছুই নেই। ঠাকুর বললেন, 'মা কথার রাশ ঠেলে দিচ্ছেন।' মা যে ভিতরে সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। আর মন দেহরূপ জাহাজের মাস্তুলে রয়েছে। অন্যদের বলছেন, 'কাশী গিয়েও

দেখলুম সেই এক তেঁতুল গাছ, এক তেঁতুল পাতা।' – 'তীর্থ গমন দুঃখ ভ্রমণ মন উচাটন হয়ো না রে, তুমি আনন্দে ত্রিবেনী স্নানে শীতল হওনা মূলাধারে।' মন্ কুটিচক হল, তত্ত্বজ্ঞান নিয়ে নিজের সহস্রারে মন স্থির হল।

শ্রীজীবনকৃষ্ণেরও রামকৃষ্ণের মতো অবস্থা হল। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি ভাবলেন তাঁর দেহ যখন থাকবে না, দেহরূপ জাহাজ যখন ভেঙে হারিয়ে যাবে, তখন তাঁর দেহে সংকলিত এই জগৎচৈতন্যের পরিচয় কি জগতের কাছে অজানা থেকে যাবে? যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবান দর্শনের কথা জগৎ জানল না, অনুমান করল মাত্র। তাঁর মন পাখি তথা আত্মা পাখি চঞ্চল হল। নতুন করে তাঁর ওড়া শুরু হল। এই সংসার সমুদ্রের মাঝে তিনি তখন ডাঙা বা অভয়পদ লাভের জন্য ব্যস্ত হলেন।তখন আত্মা পাখি তাঁর রূপটি নিয়ে একে একে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সাধু গুণ্ডা, দেশী বিদেশি সকল শ্রেণীর মানুষের অন্তরে ফুটে উঠতে লাগল।

তাঁর আত্মা পাখির ওড়া শেষ হল যখন তিনি বিশ্বব্যাপী হলেন, সংসার সমুদ্রে ডাঙ্গা (দ্বীপ) খুঁজে পেলেন। এই দ্বীপটি হল অসংখ্য মানুষের সহস্রারের সম্মিলিত রূপ। যখন মানুষ তাঁকে সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ রূপে দেখতে লাগল, তিনি বুঝলেন তাঁর স্থূলদেহ গেলেও তাঁর আত্মিক চৈতন্য তাঁর দেহের রূপ নিয়ে চিরকাল এ সংসারে থেকে যাবে।তিনি উপলব্ধি করলেন আত্মিক জগতে তিনি আর মনুষ্যজাতি এক।

সাধারণ মানুষের মন সংসারে ডুবে থাকে– হুঁশ থাকে না। কিন্তু হঠাৎ কোনো আত্মিক স্ফুরণ অর্থাৎ কোনো দর্শন বা বড়ো কোনো ধাক্কায় হুঁশ হয় – সে বুঝতে পারে সংসার সমুদ্রের এমন গভীরে প্রবেশ করেছে যে কোথাও কোনো কুল কিনারা নেই। মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। মন পাখির ওড়া শুরু হয় – এ তীর্থ সে তীর্থ ঘুরে বেড়ায়। ধাক্কা খাওয়া মানুষ জীবনের বিকল্প রাস্তার খোঁজ করতে শুরু করে শান্তি পাবার আশায়। জীবনের এই পর্যায়ে যদি সর্বজনীন মানুষটিকে, পূর্বোক্ত দ্বীপের বাসিন্দা সেই জীবনকৃষ্ণকে দর্শন হয় এবং পাঠচক্রে এসে দর্শনের মনন শুরু হয়, তাহলে মন শুদ্ধ হয়– বুঝতে পারে শান্তির মূল উৎস তার ভিতরে । মন পাখি অন্তর্মুখী হয়ে মাস্তুলে বসে শান্তিলাভ করে। কিন্তু বেশ কিছু দিন এই ভাবে চলার পর মানবব্রহ্মকে নিয়ে মুগ্ধতার রেশ যেন কিছুটা হ্রাস পায়, কারও কারও ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ে আবার চাঞ্চল্য শুরু হয়। মনে মনে ভাবে ভগবানকে পেয়েও আকাঙ্খিত নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও স্থায়ী শান্তি তো লাভ হল না! তখন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের তৃষ্ণা আরও বাড়তে থাকে।

পরে নিজের তূরীয় অবস্থার দর্শনে ও অন্য অনেকের অনুভূতি শুনে জীবনকৃষ্ণরূপী অখণ্ড চৈতন্যের সাথে তথা মনুষ্যজাতির সাথে আত্মিক একত্ব লাভ হয়। এই একত্বের বোধ ঘনীভূত হলে মৃত্যুভয় দূরে যায় এবং সরল জীবনযাপনের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও গভীর শান্তি লাভ হয়।

● কালী কল্পতরু মূলে, চারিফল কুড়ায়ে পাবি।

ধর্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ – চারিফল কুড়ায়ে পাবে। বস্তুত চার ফল নয়, এক ফল – ধর্ম হলেই অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভ হবে।

ধর্ম হলে কামজয়ী হবে, তার কাম ঈশ্বর প্রেমে রূপান্তরিত হবে, পরে ঈশ্বরত্ব লাভ হবে। সেই সাধক দেহজ্ঞান মুক্ত হওয়ায় নারী সান্নিধ্যে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটবে না বরং নারীরাও তাঁকে অন্তরে দর্শন করে তার দেবত্বের মহিমা কীর্তন করবে।

অর্থলাভ হবে মানে সে অর্থের দাস হবে না, অর্থ তার দাস হবে।

মোক্ষ লাভ হবে মানে তার জীবত্বের পূণর্জন্ম হবে না – তার সদাশিব অবস্থা লাভ হবে — perpetual divine state লাভ হবে।

অপর এক অর্থে –

১. ধর্ম হলে কাম লাভ হবে – দেহ আত্মার রমণ সুখ ভোগ করবে প্রাণ ভরে।

২. ধর্ম হলে অর্থ লাভ হবে – জীবনের অর্থ বা উদ্দেশ্য হল ভগবান দর্শন, সেকথা বুঝবে । আর অন্য অর্থে বিপুল আত্মিক সম্পদ তথা যোগৈশ্বর্য লাভ হবে।

৩. ধর্ম হলে মোক্ষ লাভ হবে – সর্বদা নির্লিপ্ত অবস্থা – স্থায়ী শিবত্ব লাভ হবে।

● রবারের নল দিয়ে মধু বিতরণঃ-

সেন্ট ফ্রান্সিস যীশুর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, তিনি যেন তাকে তাঁর বাণী [illegible] – “Make me a channel of Thy peace”. শ্রীজীবনকৃষ্ণ ‘ধর্ম ও অনুভূতি’ লেখার আগে তাঁর এক অনুরাগী নগেনবাবু এক স্বপ্নে দেখলেন, রবারের নলের মাধ্যমে বাজারে জোরের সঙ্গে মধু বিতরণ হচ্ছে।

‘ধর্ম ও অনুভূতি’ গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে শ্রীজীবনকৃষ্ণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের মধু (**ব্যষ্টির সাধনে দেহতত্ত্ব**) বিতরণের জন্য চ্যানেল বা মধ্যমার ভূমিকা নিলেন সম্পূর্ণ অহংশূন্য হয়ে। কিন্তু এই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে তিনি নিজস্ব অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা লিখলেন। সেখানে নিজেই যেন মধু (একত্ব) হয়ে ধরা দিলেন। এই মধু বিতরণের জন্য প্রয়োজন অন্য চ্যানেলের (channel), সম্পূর্ণ অহংশূন্য এক মধ্যমার।।

● পঞ্চসতী

‘অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা
পঞ্চকন্যা স্মরন্নিত্যং মহাপাতক বিনাশিনম্।।’

এই পঞ্চকন্যা দেহের পবিত্র অবস্থার প্রতীক।

(১) বাইরের স্বামী সাজা স্বামী। আমার প্রকৃত স্বামী বা গুরু বা অবলম্বন হল

ভগবান যিনি একজন অবতারের রূপে অর্থাৎ মনুষ্যমূর্তিতে হৃদয় মধ্যে প্রকাশ হন। আর তখনই যেন শাপমুক্তি ঘটে, বন্ধ্যাত্ব ঘোচে, দেহজমি সাধনের উপযুক্ত (কর্ষনোপযোগী) হয়ে ওঠে। অহল্যা এর প্রতীক।

(২) যে দেহে ভাগবতী তনু জন্মলাভ করে এবং মনকে অন্তর্মুখী করে জীবনযুদ্ধে স্থির অচঞ্চল করে, যে দেহে মহাবায়ু জাগরণ ঘটে ও তীরবৎ গতিতে কুণ্ডলিনী সহস্রারে গিয়ে পরম ধন (ঈশ্বর) লাভ হয়। আর এই ঈশ্বরত্ব লাভের পরিচয় পায় অপর কিছু মানুষও। ভাগবতী তনু জাগলে দেহীর সকল ভালোবাসা ধাবিত হয় ঈশ্বরের পানে – এই অবস্থার প্রতীক দ্রৌপদী।

(৩) দেহের মধ্যে সূর্যসম আত্মিক তেজের জাগরণে এই দেহ দিয়ে অনুভব করা যায় যে বাইরের আচরণগত প্রথাগত ধর্ম প্রকৃত ধর্ম নয়। ধর্ম হল ভিতরের চৈতন্য শক্তির পরিচয় লাভ। কবির কথায় ‘লোকের কথা নিসনে কানে, যেন রে তোর হৃদয় জানে, হৃদয়ে তোর আছেন রাজা।’ এরূপ দৈবী দেহের প্রতীক হল কুন্তী।

(৪) যে দিব্যদেহে ভগবানের প্রসন্নতায় গ্রীবাদেশের সন্ধিনী ও হ্লাদিনী গ্রন্থি ছিন্ন হয়, কুণ্ডলিনী সহস্রারে যাবার পথ প্রশস্ত হয়। গ্রীবাদেশ সুন্দর হয় অর্থাৎ সুগ্রীব হয়ে ওঠেন সাধক। তখন তার চোখের তারা থেকে বালি সরে যায়, দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়– সে দৃষ্টিতে সত্য ধরা পড়ে। এই অবস্থার প্রতীক তারাদেবী।

(৫) সত্ত্ব, রজঃ ও তম– এই তিন গুণের প্রতীক হল বিভিষণ, রাবণ ও কুম্ভকর্ণ। আত্মা বা অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন করে রামকে পেয়ে যে দেহ হতে রজঃ ও তমো গুণের নাশ হয় ও সত্ত্বগুণ অবলম্বন করে দেহী রামময় হয়ে জীবন কাটায় তাই-ই মন্দোদরী।

দেহের পবিত্রতার উপরোক্ত পাঁচটি অবস্থার কথা নিত্য স্মরণ করা উচিত।

অহল্যা– ইন্দ্র অহল্যার স্বামী গৌতম মুনির বেশ ধরে অহল্যার সঙ্গে মিলিত হন। পরে গৌতম মুনি তা জানতে পেরে দুজনকেই অভিশাপ দেন। অহল্যাকে পাষাণ করে দেন। বলেন, শ্রীরামচন্দ্র তোমার গায়ে পা রাখলে তুমি আবার মানবী হয়ে উঠবে। আর ইন্দ্রকে বললেন, তুমি সহস্রযোনি হও। দীর্ঘ সাধনার পর এই সহস্র যোনি সহস্রচক্ষুতে পরিবর্তিত হবে। বস্তুত এটি অভিশাপ নয়, সাধকের উপলব্ধি হয় এতদিন যেন অভিশপ্ত ছিলেন। অহল্যা—ভক্ত মানুষ। তার কাছ থেকে এই শিক্ষা পায় যে যতক্ষণ না ভগবান অবতার পুরুষের, একজন মানুষের রূপ ধরে সচ্চিদানন্দগুরু রূপে ভিতরে প্রকাশ পান ততক্ষণ এই দেহ পাষাণ, বন্ধ্যা। তবেই ঈশ্বর দর্শনের ব্যাকুলতা জাগবে। বাইরের মানুষগুরু প্রকৃত গুরু

নয়। প্রকৃত স্বামী বা গুরু বা অবলম্বন হল গৌতম মুনি (জগতের উত্তম পুরুষ)– যিনি সচ্চিদানন্দ গুরু রূপে অবতারের (রামের)রূপ ধরে ফুটে ওঠেন।
ইন্দ্র– জ্ঞানীর প্রকৃতি যার – অদ্বৈতবাদী সাধক। এরা অপরকে, ভক্তদের শিক্ষা দিতে যায়, গুরু হতে যায় কিন্তু ভগবানের কৃপা হলে বোঝে ভগবানই একমাত্র গুরু আর তিনি আমার ভিতরে। দেহ সহস্রযোনি হয়ে যায়। সর্বদেহ দিয়ে আত্মার সঙ্গে রমন সুখ অনুভব করে। আত্মারাম হয়ে ওঠে। অবশেষে নিজে সহস্রচক্ষু বা ব্রহ্ম অর্থাৎ সোহং (অহং ব্রহ্মাস্মি) বোধে উত্তীর্ন হয় ও মুক্তির স্বাদ পায়।

দ্রৌপদী – দ্রুপদ কন্যা। দ্রুপদ – দারুপদ – কাঠের পা যার। পা আগুনে পুড়ে গিয়েছিল তাই কাঠের পা। যার জীবনে অগ্নিবিদ্যা গতিলাভ করেছে সেই দ্রুপদের যজ্ঞোদ্ভূত কন্যা অর্থাৎ আত্মিক জীবনে ষষ্ঠভূমিতে উদ্ভূত কারণশরীর।
পঞ্চপাণ্ডব হল তার পঞ্চ স্বামী। তবুও অর্জুনের প্রতি ছিল তার বিশেষ অনুরাগ। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব যোগের পাঁচটি অবস্থা।

যুধিষ্ঠির – জীবনযুদ্ধে যিনি স্থির।

ভীম – পবননন্দন– মহাবায়ু জাগ্রত হয়েছে যার।

অর্জুন – পরমধন অর্জন করেছেন যিনি। অর্থাৎ তীরবৎ গতিতে কুণ্ডলিনী সহস্রারে গিয়ে ভগবান দর্শন হয়েছে যার।

নকুল – নাই কুল যার – অর্থাৎ যিনি সকলের - তিনি শিব। এক কথায় নকুল মানে যার শিবত্ব বা ভগবানত্ব লাভ হয়েছে।

সহদেব – শিবত্ব প্রাপ্ত মানুষের শিবত্বের পরিচয় দেয় অপর কিছু মানুষ – তারাও আংশিক শিবত্ব লাভ করে দেবতা হয়ে ওঠে। এটি সহদেব অবস্থা।
ব্যষ্টির সাধনে সকল অনুভূতির মধ্যে ভগবান দর্শনের অনুভূতিকে শ্রেষ্ঠ বলে বোধ হয় সাধকের, তাই অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর ছিল বিশেষ অনুরাগ।।

কুন্তী – পৃথা – পার্থিব শরীর – স্থূলদেহ - তবে দৈবীদেহ।
কর্ণকে ভাসিয়ে দেন – কানে শোনা বাহ্যিক ধর্মকর্মের কথা অগ্রাহ্য করেন। তিনি উপলব্ধি করেন ঈশ্বর অন্তর মধ্যে বিরাজ করেন। সেখানেই তাঁকে স্মরণ করলে জীবনযুদ্ধে মানুষটা স্থির অচঞ্চল হয়ে যায়। যুধিষ্ঠির জন্মায়। অন্তর্মুখ হওয়ায় পরে মহাবায়ু জাগ্রত হয়। ভীম জন্মায়। পরে অর্জুন অবস্থা লাভ হয়ে ভগবান দর্শন করে ভগবানত্ব লাভ হলে, নিজের ও অপরের দর্শন অনুভূতি থেকে আত্মিক পথের বাধা/ ত্রুটি সকল ধরা পড়ে ও সাধক সেই বাধা অতিক্রম করে ক্রমাগত এগিয়ে চলেন উচ্চস্তরে। এই হ'ল দেব চিকিৎসক অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে লাভ– নকুল ও সহদেব অবস্থা প্রাপ্তি।

কুন্তী কুমারী অবস্থায় সূর্যের আশীর্বাদে কর্ণকে পুত্র রূপে লাভ করেন। লোকলজ্জার ভয়ে শিশুপুত্রকে জলে ভাসিয়ে দেন। তার স্বামী পাণ্ডুরাজা পুত্রের জন্মদানে অসমর্থ হওয়ায়

তারই অনুমতি ক্রমে ধর্মরাজ, পবনদেব ও ইন্দ্রদেবের সঙ্গে মিলনে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনকে সন্তান হিসাবে লাভ করেন। মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব জন্মাল দেবচিকিৎসক অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের আশীর্বাদে।

মাদ্রী আসলে কুন্তীর–ই যোগের একটি অবস্থা বিশেষ।

তারা— বানররাজ বালীর স্ত্রী তারা। বিবিদিষা পন্থী শ্রেষ্ঠ সাধকের চোখের তারায় বালি থাকে অর্থাৎ দৃষ্টি অস্বচ্ছ। ভগবৎ কৃপায় গ্রীবাদেশে হ্লাদিনী ও সন্ধিনী গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে কুণ্ডলিনীর সহস্রারে যাবার পথ প্রশস্ত হলে সাধক সুগ্রীব হন। সুগ্রীব মানে যার গ্রীবাদেশ সুন্দর। এই সুগ্রীবের সাথে তারার বিয়ে হয়। অর্থাৎ তখন দৃষ্টি স্বচ্ছ হয় সাধকের। সত্যদৃষ্টি লাভ হয়।

রামচন্দ্র বালীকে বধ করলে সুগ্রীব রাজা হয় ও রামের আদেশে তারাকে বিয়ে করে।

অর্থাৎ অবতার পুরষকে অন্তরে সচ্চিদানন্দ গুরু রূপে না পেলে বিবিদিষার প্রভাব থেকে যায়, দেবত্ব স্থায়ী হয় না ও দৃষ্টি স্বচ্ছ হয় না।

মন্দোদরী— স্বর্গের অপ্সরা মধুরা একদিন কৈলাশে যান। তখন দেবী পার্বতী ছিলেন না। মহাদেব তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। পরে দেবী পার্বতী এসে মধুরার গায়ে মহাদেবের গাত্রভস্ম লেগে থাকতে দেখে তাকে অভিশাপ দেন যে তুমি কুয়োর ব্যাঙ হয়ে থাক বারো বছর। বারো বছর কুয়োর ব্যাঙ হয়ে থাকার পর শিবের বরে তিনি অপরূপ সুন্দরী কন্যা হয়ে ওঠেন। মায়াসুর ও তার স্ত্রী অপ্সরা হেমা তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে কন্যা রূপে পালন করেন। পরে রাবণের সাথে তার বিয়ে হয়। রাবণের মৃত্যু হলে বিভিষণের সাথে বিয়ে হয়।

রাবণ বধের ব্রহ্মাস্ত্র ছিল মন্দোদরীর কাছে। হনুমানের কাছে ব্রহ্মাস্ত্র কোথায় আছে বলে ফেলায় হনুমান স্তম্ভ ভেঙে সেই অস্ত্র নিয়ে এলে তবে রাবণ বধ হয়। ব্রহ্মাস্ত্র হল আত্মা সাক্ষাৎকার। দেহ ষোল আনা প্রসন্ন হলে দেহ থেকে আত্মা মুক্ত হয়ে দেখা দেয়। মন্দোদরী এরূপ দৈবী দেহের প্রতীক।
কুম্ভকর্ণ তমোগুণের, রাবণ রজোগুণের ও বিভিষণ সত্ত্বগুণের প্রতীক।
মন্দোদরী হল – যোগযুক্ত দেহের অভ্যন্তরীণ আত্মিক অবস্থা যা তমো ও রজোগুণ বিনাশে ও অবতারত্বের পর্যায়ে সত্ত্বগুণে অবস্থান করতে দেহীকে সাহায্য করে।
বোঝা গেল পঞ্চসতীকে নিত্য স্মরণ করার অর্থ এক কথায় শুদ্ধাভক্তি লাভের প্রার্থনা জানানো।

স্মৃতিকথা

শ্রীজীবনকৃষ্ণের পূত সঙ্গলাভে ধন্য কিছু মানুষের তাঁকে নিয়ে টুকরো কিছু স্মৃতিচারণ।।

(১) **সমীর বন্দোপাধ্যায়ঃ**

আমার মা একবার অসুস্থ হয়ে ঘরে বিছানায় শুয়ে আছেন। মনে ইচ্ছা জাগল জীবনকৃষ্ণকে দেখতে যাবেন। বাড়ীতে কেউ নেই। বাবা পাঠে, দাদা ডঃ দীনবন্ধু চেম্বারে গেছেন। বাড়ীর ড্রাইভারকে ডেকে বললেন, আমাকে রিক্সায় করে কদম তলায় ঠাকুরের কাছে নিয়ে চল্। গাড়ী দরকার নেই। উঠোনে জুতো খুলে খালি পায়েই গেলেন ড্রাইভার রামপ্রসাদকে সঙ্গে নিয়ে। পৌছাল রাত্রি ৮.৩০ মিনিটে । পাঠের লোকজন চলে গেছে দরজা বন্ধ – দরজায় টোকা দিতেই জীবনকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর শোনা গেল – কে? কে? রামপ্রসাদ বলল, সুশীলবাবুর বাড়ী থেকে এসেছি। উনি দরজা খুলে দেখেন বড় ঘোমটা টেনে মা দাঁড়িয়ে আছেন অদূরে। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে তাকে দেখে নিয়ে দূর থেকেই প্রণাম করলেন। জীবনকৃষ্ণ বললেন, 'শান্তি হোক মা, শান্তি হোক,শান্তি হোক।'

এরপর ওনারা ফিরে এলেন। দেহমন এতটাই আনন্দে উৎফুল্ল হল যে আর রিক্সা নয়, হেঁটেই বাড়ী ফিরলেন। শরীর যেন সুস্থ।। বাবা বাড়ী ফিরে সব শুনে বললেন, এভাবে আর কখনও ওনাকে বিরক্ত কোরো না।।

(২) **নির্মল মণ্ডলঃ**

কদমতলায় গেছি। উনি আদর করে ডেকে কাছে বসালেন। বললেন, তুই যে আমায় স্বপ্নে দেখলি, তা কী বুঝলি বাবা? বললাম, কিছু বুঝিনি। তবে অদ্ভুত এক আনন্দ পেলাম, যে আনন্দ এতদিন কোথাও পাইনি। উনি বললেন, ঠিক বলেছিস বাবা। ব্রহ্মের স্বরূপই হলো আনন্দ।

(৩) **অমরনাথ বসুঃ**

সংস্কারের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসা আমাদের সকলের পক্ষেই এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। কিন্তু শ্রীজীবনকৃষ্ণের ঘরে গিয়ে মানুষ আপনা হতে সংস্কার মুক্তির আস্বাদন পেত। এ প্রসঙ্গে আমার বাবার জীবনের একটা ঘটনার কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। বাবা শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু শ্রীজীবনকৃষ্ণের ঘরে যাওয়ার কিছু দিন পর স্বপ্ন দেখছেন যে – গঙ্গায় তর্পণ করছেন। এমন সময় শ্রীজীবনকৃষ্ণ জলে নেমে বাবার হাত দুটি ধরে তর্পন করতে বারণ করছেন। -- আশ্চর্য! তারপর থেকে বাবার বহুকালের পুরাতন সংস্কার তর্পন করা বন্ধ হয়ে গেল।

(৪) **আনন্দমোহন ঘোষ ঃ**

সেদিন বোধহয় মঙ্গলবার ছিল। ঠাকুর জাহাঙ্গীরকে বলেছিলেন, Jahangir, can you tell me why do you come here? জাহাঙ্গীর বললেন, God attracts me. ঠাকুর ও কথা গ্রাহ্য না করে বললেন, Oh! it is your imagination, you simply imagine it. No, that is not proper way. Just explain it, come out. জাহাঙ্গীর মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন, কোন কথা বললেন না। ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তাঁর সঙ্গে আমরাও। একথার কি যে উত্তর হতে পারে, তা অনেকেই চিন্তা করতে লাগলেন। ঠাকুর এতক্ষণ উচ্চস্বরে কথা বলছিলেন, এবারে মৃদুস্বরে জাহাঙ্গীরকে উদ্দেশ্য করে বললেন – you may call it attraction, attachment or affection, whatever you may like; but why to me? to this place ? ক্ষিতীশদা ঘরের দক্ষিণ দিকের খাটের পাশে জানালার ধারে মেঝেয় বসেছিলেন, এতক্ষণ তাঁকে দেখিনি। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন – There is no egoism in you. এই কথা শোনামাত্র ঠাকুর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় 'আঃ' বলে মহানন্দে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। তারপর বিস্তারিত লোচনে দাঁতে দাঁত টিপে দীর্ঘশ্বাস চাপতে চাপতে বললেন – হ্যাঁ, no egoism here, only God. এই বলে বাঁ হাতের আঙ্গুল দিয়ে নিজের দেহের দিকে নির্দেশ করে দিলেন। সমস্ত ঘর নিঃশব্দ, নিশ্চুপ, অবাক বিস্ময়ে সেই পুরুষ সিংহের মধ্যে জীবন্ত ভগবানের অপরূপ রূপ দর্শন করতে লাগলাম। কিন্তু কয়েক মূহূর্ত মাত্র। ঠাকুর একটুখানি মধুর হাসি হেসে হঠাৎ বললেন, "তা না হলে তোরা আমায় ভেতরে পাস? না হলে এসব হয় না।"

(৫) **শান্তিলতা দত্ত ঃ**

১৯৬৫ খ্রীঃ বেলেঘাটায় আমার পাশের বাড়ির উঠানে রোজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ হতো। পাঠে যাবার জন্য অনেকে বলতো। কিন্তু ওই বছরেই আমার স্বামী হঠাৎ মারা যান। চরম দারিদ্র। চার ছেলে আর চার মেয়ে। সকলে পড়াশুনা করছে। একমাত্র বড় মেয়েটিকে স্বামী বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন। অকুল সমুদ্রে ভাসছি। আমার ধারণা ছিল, পূজা-জপ ইত্যাদি না করলে কি ভগবানকে দেখা যায়? কিন্তু পাঠের সকলে বলতো কোন কিছু করতে হবে না, পাঠ শুনলেই ভগবান দর্শন হবে। আমার মনে হতো ভগবান দর্শন কী এতই সোজা! আমি বিধিবাদীয় পূজাদি নিয়েই ছিলাম। দৈবকৃপায় একদিন সমবেত কণ্ঠে ঋকবেদের সংজ্ঞান সূক্তের স্তব শুনে আমি একেবারে অভিভূত হয়ে গেলাম। সেই যে পাঠে যাওয়া শুরু হলো, আমার জীবনে আর কোনদিন পাঠে যাওয়া বন্ধ করতে পারিনি।

হাওড়া থেকে শ্রদ্ধেয় সুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিত্য পাঠে আসতেন। তিনি শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতের যৌগিক ব্যাখ্যা দিতেন। কিছুদিন পর স্বপ্ন দেখছি– শুয়ে আছি। লক্ষ্মী এসে বলছেন, ওমা আপনি এখনো ঘুমাচ্ছেন। শ্রীভগবান যে আপনার দরজায় এসেছেন। উঠানে ভগবান শ্রীজীবনকৃষ্ণ পায়চারি করছেন। আমি জেগে উঠে দরজার ফুটো দিয়ে দেখছি,

কেননা শুনেছি ঠাকুর স্ত্রীলোকের মুখ দেখেন না। ঠাকুর উঠানে একবার এদিকে যাচ্ছেন আবার ওদিকে যাচ্ছেন – এই ভাবে পায়চারি করছেন। তারপর দেখছি যে দরজা হাট হয়ে খোলা। ঘুম ভেঙ্গে গেল। এই আমার ভগবান শ্রীজীবনকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন।

ঠাকুরকে প্রথম স্বপ্নে দেখার পর বাস্তবে মিলিয়ে নিতে কদমতলায় গিয়েছিলাম; আমার সঙ্গে পাঠচক্রের আরও তিনজন ভদ্রমহিলা ছিল। জায়গাটা কদমতলা, হাওড়া, বাস নম্বর জানা ছিল, কিন্তু ঠাকুরের বাড়ির সঠিক ঠিকানা আমাদের জানা ছিল না। কিন্তু কী দৈব! বাসে এক ভদ্রলোক আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, যাঁর কাছে যাবেন তাঁর নাম কী? বললাম ঠাকুর শ্রীজীবনকৃষ্ণ। ভদ্রলোক বললেন, আমরাও সেখানে যাব। একেই বলে 'সাধু যার ইচ্ছা, ঈশ্বর তার সহায়'। তাদের সঙ্গে কদমতলায় ভগবান শ্রীজীবনকৃষ্ণ- আমার প্রাণের ঠাকুর ও মনের মানুষকে –জানালা দিয়ে বাস্তবেও ঠিক তেমনি দেখলাম। আবার বাড়ির ভেতরে ঢুকে পাশের ঘর থেকে কান পেতে ঠাকুরের শ্রীমুখের কথাও শুনেছিলাম।

(৬) **শ্রীমতি পারুল রায় ঃ**

ভগবান শ্রীজীবনকৃষ্ণ স্থূলশরীরে থাকাকালীন বেলেঘাটায় নেপাল বাবুর বাড়িতে নিত্য পাঠ হত। শ্রদ্ধেয় সুশীলবাবু নিত্য আসতেন এবং কথামৃতের দেহতত্ত্বে ব্যাখ্যা দিতেন, পাঠ করতেন সন্তোষ পাত্র। তিনদিন পাঠে এসেছি, তারপর স্বপ্নে দেখছি – আমি দক্ষিণেশ্বরে গেছি, গঙ্গার ঘাটের সিঁড়িতে বসে আছি। নিজের বাবার মত একজন লোককে দেখছি অথচ বাবাও নন। তিনি আমাকে বলছেন, মা আমার জ্বর হয়েছে, আমাকে ঔষধ দে আর মাথা টিপে দে। তখন কোলের উপর শুইয়ে তাকে বলছি, 'বাবা তোমার জ্বর হয়েছে? এই ওষুধ খাও ভালো হয়ে যাবে।' ওষুধ খাইয়ে দিয়ে তাঁর মাথাটা টিপে দিলাম। বাবা খুব খুশী হলেন আর বললেন, তোর কোন ভাবনা নেই। তোর মঙ্গল হবে। উনিই হলেন জগৎ পিতা ভগবান্ শ্রীজীবনকৃষ্ণ। পরের দিন পাঠে গিয়ে বললাম। সুশীলবাবু বললেন, তোর খুব ভাগ্য তো, ঠাকুর তোর সেবা নিলেন। কয়েকদিন পরে ভালমায়ের সঙ্গে ব্যাতাইতলায় ঠাকুরের ঘরের বাইরে থেকে জানালা দিয়ে দেখলাম ঠাকুর খাটের ওপর বসে আছেন। আমার স্বপ্নে দেখা বাবার সাথে অবিকল মিলে গেল। তখন আমার খুব আক্ষেপ হলো, আমি নারী বলে বাবা তোমার ঘরে ঢুকতে পেলাম না, – এই ভেবে খুব কাঁদছি। ঠাকুর ঘর থেকে শুনতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সুশীলবাবু ও কাঁদছে কেন? সুশীলবাবু বললেন, আপনাকে স্বপ্নে দেখেছে, এখন বাইরেও দেখছে––তাই। ঠাকুর বললেন, ও একটু হয়ে থাকে।

মানিক ৬৭ সংখ্যা

ভূমিকা

নানা মুনির নানা মত। যত মত তত পথ। কিন্তু সব পথই কি এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে ? মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান দর্শন, ভগবান লাভ। যিনি এই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছেন, ভগবানের কৃপায় ভগবান দর্শন করে পরে সব মতের সাধন করেছেন, সেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের ধর্মের নানা পথ সম্পর্কে উপলব্ধি কি ?

তিনি বলছেন ; ১) মা, সব্বাই বলছে, আমার ঘড়ি ঠিক চলছে। কিন্তু মা, কারও ঘড়ি তো ঠিক চলছে না। সূর্যঘড়ির সাথে মিলিয়ে নিলে তবে ঘড়ি ঠিক চলে।

সূর্যঘড়ি – সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ – পরমব্রহ্ম তথা অখণ্ড চৈতন্য। সূর্যঘড়ির সাথে মিলিয়ে নেওয়া – অখণ্ড চৈতন্যকে দর্শন করা ও তার সাথে একত্ব লাভ করা। এরূপ ব্যক্তি যে পথে চলেছেন সেটিই ঠিক পথ। মহাজন যেন গতাঃ স পন্থাঃ। তিনি ধর্মের মাপকাঠি হয়ে ওঠেন।

ঠাকুর অন্যত্র বলেছেন ; ২) যদি বলো, ওদের ধর্মে অনেক ভুল আছে ; কুসংস্কার আছে ; আমি বলি, তা থাকলেই বা, সকল ধর্মেই ভুল আছে।

ধর্মে যদি ভুল থাকে তাহলে তো সে আর ধর্ম নয়–অধর্ম। ধর্মজগতে এত বড় বিস্ফোরক কথাটি বলেছেন প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

তিনি আরও বলেছেন, ৩) সব শাস্ত্রেই বালিতে চিনিতে মেশানো আছে। বালি বাদ দিয়ে চিনিটুকু নেবে।

বালি–অসার কথা। চিনি– ঠিক ঠিক অনুভূতিলব্ধ সত্যের কথা। কী করে ধর্ম কথার বালি আর চিনি আলাদা করব ? তিনি পরমহংস– ধর্মের সার অংশ বেছে নিতে পারেন নিজের অনুভূতির আলোকে। সাধারণ মানুষকে তাকিয়ে থাকতে হবে তাঁর জীবন ও বাণীর দিকে। তিনিই পথ– He is the way — তাঁকে আদর্শ করে জীবনে এগোতে হবে।

কিন্তু তিনি নিজেই বলছেন, "অচিনে গাছ দেখেছো ? তাকে কেউ চিনতে পারে না।" মাস্টার মশাই বলছেন, "আপনিই সেই অচিনে গাছ।" তিনি অর্থাৎ অবতার নিজে থেকে ধরা না দিলে তাকে ধরা যায় না। "ওরে কুশীলব করিস কী গৌরব, ধরা না দিলে পারিস কী ধরিতে ?" পরবর্তীকালে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে ধরা দিলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণের কাছে ও তাঁকে অখণ্ড চৈতন্য দর্শন করালেন। পরিণতিতে তিনি রামে অর্থাৎ একে (Absolute One) পরিবর্তিত হলেন ও জগৎ রূপ রঙ্গমঞ্চের কুশীলবদের অর্থাৎ সাধারণ মানুষের অন্তরে চিন্ময় রূপে ফুটে উঠে ধরা দিতে লাগলেন। তাঁর সত্তা লাভে সাধারণ মানুষও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বিকশিত মানব ধর্মকে ও তার অগ্রগতিকে বুঝতে সক্ষম হচ্ছে।

ধর্মে বালি তথা কুসংস্কারের প্রবেশ ঘটেছিল অনুমান ও কল্পনা থেকে, অন্ধবিশ্বাস থেকে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ একদিন (১৪.১০.১৯৬০) স্বপ্নে দুটো দৈববাণী শুনলেন। ১ম– "অনুভূতিই ধর্ম।" আর ২য় "সকলেরই বিশ্বাস, একজনের ছাড়া।"

এতকাল সাধারণ মানুষের দিব্য দর্শন হ'ত না, হলেও তা হোত সংস্কারজ রূপ দর্শন, ফলে তারা সত্যাসত্য বিচার করতে পারত না, চোখ বুজে গুরুর কথা বিশ্বাস করে এসেছে আর ঠকেছে, ধর্মের নামে অধর্মের রাজত্ব চলেছে পৃথিবীতে। "সকলেরই বিশ্বাস, একজনের ছাড়া।"–এই একজন হলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ, যার অজস্র দর্শন অনুভূতি হয়েছিল। তিনি বললেন ধর্মে প্রমাণ আছে। প্রমাণ দেখবি তবে নিবি। বিশ্বাসকে প্রমাণ বলা– আত্মপ্রবঞ্চনা।

জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষ তাঁকে অন্তরে দেখে তাঁর সাথে আত্মিকে এক হয়ে সেই একজনে পরিবর্তিত হচ্ছে, যাকে ধর্মকথা বিশ্বাস করে নিতে হয় না–প্রমাণ পান অন্তরের দর্শন সাপেক্ষে।

বর্তমান পত্রিকায় সাধারণ মানুষের কিছু দর্শন অনুভূতি ও উপলব্ধির কথা সন্নিবেশিত হ'ল।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪

সামনে এগোও

● আমাদের বাড়ীতে একজন মুসলমান ফকির মাঝে মধ্যেই আসে। গত ১৮/৪/১৭ তারিখে আমাদের বাড়ীতে তিনি এসেছিলেন। বাড়ীর প্রত্যেকের মাথায় চামর দিয়ে ঝাড়ফুঁক করে দিলেন। তারপর আমার ছেলেকে ও আমাকে ১টি করে লাল রং-এর পাথর দিলেন। ঐ পাথর দিয়ে আংটি গড়িয়ে ধারণ করতে বললেন। তাহলে নাকি আমাদের খুব উন্নতি হবে। পরদিন আমার স্ত্রী স্বপ্নে দেখল, কে যেন বলছে ঐসব পাথর পরতে হবে না। তাকে দেখা গেল না, শুধু কথা শোনা গেল। আর কী বলেছিল মনে নেই। দুদিন পর, ২১/৪/১৭ তারিখে আমি স্বপ্নে দেখি– এক বয়স্ক লোক ধুতি পরে, খালি গায়ে, গলায় পৈতে, চেহারা হুবহু জীবনকৃষ্ণের মতো, তিনি আমাকে বললেন, এই সব পাথর পরে কিছু হবে না। তুমি সামনের দিকে, নতুনের দিকে এগিয়ে যাও।... স্বপ্ন শেষ।

দেবনাথ রানা, বেলঘরিয়া

ব্যাখ্যাঃ- রত্নধারণ করে ভাগ্য ফেরানোর কুসংস্কার কাটিয়ে দিলেন।

● গত ৭/২/২০১৭ তারিখে একটা আশ্চর্য স্বপ্ন হ'ল। আমার ধর্মভাবনায় বড় একটা পরিবর্তন এল। বোনের কাছে জীবনকৃষ্ণের কথা শুনলাম কিন্তু তাকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বা ভগবান বলে মানতে পারলাম না। অথচ ক'দিন পরই স্বপ্নটা হ'ল–দেখছি অফিসে বসে চেক লিখছি—একজন এসে চেকটা ছিঁড়ে দিল। পরের দৃশ্যে দেখছি–বাড়ীর একজন খবরের কাগজ নিয়ে এসে বলল, ৩নং পাতায় এই ছবিটা কার বলতো ? আমি ছবির নীচে কী লেখা আছে পড়তে যাচ্ছি। ও বলল, ছবিটা তোর চেনা। কে বল ? আমি বললাম, জীবনকৃষ্ণের। তখন নীচের লেখাটা দেখলাম। লেখা রয়েছে–জীবনকৃষ্ণের বিয়ের সময়কার ছবি। বরবেশী জীবনকৃষ্ণকে দেখে খুব আনন্দ হ'ল।...

সুজিত মুখার্জী, খড়গপুর, পঃ মেদিনীপুর

ব্যাখ্যাঃ- চেক ছিঁড়ে দিল–তুমি কর্তা নও, ভগবান কর্তা। বর–শ্রেষ্ঠ পুরুষ। খবরের কাগজে ৩নং পাতায় বেরিয়েছে – সর্বজনীন ও আদর্শ মানব।

উপহার

● গতকাল ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৬, মনে মনে ঠাকুরকে বলেছিলাম, আজ রাত্রে যদি ভাল স্বপ্ন দাও তাহলে কাল তোমার পাঠে যাব, নচেৎ ১লা জানুয়ারী বেড়াতে যাব। আজ ভোরবেলা অপূর্ব একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল। দেখছি–আমি ঠাকুর রামকৃষ্ণকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাচ্ছি আমার ছেলেকে উপহার দেব বলে। ঠাকুর বয়স্ক, কিন্তু

হালকা। ওনার নরম পায়ের পাতা হাত দিয়ে স্পর্শ করে অপূর্ব আনন্দের শিহরণ জাগছে দেহে।...

তনুশ্রী চ্যাটার্জী, শীলপাড়া, বেহালা, কলকাতা

ব্যাখ্যাঃ- শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্পর্কে দ্রষ্টার ধারণা হয়েছে। পরবর্তী প্রজন্ম তাঁর কাছ থেকে এ বিষয়ে সমৃদ্ধ হবে। জানা গেল সন্তানকে দেওয়ার মত শ্রেষ্ঠ উপহার হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণচেতনা যা জানায় মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ভগবান দর্শন। বিবেকানন্দ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন Love personified. মানবব্রহ্মের প্রতি তোমার প্রেম যদি সঞ্চারিত করতে পার তোমার সন্তানের মধ্যে, তাহলে তাই-ই হবে শ্রেষ্ঠ উপহার।

● দেখছি (২৪.১১.১৬)–বৃহস্পতিবার–পাঠের ঘরে চৌকিতে বরুণদা ও স্নেহময়দার মাঝে বসে আছেন খালি গায়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি আমাকে কিছু বোঝাচ্ছেন। কথা প্রসঙ্গে বললেন, কুসঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। সৎসঙ্গে সৎভাবে জীবনযাপন করতে হবে। কী বল স্নেহময় ? স্নেহময়দা বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও তো তাই বলি। আমি বললাম, টাকা পয়সারও খুব অসুবিধা। তখন আবার উনি বললেন, টাকা পয়সাও জীবনের সব নয়। জীবনে বাঁচতে হলে মাথা উঁচু করে বাঁচতে হবে। সরল সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে হবে। কী, তাই তো স্নেহময় ? উত্তরে স্নেহময়দা বললেন, হ্যাঁ, সে তো অবশ্যই। আমি শুনছি আর ভাবছি, উনি তো অন্তর্যামী। সকল সমস্যাই জানেন, সমাধানও বলে দিলেন। আমার প্রাণ জুড়োল।... স্বপ্ন ভাঙল। দেখি ভোর হয়ে গেছে।।

কাকলি রায়, স্কুলবাগান, বোলপুর

মস্তক বন্দনা

● দেখছি (১২.৪.২০১৭)–বাড়ীতে পাঠ হচ্ছে। পাঠক স্নেহময়দা। আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে, তাই পাঠ শেষ হবার একটু আগে পাঠকের মাথাটা খুলে নিয়ে ছেলেকে বললাম, মাথায় ঠেকা, প্রণাম কর। যেন এটাই নিয়ম। ভাগবত প্রণামের বদলে পাঠকের মস্তক বন্দনা করতে হয়। ছেলেকে অনেক ছোট দেখছি। তখন স্নেহময়দা মাথাহীন অবস্থাতেই বলে উঠলেন, এখনও পাঠ শেষ হয় নি। আমি বললাম, কিন্তু আমার তাড়া আছে। একটু আগেই উঠতে হবে যে !... ঘুম ভাঙল।

কৃষ্ণা ব্যানার্জী, বোলপুর

ব্যাখ্যাঃ- মস্তক বন্দনা–ভক্তির কথা নয়, চরণ বন্দনা নয়, একত্বের কথা পাঠে শুনে মানুষ মাথায় ধারণা করতে পারছে এখন। তাড়া আছে–তাড়া থাকলে হবে না। পাঠে সময় দিতে হবে।

● দেখছি (৩.৫.২০১৭)–একটা বিরাট মন্দির। ভাবলাম পুজো না দিলেই বা, ভিতরের কারুকার্য দেখলে তো ক্ষতি নাই। ভিতরে ঢুকলাম। সুদৃশ্য মন্দির– সিঁড়ি দিয়ে উঠছি

নামছি–বহু ভক্ত রয়েছে। কিন্তু এ কী ! বেদীতে মূর্তির স্থানে জীবনকৃষ্ণের পাথরের মূর্তি। আমি কাছে যেতেই মূর্তি যেন জীবন্ত হয়ে গেল। আমাকে বললেন, তুই এখানে এসেছিস কেন ? তুই তো ওখানে যাস। আমার মনে হ'ল, আমি সখের বাজারে স্নেহময়দার পাঠে যাই সে কথাই বলছেন। অন্য কেউ ওনার কথা শুনতে বা ওনাকে জীবন্ত অবস্থায় দেখতে পেল না।...

পার্থ ঘোষ, বেলঘরিয়া, কলকাতা

ব্যাখ্যাঃ-রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মানুষ নানা নামে সেই সর্বজনীন সর্বকালীন মানবকেই পূজা করেছে। তাকে পেয়েই মানুষ জীবসীমা অতিক্রম করে মানব সীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানুষকে জানার পরও বহু মানুষ তাকে কল্পিত দেবতার স্থলাভিষিক্ত করেছে। যারা মন্দিরে পুজো করে, পুজো দেয় তারা ভগবানকে পাথরের মূর্তি করে রেখে দিয়েছেন। যারা পাঠে আসেন, ভগবানকে ভিতরে দেখেন তাদের কাছে ভগবান জীবন্ত– তাদেরকে মন্দির সংস্কৃতি সচেতনভাবে পরিহার করতে হবে। একত্বের ধারনা লাভ না হলে অন্তরে তাঁর (পরম একের, অখণ্ডচৈতন্যের) সজীবতা ও সক্রিয়তার যথাযথ পরিচয় লাভ করা যায় না। তাই একত্বের অনুশীলনে সব মনটি দিতে বলছেন।

দত্তক কন্যা

● দেখছি (২৬.০৩.২০১৭)–একটা ঘরে খাটের উপর স্নেহময়দা শুয়ে আছে। বেশ লম্বা চেহারা। নীচে অনেক লোক। আমি কোলের কাছে বসে দাদার কাছে জীবনকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে চাইছি, অনেক প্রশ্ন করছি। তখন দরজার কাছে যে এক বৃদ্ধ ছিলেন উনি বললেন, ওর যখন এত জানার ইচ্ছা তখন স্নেহময় ওকে দত্তক মেয়ে করে নে। স্নেহময়দা বলল, বেশ আজ থেকে ওকে আমি দত্তক নিলাম। তখন ঐ বৃদ্ধ আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। আমিও আনন্দে অধীর হয়ে নাচতে লাগলাম।...

সান্তনা চ্যাটার্জী (তুলি), বেলঘরিয়া, কলকাতা

ব্যাখ্যাঃ- বৃদ্ধ–নির্গুণ ব্রহ্ম। স্নেহময়দা–আত্মিক একত্বের ধারণা লব্ধ মানুষদের প্রতিনিধি। দত্তক মেয়ে–বাপের সম্পত্তি যেমন সন্তান পায় সেইভাবে খুব সহজে একত্বের ধারণা লাভের উত্তরাধিকার লাভ করছেন যারা দ্রষ্টা তাদের প্রতিনিধি।

● দেখছি (৫.৫.২০১৭)–মনে হচ্ছে আজ দ্বিতীয় শনিবার। আমাদের বাড়ীর পাঠে স্নেহময়দা আসবে। আমার দিদির ছেলে শুকদেব একটা মিষ্টি খাচ্ছে। ওর খাওয়া দেখে বললাম, তুই মিষ্টিটা এঁটো করে দিলি! স্নেহময়দাকে তো আর দেওয়া যাবে না। কিছুক্ষণ পরে বললাম, ঠিক আছে, বাড়ীতে নতুন মিষ্টি আছে, স্নেহময়দাকে সেটাই দেব।... ঘুম ভাঙল।

করবী রুজ, বোলপুর

ব্যাখ্যাঃ- শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে মাস্টার মশাই লিখছেন–"যেন সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎ কথা কহিতেছেন।" এই শুকদেবের কথাই কথামৃতে আছে। এতদিন সেকথার শব্দার্থ ও মর্মার্থ আলোচিত হয়েছে, মানুষ ভক্তিরস আস্বাদন করেছে। এবার সম্পূর্ণ নতুন ভগবৎ কথা শোনার জন্য মানুষ উন্মুখ– উপাদানও রয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে–তাদের নতুন ধরনের অনুভূতিতে যার প্রকাশ দেখবেন পাঠকেরা।

হালদার পুকুর

● স্বপ্নে দেখছি (১৪.৪.২০১৭)–নন্দপুর ও বড় আলুন্দা গ্রামের বর্ডারে একটি প্রাইমারী ও একটি হাইস্কুল। তার পূর্বধারে হালদার পুকুর, উত্তরে কাছারী পুকুর, পশ্চিমে আর একটা পুকুর। তিনটি পুকুর, দুটি স্কুল ও গ্রাম দুটিকে নিয়ে বিরাট এলাকা জুড়ে একটা পুকুর খনন করা হয়েছে, প্রায় ১কিমি. পরিসর জুড়ে। আমি অবাক হয়ে দেখছি আর বলছি, এত বড় পুকুর! পুকুরে কিন্তু জল নাই। পাশ থেকে কেউ বলল, হ্যাঁ এটাতেই মানুষের মঙ্গল হবে। সত্যিকার কল্যাণ হবে। এই রকম শুনতে শুনতে ঘুম ভাঙল।

রুদ্রনাথ দত্ত, গড়গড়িয়া, বীরভূম

ব্যাখ্যাঃ- এটি চতুর্থ হালদার পুকুর, যেখানে সব School of thought মিলে যাবে, সব দ্বন্দ্ব মিটে যাবে–সাধারণ মানুষের ধর্মতৃষ্ণা মিটবে–সমষ্টির ধর্ম হবে।

দুটি গ্রাম – বিশ্বগ্রামের দুটি ধারণা ১ম, আলুন্দা–শ্রীরামকৃষ্ণের অসাম্প্রদায়িক বিশ্ব গ্রামের ভাবনা। কিন্তু দর্শন অনুভূতি নেই– তাই যেন লবনহীন, আলুনী।

২য় নন্দপুর–শ্রীজীবনকৃষ্ণ জাতি ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের অন্তরে ফুটে উঠে এক বিশ্বের ধারণা দান করছেন ও ব্রহ্মানন্দে অভিষিক্ত করছেন।

১ম হালদার পুকুর–বেদ। ২য় হালদার পুকুর– শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। ৩য় হালদার পুকুর– ধর্ম ও অনুভূতি (তৃতীয় ভাগ)। ৪র্থ হালদার পুকুর–সাধারন মানুষের অনুভূতি দিয়ে রচিত হবে সমষ্টির ধর্মের পরিচয় সমৃদ্ধ গ্রন্থ।

জল নেই– পরিকাঠামো তৈরী হয়েছে–আয়োজন প্রস্তুত। এবার সর্ব সাধারনের অনুভূতি (জল) দিয়ে পূর্ণ হবে এই পুকুর।

● স্বপ্ন দেখছি –আমি ঘুমাচ্ছি। গায়ে খুব তাপ লাগছে। ফলে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে তাপ কোথা থেকে আসছে জানার জন্য এদিক ওদিক দেখছি। হঠাৎ নজরে পড়ল সূর্যটা গলে মাটিতে পড়েছে। সেখান থেকে এত তাপ আসছে। খুব অবাক হ'লাম। এরপর সত্যি সত্যিই ঘুম ভাঙল। বুঝলাম স্বপ্নের মধ্যেই স্বপ্ন চলছিল।

ভজহরি মণ্ডল, নলহাটি, বীরভূম।

ব্যাখ্যাঃ- "ধর্ম ও অনুভূতি" লেখার সময় একজন দেখেছিল ভক্তিচন্দ্র গলে গলে মাটিতে পড়ছে। আজ এতদিন পর জ্ঞানসূর্য গলে মাটিতে পড়ছে আর তা দেখছে এমন একজন যে

এ বিষয়ে কিছু জানে না। ধর্ম ও অনুভূতি প্রকাশের পর মানুষ ভগবানকে অন্তরে দেখে প্রকৃত ভক্তি জেগেছে। এবার আত্মিক একত্বের অনুভূতি লাভ ও একত্ব বোধে বোধ হবে।

জিভের আড় ভেঙে যাক

দেখছি (৯-৪-২০১৭)– একজন অজানা ভদ্রলোক আমায় বললেন, তুমি কী চাও বল। আমি বললাম, আমার জিভের আড় যেন ভেঙে যায়। উনি বললেন, বেশ তাই হবে। আমি ফিরে আসছি। হঠাৎ মনে হ'ল এ কী চাইলাম আমি ! এতে তো বিপত্তি হবে। সত্যকথা সব সময় বললে অনেকের কাছে অপ্রিয় হয়ে যাব। তখন আবার ছুটতে লাগলাম ঐ লোকটির কাছে যাবার জন্য। তিনি যেন আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর না করেন। কিন্তু অনেক খুঁজেও লোকটিকে আর দেখতে পেলাম না। অস্বস্তি নিয়ে ঘুম ভাঙল।

দেবরঞ্জন চ্যাটার্জী, চারুপল্লী, বীরভূম

ব্যাখ্যাঃ— দ্রষ্টার সত্যের ধারণা হয়েছে। এবার ঈশ্বর কৃপায় জিভের আড় ভাঙা মানে অনুশীলন করতে করতে নির্গুনের দিকে এগোন এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সত্যে প্রতিষ্ঠিত হলে তার মুখে জীবন সত্যের কথা শুনে মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না।

● দেখছি – স্নেহময় জেঠু বাইক নিয়ে আমাদের গ্রামে এসেছেন। শিশির কাকুর বাড়ীতে উঠেছেন। আমি ওনার সাথে দেখা করতে গেলাম। আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভগবান দেখা দেন কেন ? জেঠু বললেন, এটা তুই নিজেই বুঝতে পারবি। তারপর বাড়ী এলাম। স্বপ্নে দেখছি – শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসে বলছেন, আমি যে তোদের মধ্যে আছি আর তোরা যে আমার সাথে এক–এটা বোঝাতেই আমি দেখা দিই। ঠাকুরের এই কথা শুনে স্বপ্নেই আমার মন আনন্দে ভরে গেল। আর দেহে একটা কম্পন অনুভব করলাম। .... ঘুম ভাঙল।

তুহিন গড়াই (বিল্টু), গড়গড়িয়া, বীরভূম

ব্যাখ্যা ঃ— এ পর্যন্ত মানুষ প্রশ্ন করে এসেছে যে ভগবান যদি আছেন তাহলে তাঁকে দেখি না কেন ? এখন অন্য প্রশ্ন। তাঁকে দেখি কেন ? আর সে প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই জানাচ্ছেন যে মানুষ স্বরূপত ঈশ্বর তা জানাবেন বলে।।

দ্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখছেন কিন্তু ইনি বস্তুত প্রেমিক জীবনকৃষ্ণ। কেননা তোরা আর আমি এক–এটি জীবনকৃষ্ণের কথা। আর শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন প্রেমের প্রতীক।

স আগত

● স্বপ্নে দেখছি (৪-১২-১৬) – বাড়ীর সকলে গাড়ী করে কোথায় একটা গেছি। সেখানে একটা বড় তাজমহল রয়েছে। একটা উঁচু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে দেখলাম

আমাদের পাঠচক্রের সকলে ঐ সিঁড়িতে বসে আছে। সিঁড়ির শেষ ধাপে স্নেহময় কাকু বসে পাঠ করছেন আর পাশে স্বয়ং ভগবান জীবনকৃষ্ণ ধুতি পরে, খালি গায়ে বসে আছেন। সেখানে আমার দাদা শুভমও বসে পাঠ শুনছে। স্নেহময় কাকু পাঠ করতে করতে বলছেন, বদ্ধজীবেরা সংসারে এমনই আবদ্ধ যে তারা ঈশ্বরচিন্তা করতে পারছে না। যেমন, একটা উপমা দিয়ে বললেন, কারও বাড়ীতে অসুখ করলে লোকে Hospital-এ যাচ্ছে, এখানে যাচ্ছে, ওখানে যাচ্ছে কিন্তু ভবরোগমুক্ত হয়ে শান্তি পাবার জন্য ঈশ্বরের কাছে কেউ আসছে না। .... ঘুম ভেঙে গেল।

সমাদ্রিত মিত্র, জ্যাংড়া, বাগুইআটি, কলকাতা

ব্যাখ্যাঃ— শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেখানো পথে ভগবৎ অনুশীলনের মাধ্যমে ভবরোগ থেকে মুক্তি ঘটে।

● দেখছি (১৮-৩-২০১৭) – একটা অদ্ভুত জন্তু – শুয়োর, মোষ, জলহস্তী ইত্যাদি বহু পশুর সমন্বয়ে গড়া একটা পশু আমাকে খেতে আসছে। আমি ওর মাথায় হাত রাখলাম। ও শান্ত হয়ে গেল। হঠাৎ মনে হ'ল আমারই রিপুগুলোর সমন্বিত রূপ ঐ পশুটি। মনে হ'ল, যাক্ জীবনকৃষ্ণের কৃপায় ও এখন আমার কন্ট্রোলে আছে।... ঘুম ভাঙল।

তরুণ ব্যানার্জী, জামবুনি, বোলপুর

● দেখছি (২৯/৩/১৭)–এক অজানা ভদ্রলোক কত সাধনতত্ত্ব বললেন, শেষে বললেন, আমি এসেছি, আমি এসেছি, সব সিদ্ধেশ্বরদের রক্ষা করতে হবে যে।.... বুঝলাম চৈতন্যের নতুন বিকাশ শুরু হয়েছে, অনুশীলনেও আসছে নতুন ধারা।

বরুণ ব্যানার্জী, বোলপুর

সিঁড়ি

● দেখছি (৩১/১২/১৬)–শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পড়ছি। হঠাৎ খেয়াল করলাম যত পড়ছি তত বাড়িটার বাইরের দিকে একটা লোহার বেশ মজবুত সিঁড়ি তৈরী হচ্ছে। বাড়ির মালিককে জিজ্ঞাসা করলাম, ঘরের ভিতর তো সিঁড়ি রয়েছে বাইরে আবার সিঁড়ি কেন? মালিক উত্তর দিল, এটা ভগবানের কাছে পৌঁছবার সিঁড়ি।...

টুম্পা অধিকারী, আমতলা, দঃ২৪পরগনা

ব্যাখ্যাঃ- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের মর্মার্থ বা দেহতত্ত্বে ব্যাখ্যার অনুশীলনের গুরুত্ব দেখাচ্ছে।

● দেখছি (১২/৩/২০১৭)– মেঝেতে মাদুরের উপর একটা বাচ্চা ছেলে শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। তার কপালে বড় একটা কালো টিপ। বাচ্চাটা মুখটা হাঁ করল। দেখি ওর

মুখের ভিতর গোটা জগৎ। শিউরে উঠলাম। ঘুম ভাঙল। দেহের ভিতর কেমন যেন উথাল পাথাল হচ্ছিল। অনেকক্ষন পর ঠিক হ'ল।

পলি ব্যানার্জী, জামবুনি, বোলপুর

ব্যাখ্যাঃ- বাচ্চা– আত্মা সন্তান। আত্মার মধ্যে জগৎ অর্থাৎ সাকারে বিশ্বরূপ দর্শনের অনুভূতি হ'ল দ্রষ্টার। আত্মাসন্তান হ'ল দ্রষ্টার আত্মিক সত্তা। তার মধ্যে জগৎ অর্থাৎ মনুষ্যজগৎ–দ্রষ্টা আত্মিকে মনুষ্যজাতির সাথে ওতপ্রোত।

● স্বপ্নে দেখছি–বিরাট দেহী একজন অজানা মানুষ আমাকে বললেন, ব্রহ্ম কী বল তো ? আমি চুপ করে আছি। কিছু বলতে পারছি না। তখন উনিই বললেন, নিজেকে চেনাই ব্রহ্মকে জানা।

সন্ধ্যা বসাক, বাগুইআটি, কলকাতা

ব্যাখ্যাঃ- দ্রষ্টার ব্রহ্মসত্তা জানাচ্ছে–'তত্ত্বমসি'।।

উপকার

● গত ডিসেম্বরে, একদিন আমি ও মা একসাথে শুয়ে শুয়ে "হে নূতন" গানটা গাইছিলাম। হঠাৎ দেওয়ালের দিকে চোখ পড়তেই স্থূলে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দেখতে পেলাম। উনি আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। খালি গা, ধুতি পরে আছেন। কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখতে পেলাম। তখন আমি গানের যে অংশটা গাইছিলাম সেটা হ'ল–"ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অসীমের চির বিস্ময়।" এটি আমার প্রথম স্থূলে দর্শন লাভ।

প্রার্থিতা ঘোষ, বেলঘরিয়া, কোলকাতা

ব্যাখ্যাঃ- তোমা মাঝে–সর্বজনীন সর্বকালীন এক মানবের মাঝে।
তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ।।

● গত ৩১/১২/১৬, রাত্রে স্বপ্নে দেখছি–স্নেহময় জেঠু এক একজন ছেলেকে দেখিয়ে বলছে, এ আমার অনেক উপকার করেছে। তারপর কী উপকার করেছে তাও বলল। কিন্তু আমার কথা কিছু বলছে না। মনে মনে ভাবছি, আমি কি কিছুই করিনি জেঠুর জন্য ? অমনি জেঠু আমাকে দেখিয়ে অন্যদের বলতে লাগল, এ আমার অনেক উপকার করেছে। কী উপকার করেছি তা বলার আগেই আমি ঘুমিয়ে গেলাম। ঘুম ভাঙল, স্বপ্নও ভাঙল।

অভিরূপ দাস (নন্দন), গড়গড়িয়া, বীরভূম

ব্যাখ্যাঃ- দ্রষ্টা তার জেঠুকে "আত্মিকে সকলে এক"–এই সত্য বোঝার অনুশীলনে সাহায্য করেছে। তাই সেকথা শোনার আগেই দ্বৈতসত্তা হারিয়ে গেল–সমাধিতে এক হয়ে গেল।। দেহ দিয়ে বুঝল।

● দেখছি (১/৪/১৭)–সমুদ্রের ধারে রয়েছি। মেয়েরা কাঠ কেটে মাথায় করে নিয়ে চলেছে। আমি সমুদ্রে ডুব দিতে চাইলাম। স্বামী ও আমি দু'জনে জলে ডুবে অনেক গভীরে চলে গেলাম। কত রঙীন মাছ দেখলাম। একদম নীচে খুব সুন্দর একটি জীবনকৃষ্ণের পাথরের মূর্তি পেয়ে খুব আনন্দ হ'ল।

পাপিয়া রায়, ইলামবাজার

ব্যাখ্যাঃ- মেয়েরা কাঠ কেটে মাথায় করে নিয়ে চলেছে–সকলেই কাঠুরে– গতর (দেহবৃক্ষ) খাটিয়ে খায়। দেহের ভিতর প্রাণসমুদ্রে সাধারণত কেউ ডুব দিতে চায় না। দ্রষ্টা দেহসমুদ্রের ভিতরে প্রাণের রহস্য ভেদ করতে চান। আর তা করতে হলে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে।

তোমার প্রকাশ হোক

● দেখছি (১১/৩/১৭)–একজন বৃদ্ধ যাদুকর আমাকে নানারঙের বিভিন্ন পোকা চেনাচ্ছেন। তাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু বলছেন।.... ঘুম ভাঙল।

সাগর ব্যানার্জী, বোলপুর

ব্যাখ্যাঃ-বৃদ্ধ যাদুকর–শাশ্বত পুরুষ শ্রীভগবান। নানা রঙের বহু পোকা– রঙীন অর্থাৎ বাহ্যত আকর্ষক নানান ধর্মীয় সংস্কার ও ভোগের জগতের কিছু দিক। কুসংস্কার চিনতে পারলে তা থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

● গত ২৬/২/১৭ রাত্রে স্বপ্নে দেখছি–একটা নতুন জায়গা। ঘরে দু'চারজন ছেলে দাঁড়িয়ে আছি। সঞ্জয়কে দেখিয়ে ওদের বলছি, এটা আমার বৌ। পাশে এক বয়স্ক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি সঞ্জয়কে বললাম, চলো, চলো, আমার দুটি সন্তান চাই। ঘুম থেকে উঠে বুঝলাম স্বপ্নে দেখা বয়স্ক ভদ্রলোক স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ।

পঞ্চানন মণ্ডল, বেহালা, কোলকাতা

ব্যাখ্যাঃ- সঞ্জয় পাঠচক্রের ছেলেদের প্রতিনিধি– এরা সহধর্মীনী। এদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জীবনকৃষ্ণকৃষ্টির অনুশীলন করলে দুটি সন্তান হবে অর্থাৎ সংস্কার মুক্তি ও একত্ব লাভ হবে।।

● দেখছি (১৪/২/১৭)–একটা ঘরে খাটের উপর উদাস হয়ে বসে আছেন বিরাট দেহী শ্রীজীবনকৃষ্ণ। তার চোখ দুটো কী বড় বড় ! একজন পঞ্চাশ বছর বয়সী লোক বাইরে থেকে ওনাকে অনুনয় বিনয় করে বলছে, আপনি আসুন না, এবার চলুন।

অনিন্দিতা ব্যানার্জী, বোরাল, উঃ ২৪ পরগনা

ব্যাখ্যাঃ- বড় বড় চোখ–জগন্নাথের চোখ বা জগন্মাতার। শ্রীজীবনকৃষ্ণ জগন্নাথ তথা বিশ্বমানব হয়ে বসে আছেন। পঞ্চাশ বছর বয়সী লোক–পঞ্চাশ বছর সময় কালের মূর্ত রূপ। ১৯৬৭ + ৫০ = ২০১৭। বর্তমান কালের দাবী–বিশ্বমানব জীবনকৃষ্ণ আরও ক্রিয়াশীল হোন ও মানুষকে একত্ব দান করুন।।

আর অভিনয় নয়

● গত ১০/১২/১৬ তারিখ রাত্রে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলাম– দেখছি আমার ছেলের জন্মদিন। অনেকে এসেছে বাড়ীতে। হঠাৎ দেখি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন এলেন অনেক মিষ্টি নিয়ে। বললাম, মিষ্টি আনলেন কেন ? আপনি এসেছেন এতেই আমি ধন্য। উনি বললেন, "তোমার ছেলের জন্মদিন বলে কথা। তাই মিষ্টি আনলাম। সকলকে মিষ্টি দাও,

তুমিও খাও।" খুব সুন্দর মিষ্টি, সবাইকেদিয়ে নিজেও খেলাম। উনি বললেন, জান, আমি আর ২০ দিন পর অবসর নিচ্ছি অভিনয় থেকে। তাই বেশ আনন্দে আছি। আমি চম্‌কে উঠলাম। সে কী কথা ! বললাম আপনি তো খুব ভাল অভিনয় করেন, এখনই ছাড়ার দরকার কী? উনি হাসলেন। আমার চোখের সামনে ওনার দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করা একটি সিনেমার দৃশ্য ফুটে উঠল। সেখানে উনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়েছেন আবার উনিই রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন। মহর্ষি অসুস্থ। বিছানায় শুয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথ পাশে বসে ঝুঁকে পড়ে বাবার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, পরিচর্যা করছেন। তার পা কিন্তু মাটিতে। অপূর্ব সে দৃশ্য। দেখতে দেখতে ঘুম ভাঙ্গল।

মহাশ্বেতা মুখুটি,কলকাতা

ব্যাখ্যাঃ- অমিতাভ– অমিত আভা যার–নির্গুণের ঘনমূর্তি। অভিনয় থেকে অবসর নেবেন--সত্যের পূর্ণ প্রকাশ হবে, নির্গুণের সরাসরি ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা যাবে সাধারণ মানুষের জীবনে। আর তখনই হবে সমষ্টির ধর্ম। আর ২০ দিন পর অর্থাৎ জানুয়ারী ২০১৭ থেকে। দ্রষ্টার ছেলের জন্মদিনে মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন–দ্রষ্টার তথা সাধারণ মানুষের জীবনে আত্মিক বিকাশকে (আত্মিকে নবজন্ম লাভকে) অভিনন্দিত করছেন। প্রত্যেকের আত্মিক সমৃদ্ধির অনুভূতি অনেকে মিলে উপভোগ করবে।

মহর্ষি–ধর্মজগতে প্রকৃত মহর্ষি হলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি নতুন সমাজের স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথ–বিশ্বমানব–ধর্মজগতে বিশ্বমানব হলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ।

মাটিতে পা – তাঁর বিশ্বব্যাপিত্বের বাস্তব প্রমাণ ফুটেছে। অসংখ্য সাধারণ মানুষ তাঁকে অন্তরে দেখে সেকথা জানিয়েছে।

অমিতাভ-ই পিতা ও পুত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছে – একই চৈতন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহে খেলা করেছে। এখন তার সত্যরূপ প্রকাশ পাবে।

● দেখছি (৫-৪-১৭) – সমুদ্রে একটা জাহাজের উপর রয়েছি। ওপারে যেতে হবে। হঠাৎ জলে লাফিয়ে পড়লাম। তলায় গিয়ে মাটি পেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ওপাড়ে চলে গেলাম। ওখানে বহু মানুষ ছিল। তারা আমাকে এভাবে পেরিয়ে যেতে দেখে বিস্মিত হ'ল।

বরুণ ব্যানার্জী, বোলপুর

ব্যাখ্যা — এক স্বপ্নে শ্রীম-কে ঠাকুর বলেছিলেন, তোমার জাহাজ থেকে নামতে দেরী আছে। এতদিন পর সাধারণ মানুষ জাহাজ থেকে নামতে পারছে। গুরু, ভগবান, পরমব্রহ্ম ইত্যাদি ছেড়ে অখণ্ডচৈতন্যের সাথে একত্ব লাভের লক্ষ্যে এগোতে পারছে। জলের উপর দিয়ে হেঁটে নয়, অর্থাৎ সংসারে নির্লিপ্ত হয়ে নয়, আর পাঁচজনের মত থেকেও বিষয় চিন্তায় তলিয়ে যাচ্ছে না। পায়ের তলায় শক্ত মাটি পাচ্ছে অর্থাৎ অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত পাঠচক্র পাচ্ছে ও চরম লক্ষ্য একত্ব রূপ ডাঙায় পৌঁছে যাচ্ছে।

● দেখছি (২৪-৩-১৭) – একটা হাঁড়িতে কিছু পোনা মাছ নিয়ে সমুদ্রের জলে

নেমে সব মাছ ছেড়ে দিলাম। মাছগুলো সমুদ্রে চলে গেলে মনে হ'ল – যাঃ, একটাও রাখলাম না। দু'একটা রাখলে বেশ খাওয়া যেত। তখন দেখি একটা জেলে আমাকে দেখে আমার মনোভাব বুঝতে পেরে মুচকি মুচকি হাসছে।

অরুণ ব্যানার্জী (শিমুরালি, নদীয়া।)

ব্যাখ্যা — ঠাকুর বলছেন, সমাধি কেমন জান ? হাঁড়ির মাছ গঙ্গায় ছেড়ে দিলে যেমন হয়। সাধারণ মানুষের এই সমাধি হয় না। হয় বহুত্বে একত্বের অনুভূতি– সমুদ্রে মাছ ছেড়ে দিলে যেমন হয়।

ব্যক্ত লীলা

● দেখছি (৫-৪-২০১৭)–আমরা অনেকে দাঁড়িয়ে আছি। আকাশে সূর্য রয়েছে। তার পাশে একটা বড় ঘড়ি। আমার হাত ধরে আছেন সন্ধ্যা জেঠিমা। ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি কেন ? কী হবে এখানে ? উনি উত্তরে বললেন, এই সূর্যটার গ্রহণ হবে আর এই পৃথিবীটাও ধ্বংস হবে। আর একটা নতুন পৃথিবী হচ্ছে সেখানে আমরা সবাই যাব। যাদের যাবার দরকার তারাই যাবে। আর নতুন পৃথিবীতে নতুন সূর্য উঠবে। এই সূর্যের পাশের ঘড়িতে যখন ১টা বাজবে তখন এই সব হবে। আমরা দেখব। জেঠিমাকে বিধবা দেখলাম। একটু পর দেখি ঐ ঘড়িতে ১টা বাজল। পুরো সূর্যটা অন্ধকারে ঢেকে গেল। কেউ যেন গ্রাস করল। আর একটা উত্তাল সমুদ্রের কালো জলের ঢেউ এসে সব ধ্বংস করে দিতে লাগল। আমরা কয়েক জন পাঠের লোক লাইন দিয়ে নুতন পৃথিবীতে যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে দেখি খুব সুন্দর প্রকৃতি আর শান্ত পরিবেশ। তারপর অরুণোদয় হ'ল। সূর্যরশ্মি থেকে আলোর রেখা দিয়ে তৈরী ছোট্ট এক মানুষ আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। ওখানে যে গুটিকয় মানুষ রয়েছে সবাই কম বয়সী যেন। সেই আলোর Out line -এর মানুষটার মাথার পিছনে খুব জ্যোতি। ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন স্নেহময় মামা। তাকেও ছোট দেখছি। আমি জেঠিমাকে বললাম, স্নেহময় মামা কী করেন ? জেঠিমা বলল, উনি ঐ আউটলাইন মানুষটার সহকারী (Assistant)। ঐ মানুষটি ওকে শিক্ষা দেয়, স্নেহময় আবার তা আমাদের বুঝিয়ে দেয়। তখন দেখি স্নেহময় মামার হাতে একটা জীবন্ত সূর্য। সেটা কথা বলে। ঐ মানুষটির মাথার পিছনের জ্যোতি ও মামার হাতের সূর্য মিশে গিয়ে আমাদের সবার হাতে একটা করে জীবন্ত সূর্য চলে এল। আমরাও তার সাথে কথা বলছি। মামার হাতেও ঐ জীবন্ত সূর্য আছে। তারপর দেখি ঐ নতুন সূর্যের পাশে উজ্জ্বল আলোয় লেখা ফুটে উঠল--"এবার হবে ব্যক্ত লীলা, সবাই পাবে।" এবার সবাই এক একটা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ঐ নতুন সূর্যের কথা বলছে। মামা সবার কাছে যাচ্ছেন ও কথা বলছেন। জেঠিমা বললেন, এবার নিজের নিজের জীবনে ফিরে যেতে হবে। সময় হয়ে গেছে। আবার নতুন সূর্যটা ডাকলে আমরা এখানে চলে আসব নতুন নতুন কথা শুনতে। নতুন পৃথিবী থেকে সবাই নিজের বাড়ী যাচ্ছি। ঐ Outline মানুষটা তখন নতুন সূর্যের সাথে মিশে গেছে। আমি নিজের বাড়ীতে

যেখানে ঘুমোচ্ছিলাম সেখানে চলে এলাম। আমার ঘুমন্ত দেহে ঢুকে পড়লাম। ঘুম ভাঙল। কিন্তু দেহটা যেন অসাড় হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ পর কষ্ট করে উঠলাম। স্বপ্নটা মনে করলেই কেমন যেন ঘোর লাগে মনে।

অর্পিতা চ্যাটার্জী, সখেরবাজার, কলকাতা

ব্যাখ্যা– শ্রীরামকৃষ্ণের যুগে ব্যষ্টির সাধন ও শ্রীজীবনকৃষ্ণের যুগে বৃহৎ ব্যষ্টি তথা বিশ্বব্যাপিত্বের সাধনে ধর্মজগৎ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে নতুন সূর্যোদয়ে বড় রকমের পরিবর্তন ও একত্বের তথা সমষ্টির ধর্মের বিকাশ শুরু হয়েছে সম্প্রতি। 'এবার ব্যক্তভাবে লীলা, সবার হবে'–সমষ্টির ধর্ম তাই সবার ধারণা হবে।

● গত ৪/২/১৭ তারিখে গভীর ঘুমের মধ্যে শুনছি–কে যেন বলছে, তোমার মাথার পর্দা গুটিয়ে গেছে, তোমার মাথার পর্দা গুটিয়ে গেছে।... ঘুম ভাঙল।

কৃষ্ণা ভট্টাচার্য্য,সখেরবাজার, কলকাতা

ব্যাখ্যা–ব্যষ্টির সাধনে মাথার পর্দা গুটিয়ে গেলে অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধারণা করা যায়। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে একত্ব লাভ হলে অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধারণা করা যায়। দ্রষ্টার একত্ব লাভ হয়েছে।।

পূর্ণিমায় খেলা হবে

● গত ৬/৩/২০১৭, ভোরবেলা স্বপ্নে দেখছি–অনুপ কাকার মায়ের শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ কার্ড রঙীন Oil Painting করা। কাকা কার্ড হাতে নিয়ে বলছে–কার্ডে অনেক বানান ভুল আছে। যেমন– Invitation শব্দটার বানানে ভুল আছে। আমাকে বলল, তোর কাছে 'ধর্ম ও অনুভূতি' বই আছে ? আমি বললাম, ১টি বাংলা ও ১টি ইংরাজী বই আছে। তখন আমার চোখে ভেসে উঠল স্নেহময়দার লেখা সবুজ রঙের কভার দেওয়া "যাত্রাপথ" বইটি। অনুপ কাকা বলল, ঐ বই দেখে কার্ড ছাপালে ভুল হতো না।

পরের দৃশ্যে দেখছি–খালি গায়ে ধুতি পরে একজন বয়স্ক লোক সঙ্গে কিছু সহচর নিয়ে বসে আছেন। তাদের মধ্যে আমিও একজন। ঐ ভদ্রলোক বললেন, আজ রাতে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় দারুণ খেলা হবে। রাত্রি ১টা থেকে ২টো। আগে যে দু'বার খেলা হয়েছিল তা অমাবস্যায় হয়েছিল। ভদ্রলোক উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা সবাই খেলবে তো ? আমি বললাম কে খেলবে না খেলবে আমি জানি না। তবে আমি তো খেলব-ই।... ঘুম ভাঙলো।

এর পরের দৃশ্যে দেখছি–পাঠে গিয়ে স্নেহময়দাকে ঐ স্বপ্নটা বলে তার অর্থ জানতে চাইলাম। উনি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না। ওনাকে অন্যেরা বারবার প্রশ্ন করছে ও উনি তাই নিয়ে আলোচনা করছেন। আমি বিরক্ত বোধ করছি।... ঘুম ভাঙ্গল।

বিষ্ণুপদ ঘোষ, বাঁধগোড়া, বোলপুর

ব্যাখ্যাঃ- 'ধর্ম ও অনুভূতি' এবং 'যাত্রাপথ' পড়লে মানুষ শ্রাদ্ধের জন্য কাউকে নিমন্ত্রণ করবে না, মানুষকে আমন্ত্রণ করবে অন্য ভাষায়– সম্মিলিত ভাবে ভগবৎচর্চা করে শোকোর্ত্তীন হবার জন্য। কার্ড রঙীন oil painting করা– শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান হ'ল showy religion । অনুপ কাকা– দ্রষ্টারই আত্মিক অবস্থা। দ্রষ্টার কাছে "ধর্ম ও অনুভূতি" থাকা সত্ত্বেও তার যথাযথ চর্চা ও চৈতন্যের ধারাবাহিক প্রকাশ (যাত্রাপথ) সম্পর্কে ধারণায় এখনও কিছু ত্রুটি আছে।

অজানা ভদ্রলোক–অখণ্ড চৈতন্যের মূর্ত রূপ। তিনি জানাচ্ছেন, আগের দুটি খেলা হয়েছে অমাবস্যায় এবার হবে পূর্ণিমায়। এর অর্থ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহে ভগবানের যে লীলা হয়েছে তা গুপ্তভাবে হয়েছে–এবার হবে ব্যক্তভাবে লীলা। শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল ব্যষ্টির সাধন–নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই তিনি নিজেকে অচিনে গাছ বলেছেন।"মাইরী বলছি, আমি ভগবানকে দেখেছি। আমাকে তোমার কী বোধ হয়? আমার ক'আনা জ্ঞান হয়েছে ?" এইসব কথা থেকে বোঝা যায় তাঁর দেহে ভগবানের লীলা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ অন্ধকারে ছিল।

শ্রীজীবনকৃষ্ণও দেখেছিলেন, অন্ধকার গর্ত থেকে চুল ধরে টেনে বের করে আনলেন অনাথবন্ধুকে। তিনি বললেন, "বাবুজী, মশাই আপনি জানবেন আপনি ভগবান কিন্তু গুপ্তভাবে লীলা।" উনি বললেন, এত বিরাট আয়োজন শুধু আমার দিক দিয়েই কেটে গেল। আমার বিশ্বব্যাপিত্বও বৃহৎ ব্যষ্টি। সাধারণ মানুষ তাঁর আত্মিক মহিমা ঘোষণা করলেও তাঁর সাথে একত্ব লাভ করে ধর্মকে বোধে বোধ করেনি–ফলে সাধারণ মানুষের ধর্ম, সমষ্টির ধর্ম ফোটে নি–তার লীলায় সাধারণের অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ হল না। তারা খেলতে পায় নি। তিনি একাই খেলেছেন।

এবার পূর্ণিমার আলোয় খেলা হবে–এবার হবে ব্যক্তভাবে লীলা–সমষ্টির ধর্ম–আত্মিকে তাঁর সাথে একত্বলাভ করে। সাধারণ মানুষেরও ধর্ম হবে।

চকোলেট

● দেখছি (৩১/৩/১৭)–আমার হাতে একটা স্টীলের স্কেল। এক মিটার লম্বা। মনে হচ্ছে ওটা খুব দামী, মূল্য একশ টাকা। একজন মেয়ে আমার কাছে ২টাকা চাইল। আমি বললাম, (দূরে একটি ঘর দেখিয়ে) ঐ যে ঘরটা দেখছ ওখানে এক মহিলা থাকে, যে যা চায় সে তাই পায় ওর কাছে। ওখানে তুমি যাও। আমার পয়সা দেবার ক্ষমতা নাই। দূর থেকেই দেখলাম ঐ ঘরে খুব ভীড়। কিছুক্ষণ পর মেয়েটি ফিরে এসে বলল, আমাকে উনি ২টাকা দিলেন। বললাম, বাঃ বেশ। ও চলে গেল। আমার মনে হ'ল স্কেলটা আমাকে ঐ মহিলাই দিয়েছেন, এটা ওনাকে ফেরৎ দিয়ে আসি। মনে হচ্ছে মেয়েটি অতি সম্মানীয়া কিন্তু বেশ্যা। তাঁকে সবাই খুব মানে। ঘর ফাঁকা হলে আমি ঐ মহিলার কাছে গিয়ে বললাম, এটি ফেরৎ

নিন। এত দামী স্কেল আমার লাগবে না। উনি সেটি নিলেন। হঠাৎ দেখি আমার ডান হাতের মুঠোয় ২টাকার কয়েন। সেটাও ওনাকে ফেরৎ দিলাম। উনি খুব খুশী হলেন। বললেন, তুমি কি নেবে ? আমি বললাম, আমি কিছুই চাই না। তখন খুব খুশী হয়ে চকোলেট ভর্তি একটা বড় কাগজের বাক্স আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। আমি কী করব বুঝতে পারছি না। হঠাৎ মনে হ'ল এটা নেওয়া যেতে পারে–বাচ্চা ছেলেদের দেব।... ঘুম ভাঙল।

স্নেহময় গাঙ্গুলী, চারুপল্লী, বোলপুর

ব্যাখ্যাঃ- স্কেল– মাপকাঠি–আদর্শ। খুব দামী স্কেল–সর্বজনীন সর্বকালীন মানুষের জীবনাদর্শ। স্কেল ফেরৎ দিলাম–একটা আদর্শ সামনে রেখে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে আত্মিক অবস্থার পরিমাপ করার আর দরকার নেই। একত্ব লাভ হলে মানুষটা ভিতরের দেবত্ব দ্বারা পরিচালিত হবে এবং সকল মানুষের আত্মিক সমতা সে উপলব্ধি করবে।

হাতের মুঠোয় ২ টাকার কয়েন (Coin)– ৩২ আনা তথা বিশ্বব্যাপিত্বের অনুভূতিও দ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। একত্ব লাভ হলে পূর্ণ অদ্বৈতবোধের স্ফুরন হয়। অজ্ঞাতসারে আপনা হতে দ্বৈত বোধ ত্যাগ হয়ে যায়।

ঐ মহিলা–জগৎচৈতন্য–প্রথম পর্যায়ে যিনি মহামায়া রূপে প্রতিভাত হন। রামেরই ভুবনমোহিনী মায়া। তিনি পার্থিব কামনা জাগিয়ে তোলেন ও তা পূরণ করে মনোরঞ্জন করেন–এই অর্থে তিনি বারাঙ্গনা। সবচেয়ে সম্মানীয়া–তিনিই পারেন মানুষের সকল মনস্কামনা পূরণ করতে। ঠাকুর বলছেন, মা-কে দেখলাম রতির মা'র বেশে। রতির মা নষ্ট মেয়েছেলে। কিন্তু তার রূপে মা-কে দেখলুম। বাইবেলে Revelation-১৭ অধ্যায়ে এমন নারীকে দর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন জন (John), যে নারী সবচেয়ে সম্মানীয়া অথচ সকল পাপাচার ও যৌনতার উৎস। ঠাকুরও তাই বলছেন, কুক্কুর কুক্কুরীর রমণের মধ্যেও মা-কে দেখলাম। ইনি মহামায়া। তাই দুর্গাপূজায় বারাঙ্গনার বাড়ীর উঠোনের মাটি লাগে।

২টাকার কয়েন–৩২আনা সাধনতত্ত্ব, Universalism সম্বন্ধে জ্ঞান। মেয়েটি ২ টাকার কয়েন চাইল ও পেল–বৃহৎ ব্যষ্টির অর্থাৎ ভগবান জীবনকৃষ্ণের পরিচয় পেয়ে সন্তুষ্ট থাকল যে জগৎ তার প্রতীক।

চকোলেট–আত্মিক একত্বের অনুভূতি। প্রাচীন মায়া ও অ্যাজটেক সভ্যতায় চকোলেট ঈশ্বরের খাবার হিসাবে গণ্য হ'ত।

বাচ্চা ছেলেদের দেব–আধ্যাত্মিক জগতের নতুন পর্যায়ের লীলায় যারা প্রবেশ করেছে তাদের সাথে ভাগ করে খাবেন ঈশ্বরের সর্বোৎকৃষ্ট উপহার–একত্বের দিব্যানুভূতি।

● দেখছি (১৩/০২/১৭)–কে যেন বলল, দ্যাখ দ্যাখ ছেলেটাকে কেমন সাজাচ্ছে। তখন দেখি বদিদা ছোট্ট জয়কে কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বরবেশে সাজাচ্ছে। মনে হ'ল আরে, এ তো মানুষরতন।...ঘুম ভাঙল।

বরুণ ব্যানার্জী, বোলপুর

ব্যাখ্যাঃ- বদিদা– জীবনকৃষ্ণ। চন্দন দিয়ে সাজাচ্ছে– নিজের দেবত্ব দিয়ে আত্মিকে বিশেষ রূপ দান করছেন।

ঘোড়ায় চড়ে সন্ধ্যা দেওয়া

● দেখছি (ফেব্রুয়ারী-২০১৭)– কলকাতা থেকে জেঠিমারা এসেছেন। একটা দোতলা ঘরে উঠেছেন। দোতলার যে ঘরে ওনারা রয়েছেন তার পাশের ঘরে পবিত্র জেঠু আছে মনে হচ্ছে। আমি ঐ ঘরের দরজায় দাঁড়ালাম। হঠাৎ স্নেহময়দা ছুটে এসে ঐ ঘরে ঢুকে জেঠুর পিঠের ঘায়ের পুঁজরক্ত বের করতে লাগল। দেখি, জেঠু দেখতে ঠিক মহাত্মা গান্ধীর মত। দাদা আমাকে পুঁজরক্ত মাখানো তুলো দিয়ে বলল, এটা ফেলে দিয়ে আয়। ফেলতে গিয়ে দেখি পাশের বাড়ীর এক বৌমা ঘোড়ায় চড়ে হাতে জলন্ত প্রদীপ নিয়ে সন্ধ্যা দিচ্ছে। অবাক হয়ে এই আশ্চর্য কাণ্ড দেখতে লাগলাম। একটু পর সন্ধ্যা দেওয়া শেষ করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল মেয়েটি।.... ঘুম ভাঙল।

বিশাখা চ্যাটার্জী, জামবুনি, বোলপুর

ব্যাখ্যা ঃ- পবিত্র জেঠু– শুদ্ধতম ব্রহ্ম–জীবনকৃষ্ণ। তিনি মহাত্মা–সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। জীবনকৃষ্ণের লেখা "ধর্ম ও অনুভূতি" গ্রন্থ এক অর্থে তার দেহ। পুঁজরক্ত বের করে দিল--পাণ্ডুলিপি দেখে 'ধর্ম ও অনুভূতি'–র ভুল সংশোধন করল।

পুঁজ রক্ত লাগা তুলো ফেলা–অনার্যকৃষ্টির দূষণমুক্ত হওয়া। ভক্তির গোঁড়ামি ত্যাগ করা।

ঘোড়ায় চড়ে সন্ধ্যা দেওয়া–একাধারে বৈদিক কৃষ্টি (ঘোড়ায় চড়া)ও অনার্য কৃষ্টির (প্রচলিত সন্ধ্যা দেওয়া) সহাবস্থান। তাই বৈদিক কৃষ্টির সুফল আত্মিক একত্বের মহিমা অনুভব করা যাচ্ছে না।।

● স্বপ্নে দেখছি (২৫/২/১৭)–দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের বাড়ির পশ্চিম বারান্দায় গঙ্গার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছি। দেখি বেলুড় মঠের দিক থেকে নীল আলোর একটা গোলক ছুটে আসছে। মনে হ'ল ওর এত তেজ যে আমার গায়ে ঠেকলে আমি মারা যাব--সহ্য করতে পারব না। হঠাৎ গঙ্গার জলের ভিতর থেকে ধ্যানমগ্ন জীবনকৃষ্ণ উঠে এলেন। ঐ জ্যোতির্গোলক জীবনকৃষ্ণের দেহে ঢুকে গেল। তারপর জীবনকৃষ্ণের দেহ থেকে আর একটি জ্যোতির্গোলক বেরিয়ে এসে আমার দেহে ঢুকল। কোন অসুবিধা হ'ল না, বরং তীব্র আনন্দে দেহ মন ভরে গেল।.... বুঝলাম, নীল জ্যোতির্গোলক অর্থাৎ সমষ্টি চৈতন্যকে আমরা জীবনকৃষ্ণের মধ্যে দিয়ে বুঝতে পারবো।

চন্দ্রাশিস মুখার্জী, সখেরবাজার, কলকাতা

মহাকাশে পাঠ

● গত ২৩/৪/১৭ রাত্রে স্বপ্নে দেখছি–নাসার মত একটা জায়গা। সেখান থেকে মহাকাশে যাওয়া হবে। কিন্তু মহাকাশে যাবার আগে সবার হাতের ছাপ, চোখের কন্টাক্ট (Contact) মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। সবুজ রশ্মি বেরিয়ে স্ক্যান হচ্ছে। আমাদের হাতের ছাপ ও অন্যান্য তথ্য আগে থেকেই কম্পিউটারে জমা করা ছিল। তাই আমরা মহাকাশে যাবার ছাড়পত্র পেলাম। আমাদের ব্রেন স্ক্যান হ'ল। তাতে সবার Past history কম্প্যুউটারে জমা হল। স্নেহময়দা বলল, Past history (অতীত ইতিহাস) আবশ্যিক নয়, তবে দরকার (Desirable)। পারকিন্‌সন্স রোগ যেমন বংশগত (Hereditary) তেমনি আত্মিকেও কিছুটা হলেও Heredity বর্তায়।

এরপর দেখছি– আমরা মহাকাশে চলে গেছি। ওখানে পাঠ হচ্ছে। স্নেহময়দা পাঠ করছে। স্নেহময়দা বলছে, কারোকে এখন পাঠের কথাগুলো কষ্ট করে মনে রাখতে হবে না, সব আপনা হতে মাথায় স্টোর (store) হয়ে যাবে। স্বপ্নে কোন মানুষকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে স্ক্যান হয়ে বোঝা যাবে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। স্বপ্নের ব্যাখ্যা ব্রেনে ফ্লাশ করবে। ধর্ম কষ্ট করে করতে হয় না।

তখন আমি বলছি, দাদা আমার তো খুব কষ্ট। আমি পাঠে আসতে পারি না। দাদা বলল, কীসের কষ্ট ? মনটা তো পাঠে আসতেই পারে। শরীর না হয় না এল। ওখানে দেখছি পাঠ কেউ রেকর্ড করছে না। দাদা বলেছে, পাঠ রেকর্ড করতে হবে না, সব ব্রেনে স্টোর থাকবে। শুনে খুব আনন্দ হ'ল।... ঘুম ভাঙল।

পিউ কয়াল, সখের বাজার, কলকাতা

ব্যাখ্যা–মহাকাশে পাঠ–একত্ব লাভ করে দেহজ্ঞান শূন্য হয়ে ভগবৎ কথা অনুশীলন। দেহের নানা তথ্য ও Past history নেওয়া হচ্ছে– পূর্ব-পুরুষের ঈশ্বরীয় সংস্কার থাকলে সহজে নির্বাচিত হয়। পাঠের কথা মনে থাকবে– একত্ব লাভ হলে পাঠের কথা মনে থাকবে, প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তা মনে পড়বে। স্বপ্নের ব্যাখ্যাও ব্রেনে ফ্লাশ করবে।।

নব কল্পতরু

● গত ১লা জানুয়ারী ভোরে স্বপ্নে দেখছি–অদ্ভুত একটা গাছ। তার একদিকটা তুলসী গাছ আর অপর দিকটা পেঁপে গাছ। তাতে কী সুন্দর বেগুনী রঙের ফুল ধরেছে। আমি খুব অবাক হয়ে দেখছি।....

সোমা পাল,আমতলা, দঃ২৪ পরগনা

ব্যাখ্যাঃ- কল্পতরু। এ যুগের কল্পতরু শ্রীজীবনকৃষ্ণ। তার বৈশিষ্ট্য হ'ল তিনি ভক্তির পরাকাষ্ঠা– রামকৃষ্ণপ্রেমে রামকৃষ্ণময়–তুলসী গাছ। আবার পরিণত বয়সে বিশ্বমানব রূপে বিকশিত- পেঁপে গাছ। তাঁকে পেয়ে বহুরূপতার মায়ার রহস্যভেদ তথা বহুত্বে একত্বের চৈতন্য লাভ সম্ভব হয়। মায়া যে ঈশ্বরের এক প্রকাশ। কেননা এক–ই বহু হয়েছে, তাই ফুলটি বেগুনী রঙের–মায়ার রঙে রঙীন।।

● দেখছি (৬/২/১৭)–শূন্য থেকে এক ঋষি নেমে এলেন। নীচে শ্রীরামকৃষ্ণ বসেছিলেন। ঋষি তাঁর দেহে ঢুকে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ চম্‌কে উঠলেন। তার দেহ আলোড়িত হ'ল। যেন একটু বেগ পেলেন। একটু পর ঐ ঋষি রামকৃষ্ণের দেহ থেকে বেরিয়ে কিছু দূরে বসে থাকা জীবনকৃষ্ণের দেহে ঢুকে গেলেন। জীবনকৃষ্ণ কিন্তু চম্‌কে উঠলেন না বা এতটুকু কেঁপেও উঠলেন না। খুব স্বাভাবিক থাকলেন।... ঘুম ভাঙল।

সবিতা ঘোষ, চারুপল্লী, বীরভূম

ব্যাখ্যাঃ–শ্রীরামকৃষ্ণের ঋষিত্ব লাভ সম্পূর্ণ হয় নি। কেননা তাঁর পূর্ণাঙ্গ বেদান্তের সাধন হয় নি। তিনি বেদমতে পরমহংস ছিলেন। বেদান্ত মতে সিদ্ধ হলে তিনি বহু মানুষের মধ্যে চিন্ময় রূপে ফুটে উঠতেন। ১২ বছর ৪মাসের পরিবর্তে মাত্র ১১ মাস তোতাপুরীর উপস্থিতিতে তার বেদান্তের সাধন হয়েছিল। তিনি বলতেন, 'ব্রহ্মজ্ঞানকে আমার কোটি নমস্কার।'

ডুব দে রে মন

● দেখছি (১৮/৪/১৭)–একটা পাঠচক্রে পাঠে যোগ দিতে গেছি। সেখানে গেট পাশ লাগে। দেখি আমার হাতে আমার-ই ছোট ফটো রয়েছে–ওটাই আমার গেট পাশ। ওখানে ঢুকে দেখি প্রত্যেকের হাতে গেট পাশ হিসাবে আমার-ই ফটো রয়েছে। খুব অবাক হ'লাম।...

শ্রীমন্ত গড়াই (বান্টি),গড়গড়িয়া, বীরভূম

ব্যাখ্যাঃ- এ যুগে, আমি ও মনুষ্যজাতি আত্মিকে এক– এই বোধ নিয়ে পাঠে অনুশীলন শুরু করতে হবে।

● দেখছি (ফেব্রুয়ারী-২০১৭)– অনেকে মিলে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছি। কেউ সমুদ্রে নামছি না। মনে পড়ল, স্নেহময় বলেছিল–সমুদ্রে ডুব দিলে তবে একত্ব হবে। তখন একাই এগিয়ে গিয়ে হাঁটু পর্যন্ত জলে নামলাম। তারপর ফিরে এলাম। পরদিন আবার সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। ধীরে ধীরে সমুদ্রে গলাজল পর্যন্ত নামলাম। বেশ ভাল লাগছিল। তারপর ফিরে এলাম হোটেলে। তৃতীয় দিন সমুদ্রে নেমে জলে ডুব দিলাম। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। ফিরে এসে স্নেহময়কে দেখে আনন্দে চিৎকার করে বললাম আমি একত্ব লাভের আনন্দ পেয়েছি, একত্ব লাভ করেছি।....

নিভা চোংদার, কেষ্টপুর, কোলকাতা

ব্যাখ্যাঃ- তিনদিন– তিন যুগ। শ্রীরামকৃষ্ণের যুগ, শ্রীজীবনকৃষ্ণের যুগ ও বর্তমান যুগ। এ যুগে একত্ব লাভ (সাধারণের) বাস্তবে হচ্ছে।

● দেখছি (১৫/১২/২০১৬)–স্নেহময় পাঠ করল। তারপর দেখি আমার পাশে আর একজন স্নেহময়। তাকে বললাম, তুমি এই স্নেহময়কে চেনো ? বলল, না। বললাম,

সে কী ! ও তো বোলপুরে-ই থাকে। তুমিও বোলপুরে থাক, অথচ চেনো না ? এসো আলাপ করিয়ে দিই। দু'জনের আলাপ করিয়ে দিলাম। ঘুম ভাঙল একরাশ বিস্ময় নিয়ে।

দিপালী দাস, ঢাকুরিয়া, কলকাতা

ব্যাখ্যাঃ- পাঠক স্নেহময়– দ্রষ্টার অনুচৈতন্য সত্তা। দ্রষ্টার পাশে বসা স্নেহময়–সমষ্টি চৈতন্যসত্তা। আলাপ করিয়ে দিলাম —অনুশীলনের মাধ্যমে আপন সত্তার পূর্ণ রূপকে, সমষ্টিচৈতন্যকে, বুঝতে সাহায্য করে পাঠের মানুষেরা।

পাঠ প্রসঙ্গে

পাঠে আলোচনা প্রসঙ্গে জেগে ওঠা নতুন ভাবনার কিছু চিত্র এখানে প্রকাশ করা হ'ল–

১. প্রবর্তক-সাধক-সিদ্ধ ও সিদ্ধের সিদ্ধ। —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

ব্যষ্টির সাধনে এর অর্থঃ

প্রবর্তক–যাদের মনে আত্মজিজ্ঞাসা জেগেছে–'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'। শ্রীরামকৃষ্ণ শিশুকালে লাহাদের অতিথি শালায় সাধুসঙ্গ করেন ও অন্তরে ভগবানকে জানার ইচ্ছা জাগে। এটি তার প্রবর্তক দশা।

সাধক--সচ্চিদানন্দ গুরু লাভের পর কুণ্ডলিনী জাগরণ ও দর্শন অনুভূতি শুরু হয়-–সাধন শুরু হয়–এটি সাধক অবস্থা।

সিদ্ধ–আত্মা বা ভগবান দর্শন হলে সাধক সিদ্ধিলাভ করেন–এটি সিদ্ধ অবস্থা।

সিদ্ধের সিদ্ধ–অবতারতত্ত্বের সাধনে মানুষরতন দর্শন হলে, সাধক দেহের ভিতর ভগবানকে বয়ে নিয়ে বেড়ান তখন তিনি সিদ্ধের সিদ্ধ। যেমন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।

বিশ্বব্যাপিত্বে এর অর্থঃ

প্রবর্তক–শ্রীজীবনকৃষ্ণ ১২ বছর ৪ মাস বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখেন ও ঈশ্বরীয় ভাবনা ও ঈশ্বরপ্রেম জন্মাতে শুরু করে। তখন তিনি প্রবর্তক। ভগবান দর্শনের ইচ্ছা জাগেনি–কিন্তু ভগবানের একরূপ সচ্চিদানন্দগুরুর প্রতি প্রেম জন্মেছিল। সর্বদা রামকৃষ্ণ নাম করতেন। তাঁকে স্বপ্নে দেখার জন্য ব্যাকুল থাকতেন।

সাধক–ষোলআনা আত্মা বা ভগবান দর্শনের পর প্রকৃত সাধন, আত্মার সাধন, শুরু হয় তাঁর জীবনে।তখন তিনি সাধক। জীবনকৃষ্ণ তাই বললেন, ভগবান দর্শন ? সে তো ম্যাট্রিক পাশ। আত্মিক জগতে প্রথম ধাপ উত্তরণ– এটি চূড়ান্ত লক্ষ্য পূরন নয়। বেদান্তের সাধনে স্থিতসমাধি লাভ হলে তবে চূড়ান্ত লক্ষ্য, বিশ্বব্যাপিত্ব লাভের শর্ত পূরণ হয়। রাজযোগ না হলে এটি হয় না।

সিদ্ধ–ষোল আনা বেদান্তের সাধন ও অবতারতত্ত্বের সাধন হয়ে মানুষ রতন দর্শন হলে সাধক সিদ্ধ হন। মানুষরতন নিজেই বলে দেন, 'আমি তোর ভিতর ভক্তির অবতার হয়ে আছি।' সাধক অবতারত্ব লাভ করেন। জীবনকৃষ্ণ এক স্বপ্নে দেখছেন– "অবতারদের ঘরে গেছেন। তারা ওনার জামা হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে বলছেন, এমন সুন্দর জামা আর হয় না।" অর্থাৎ অবতার বরিষ্ঠ হলেন তিনি।

সিদ্ধের সিদ্ধ–বিশ্বব্যাপিত্ব লাভ– জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সংখ্যাতীত মানুষের দেহাভ্যন্তরে নিজ দেহের চিন্ময়রূপে ফুটে ওঠা। সর্বজনীন ও সর্বকালীন হয়ে ওঠা। তাঁকে অন্তরে দেখে সাধারণ মানুষ বোঝে একজন জীবন্ত মানুষ ভগবান হন। আর দ্রষ্টারা তার ব্রহ্মত্বের আস্বাদন পান ও প্রকৃত ভক্তি লাভ করেন।

সমষ্টির ধর্মে এর অর্থঃ-

প্রবর্তক–বিশ্বমানবকে অন্তরে দেখে ভগবানকে জানার সত্যকার ইচ্ছা জাগলে তিনি প্রবর্তক হন।

সাধক– সর্বজনীন ও সর্বকালীন মানবকে নির্গুনের ঘনমূর্তি রূপে ভিতরে দেখে (স্বপ্নে, ধ্যানে ইত্যাদিতে) অফুরন্ত দর্শন অনুভূতির দ্বার খুলে গেলে সংস্কার উচ্ছেদের অনুশীলন শুরু হয়। এটি সাধক অবস্থা।

সিদ্ধ– ষোল আনা সংস্কার উচ্ছেদ ও অদ্বৈতের উপলব্ধি হয়। বৈধী ধর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। পূজা, শ্রাদ্ধ, প্রসাদ খাওয়া, ইত্যাদি উঠে যায়। দেবস্বপ্নের যথাযথ গুরুত্ব উপলব্ধি হয় ও তার অনুশীলন স্থায়ীভাবে চলতে থাকে। দ্রাবিড়ী, অনার্য ও সেমেটিক কৃষ্টি অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক ধর্মের গোঁড়ামি সরে যায়। অনেক স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয় ও সেই ব্যাখ্যা যে ঠিক হচ্ছে অন্যের স্বপ্নে তার সমর্থন পাওয়া যায়।

একজন সর্বজনীন সর্বকালীন মানুষের রূপে সমষ্টিচৈতন্য প্রকাশ পায়–এটি উপলব্ধি ও তার সাথে একত্ব লাভ করে চৈতন্যের সাগরে প্রতিটি মানুষ এক একটি ঢেউ-–অনুভূতি সাপেক্ষে এই সত্য উপলব্ধি হয় যখন, তখন সে প্রকৃত সিদ্ধ হয়।

এই একত্বলাভ হলে, নির্গুণের অনন্ত তেজ ভিতরে জাগলে, এবং তার দ্বারা আত্মিকে নিয়ন্ত্রিত হলে তবেই সাধারণ মানুষ ষোলআনা সিদ্ধ অর্থাৎ সংস্কারমুক্ত হতে পারবে। তখন তারা অপরকে একত্বের বোধ দানে সাহায্য করতে তথা সিদ্ধের সিদ্ধ হওয়ার পথে যাত্রা শুরু করবে। অবশ্য সেই পথ চলা হবে বিরামহীন । তখন জীবনে নতুন এক কৃষ্টি জেগে উঠতে শুরু করবে–একত্বের কৃষ্টি।

৪. স্বপ্নে পাকা আম খাওয়া আর আমসত্ত্ব খাওয়ার মধ্যে পার্থক্য কি ?

পাকা আম–শ্রীভগবানের যুগোপযোগী যে লীলা হচ্ছে তা আস্বাদন করা। যেমন এযুগে জীবনকৃষ্ণ লীলার পরিচয় লাভ– অনুভূতিতে।

আমসত্ত্ব–পূর্ববর্তীযুগে শ্রীভগবানের যে লীলা হয়েছে তা অনুভূতি সাপেক্ষে জানা। যেমন এখন কেউ মহাপ্রভু বা শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখল, রামকৃষ্ণের বানী অনুভূতি হয়ে দেহে ফুটে উঠল–সেই ঈশ্বরীয় আনন্দ আস্বাদন হ'ল আমসত্ত্ব খাওয়া।

৫. কানার হাতি দেখা।

কতকগুলো কানা একটা হাতির কাছে এসে পড়েছিল। একজন লোক বলে দিল, এ জানোয়ারটির নাম হাতি। তখন কানাদের জিজ্ঞাসা করা হল, হাতিটা কী রকম ? তারা হাতির গা স্পর্শ করতে লাগল। একজন বলল, হাতি একটা থামের মত। সে কেবল হাতির পা স্পর্শ করেছিল। একজন বলল, কুলোর মত। সে হাতির কান স্পর্শ করেছিল। এইরকম যারা শুঁড়ে, কী পেটে হাত দিয়ে দেখেছিল তারা নানা রকম বলেছিল। তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে সে মনে করে ঈশ্বর এই রকম, আর কিছু নয়।

কানা (one eyed)–একচক্ষু, যাদের বাহ্যদৃষ্টি আছে কিন্তু জ্ঞানচক্ষু ফোটেনি। তারা বড়জোর ষষ্ঠ ভূমিতে ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন–ইষ্টমূর্তি দর্শন করতে পারে। একজন অজানা লোক অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ গুরু দেখিয়ে বলে দেয়, এই তোমার ইষ্ট। এই ইষ্টমূর্তি বংশপরম্পরায় আগত সংস্কারজ ঈশ্বরীয় ভাবনার প্রতীকায়িত রূপ। কেউ তার ইষ্টরূপে 'কালীমূর্তি' দেখে, কেউ দেখে রাম, কেউ শিব, কেউ কৃষ্ণ ইত্যাদি বিভিন্ন রূপদর্শন করে।

এ হ'ল অখণ্ড চৈতন্যের আংশিক অনুভূতি যা মানুষকে সত্য জানায় না, অথচ মানুষ ভাবে সে সত্যদর্শন করেছে, পূর্ণ ভগবানকে দর্শন করেছে।

কানারা হাতির কাছে না এসে হাতি যদি নিজে থেকে কারও কাছে আসে ও স্পর্শ করে অর্থাৎ ভগবান যদি কাউকে কৃপা করে বরণ করেন তিনি ঈশ্বরের পছন্দের লোক হন-- তার জ্ঞানচক্ষু ফোটে ও পূর্ণাঙ্গ হাতিটিকে অর্থাৎ ষোলআনা ভগবানকে তিনি দেখতে পান। যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণ জ্যোতির সমুদ্রে অঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মা দর্শন করলেন। কেউ একজন বলে দিলেন, এই ভগবান, এই ভগবান দর্শন। তিনি তখন বুঝলেন, ঠিক ঠিক ভগবান দর্শন কাকে বলে। অন্যেরা হাতি দেখেনি, অনুমান করেছে মাত্র, তাই তাদের দেওয়া হাতির বিবরণ সঠিক নয়।

ভগবান ঠাকুরকে নির্বাচন করলেন ও অংশত তার সাথে এক করে নিলেন, ব্যক্তিগতভাবে ভগবানত্ব দান করে। তিনি ভক্তি ভক্ত নিয়ে থাকতে লাগলেন। কিন্তু কানারা তার মুখে হাতি সম্বন্ধে নানা কথা শুনলেও তাদের কানা চোখ ঘুচল না, ফলে স্পষ্ট ধারণা হ'ল না। যে যার নিজের মতো করে তাঁর বাণীগুলির মানে করে নিল।

এলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। স্বপ্নে দেখলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে। ভিতরে পেলেন। পরে যখন তার জ্ঞানচক্ষু উন্মোচন হ'ল ও ষোল আনা আত্মা সাক্ষাৎকার করিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আত্মার মধ্যে লীন হলেন, বুঝলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ হাতিরই অর্থাৎ আত্মারই অংশ ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে যেদিন স্বপ্নে দেখেছিলেন সেদিনই হাতির স্পর্শ পেয়েছিলেন, ভগবান বরণ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন হাতিটির শুঁড়, গুরু রূপে সচ্চিদানন্দ। পূর্ণাঙ্গ হাতি বা ষোলআনা আত্মা দর্শন করে তিনি তার সাথে এক হয়ে গেলেন পূর্ণ মাত্রায়। রামকৃষ্ণের ভাষায় ''তদাকারকারিত'' – নুনের ছবি সমুদ্র মাপতে গিয়ে জলে গুলে গেল। তিনি হাতি হয়ে গেলেন। পরে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বহু মানুষের অন্তরে চিন্ময় রূপে ফুটে উঠতে লাগলেন। তারা জ্ঞানচক্ষু লাভ করে তাঁরই রূপে পুরো হাতিকে তথা শ্রীভগবানকে, অখণ্ড চৈতন্যকে, দর্শন করতে লাগল।

বীরভূমের ইলামবাজারের সমরেশ চ্যাটার্জী স্বপ্নে দেখলেন, একটা হাতি এগিয়ে আসছে তার দিকে। কে যেন বলল, এই হাতি যাকে স্পর্শ করবে সে যা চাইবে তাই পাবে। হাতিটা শুঁড় দিয়ে দ্রষ্টার মাথা স্পর্শ করল। তখন দ্রষ্টার সব কামনা উবে গেল। সে হঠাৎ মনে মনে প্রার্থনা জানালো, আমি এখন ভগবানকে দেখতে চাই। অমনি সামনের সবকিছু অদৃশ্য হয়ে গেল, খুব জোর শব্দ হয়ে যেন আকাশ দু'ভাগ হয়ে গেল। আর মাঝখান থেকে বেরিয়ে

এলেন সিংহাসনে উপবিষ্ট অনিন্দ্যকান্তি শ্রীজীবনকৃষ্ণ – দ্রষ্টার বোধ হচ্ছে, এই তো ভগবানের মোহন রূপ।

এইভাবে কানাদের কানাচোখ ঘুচে যেতে লাগল তাঁকে ভিতরে দেখে। সাধারণ মানুষের এই দর্শন ২য় স্তরের দর্শন – বস্তুতত্ত্বের দর্শন নয়। তাই তারা ২য় স্তরে ঈশ্বরের সাথে বিমূর্ত একত্ব লাভ করছে। বর্তমানে কখনও কখনও নির্গুণের দ্বার খুলে গিয়ে ক্ষণকালের জন্য হলেও পূর্ণ (Absolute) একত্ব লাভ সম্ভব হচ্ছে। অর্থাৎ হাতির পিঠে চড়ে হাতির মহিমা অনুভব করছে, আর এই-ই সাধারণের ধর্ম, সমষ্টির ধর্ম তথা Universal Religion.

কাটোয়ার সনাতন সাহার স্বপ্নদর্শনে এই ইঙ্গিতই আছে। দ্রষ্টা দেখছেন তিনি ও তার বন্ধু জামাল ট্রেনে উঠলেন। হঠাৎ খেয়াল হ'ল ট্রেনটা কোন ইঞ্জিনে টানছে না– একটা হাতিতে টানছে – আর দ্রষ্টা হাতিটির পিঠে চড়ে বসে রয়েছেন। সামনে পাহাড়ের মত উঁচু জায়গা। দ্রষ্টা ভাবছেন ট্রেনটিকে এত উঁচু ঢিবি পার করা হাতিটির পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন হাতিটি অনায়াসে ট্রেনটিকে ঢিবির ওপারে নিয়ে গেল। খুব আনন্দ হচ্ছে ..... ঘুম ভাঙল।

১৯৬০ সালে ২১শে মার্চ শ্রীজীবনকৃষ্ণ দুপুরে ধ্যানে দেখলেন একটা বিরাট হাতি। উনি হাতিটির দাবনার কাছে দাঁড়িয়ে। অমর নামে একজন লোক ছুটে এসে হাতিটিকে ছুঁয়ে দিল। অমনি হাতিটি অমরকে শুঁড়ে করে জড়িয়ে শূণ্যে তুলে ধরে রইল।.... মানুষের দেহে অমরত্বের কোষ আছে। শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহে অমরত্বের কোষ উন্মুক্ত হয়েছে। উনি যখন বিশ্বব্যাপী হলেন তখন ওনার অমরত্ব বা অমৃতত্ব হাতিকে স্পর্শ করল। এখানে হাতি হ'ল ঈশ্বরের অপর রূপ এই মনুষ্যজাতি। মনুষ্যজাতি অমরকে অর্থাৎ জীবনকৃষ্ণের দেহে প্রকাশিত অমৃতত্বকে জানতে সক্ষম হ'ল। শুঁড়ে করে তুলে ধরল মানে, মানুষ তাঁর মৃত্যুঞ্জয়ী সত্তাকে উপলব্ধি করল ও ধারণা করল। এটা কিন্তু ভবিষ্যতের কথা, যার সূচনা বর্তমান বর্ষ থেকে, কেননা ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে কদমতলার ঘরের একজন (শ্রী শৈলেন রায়) স্বপ্নে দেখেছিলেন, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, তার সবটুকু আলো এসে পড়েছে শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহেতে। অন্য কোথাও আলো পড়েনি। অর্থাৎ জীবনকৃষ্ণের বিশ্বব্যাপীত্বও ছিল বৃহৎ ব্যষ্টি। এতদিনে তা স্পর্শ করছে মনুষ্যজাতিকে। তাই শুদ্ধমন হয়ে মানুষ তার অমৃতত্ব আস্বাদনে সমর্থ হবে। নিউ আলিপুরের মঞ্জুশ্রী দেবী (করগুপ্ত) স্বপ্নে দেখলেন, তার দাদা হিমাংশুকে অনেকে মিলে কেটে ফেলে সকলে একটুকরো করে মাংস নিল আর ওনার হাতে ধরিয়ে দিল এক টুকরো মাছ। ওনার কিন্তু কোন দুঃখ হচ্ছে না, ব্যথা লাগছে না মনে।

হিমাংশু মানে চাঁদ বা চাঁদের কিরণ – অমৃতত্ব যা আবদ্ধ হয়েছিল জীবনকৃষ্ণের দেহে তা এবার আস্বাদনে ব্যাকুল ও সমর্থ হচ্ছে জগৎ, তবে তা আত্মিক জগতে, একথা বোঝাতে দ্রষ্টার হাতে এক টুকরো মাছ দিল।

আত্মিকে তার সাথে একত্ব লাভ করে মানুষ উপলব্ধি করবে অমৃতের সেও অধিকারী – এ যেন তারই অমৃত। তাই সাগর ব্যানার্জী স্বপ্নে দেখলো – সে মামার বাড়ী আসছে। পথে মনে হচ্ছে, আমি তো স্বপ্নে নিজের স্তনদুগ্ধ পান করেছি, আবার মনে হচ্ছে জীবনকৃষ্ণ তো মনুষ্যজাতির স্তন পান করেছেন। তাহলে আমি নিজের দুধ খেলাম কেন ? ....বস্তুত জীবনকৃষ্ণের দেহে সংকলিত জগৎচৈতন্যকে, অমৃতকে মানুষ আজ নিজের করে পাচ্ছে। মানুষের মনে তা সদা ক্রিয়াশীল থেকে তাকে একত্বের চেতনা লাভের পথে চালিত করবে।

৬) ''বেদে আছে হোমা পাখীর কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখী থাকে। সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়লে ডিমটা পড়তে থাকে। কিন্তু এত উঁচু যে, অনেকদিন থেকে ডিম পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোখ ফোটে ও ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে সে পড়ে যাচ্ছে, মাটিতে পড়লে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখী মা'র দিকে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায়।"

বেদে আছে হোমাপাখীর কথা – বেদে নির্গুণ ব্রহ্মের কথা আছে। নির্গুণ ব্রহ্মই মা হোমা পাখী। হোমাপাখীর ডিম – অজানা পুরুষ রূপে সচ্চিদানন্দগুরু। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোল– সচ্চিদানন্দগুরু জানা মানুষ হলেন। চোখ ফোটা –জ্ঞানচক্ষু লাভ। মাটিতে পড়লে চুরমার হয়ে যাব–দেহজ্ঞান জাগলে, **বিষয়াসক্তি ও** বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আসক্তি জাগলে, যোগবিচ্যুত হব। তার **বিষয় কথা ও** নারীসঙ্গ সহ্য হয় না, বুঝতে পারেন এটি যোগবিরোধী – দেহে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। মার কাছে চোঁচা দৌড় – মা হয়ে ওঠার পথে তিনটি ধাপ -

১) আকাশে অর্থাৎ ষষ্ঠভূমিতে মহামায়া দর্শন।

২) খুব উঁচু আকাশে, সপ্তমভূমিতে সগুণ আত্মা সাক্ষাৎকার – হোমাপাখীর বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটতে থাকে।আত্মিক মুক্তির স্বাদ পেতে থাকেন।

৩) মহাকাশে বা মহাশূণ্যে – সহস্রারের শেষ সীমায় নির্গুণ আত্মার উপলব্ধি। এখন মা-কে সম্পূর্ণভাবে পেয়ে মা হোমাপাখী হয়ে ওঠা (তার সাথে একত্বলাভ করা)।

এই হোমাপাখীর তথা নির্গুণের ঘনমূর্তির সাথে যারা একত্বলাভ করেন তারাও হোমাপাখীর গুণ পান। দেহজ্ঞান বিবর্জিত হয়ে ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের যুগে ভক্তরা **ষষ্ঠভূমির** ইষ্টদর্শন পর্যন্ত এগিয়েছেন তাঁর কৃপায়, (ঠাকুর সেই গামলার অধিকারী পুরুষ যিনি সকলের কাপড় তাদের ইচ্ছামত রঙে রাঙিয়ে দিতে পারেন) তারা হোমাপাখীর জাত। ঠাকুর বলেছেন রাখাল, নরেন এরা হোমাপাখীর জাত। **সংসারে নির্লিপ্ত।**

জীবনকৃষ্ণের যুগে ভক্তরা শ্রীজীবনকৃষ্ণকে ভগবান **বা পরম ব্রহ্ম** রূপে দর্শন করে হোমাপাখীর উন্নত জাত হয়েছেন। হোমাপাখীর বৈশিষ্ট্য, মুক্ত পুরুষের কিছু কিছু লক্ষণ ফুটতে দেখা যায় তাদের জীবনে। তবে দেহজ্ঞান **নাশ না হয়ে** চাপা থাকায় পূর্ণ মুক্তির স্বাদ

তথা ব্রহ্মের সাথে একত্ব উপলব্ধি হয় নি। এযুগে জীবনকৃষ্ণকে নির্গুণের ঘনমূর্তি রূপে দেখে ও তার সাথে একত্ব লাভ করে মানুষ প্রকৃত হোমাপাখীর জাত হতে পারছেন। মানুষ আত্মিক মুক্তির স্বাদ পাচ্ছে– মন্ত্র নেই, ভোগরাগ নেই, গেরুয়া নেই, বিধিবাদীয় কোন কর্ম নেই, সর্ব সংস্কারমুক্ত ও সর্বদা একত্বের উপলব্ধিতে যোগযুক্ত হয়ে ব্রহ্মানন্দের মধুপানে সমর্থ হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে কলকাতার প্রবীর হাজরার স্বপ্নটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

স্বপ্ন ঃ দেখছি– অনেক উঁচু দিয়ে একটা বিরাট হোমাপাখী উড়ে যাচ্ছে, আর অজস্র ছোট ছোট হোমাপাখী উড়ে গিয়ে তার ডানায় ক্রমাগত যুক্ত হয়ে যাচ্ছে, ফলে তার ডানাও বিস্তৃততর হচ্ছে।

৭) ''সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী আবার ওঁকারে লয় হয়।''

ব্যষ্টিঃ- সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনা –স্থূল শরীরে মন। গায়ত্রী জপ – মন যখন সূক্ষ্ম শরীরে। ওঁকার – মন যখন কারণশরীরে। এ হ'ল ব্যষ্টির সাধনের কথা।

বিশ্বব্যাপিত্বেঃ- সন্ধ্যা—যখন অন্যদের নিয়ে ভাগবতের (কথামৃত ইত্যাদি) দেহতত্ত্বে ব্যাখ্যা অনুশীলন করছেন। গায়ত্রী–যখন নিজের ও অন্যদের স্বপ্নের সাহায্যে নিজের ব্রহ্মসত্তাকে বুঝছেন। ওঙ্কার–সকল মানুষকে ভিতরে পেয়ে যখন একের বোধ জাগছে– নির্গুনের সাথে একত্বলাভে।

সমষ্টিঃ- সন্ধ্যা – স্থূল – কথামৃত, ধর্ম ও অনুভূতি, মাণিক্য ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ।

গায়ত্রী –সূক্ষ্ম – নানান দর্শন ও অনুভূতির বিশ্লেষণে ঈশ্বরত্ব বোঝা। নিজের ও অন্যের অনভূতি থেকে বোধে বোধ করা যে একজন সর্বজনীন মানুষের রূপে এক অখণ্ড চৈতন্যের প্রকাশ। সেখান থেকেই সকলের চৈতন্যশক্তি আসে।

ওঁকার – কারণ – চৈতন্যের উৎসপুরুষের সাথে একত্ব লাভে দেহের ভিতর অপার্থিব ঈশ্বরীয় আনন্দের ঢেউ বইতে থাকে নিরন্তর – এই আনন্দ তরঙ্গ-ই ওঁকার ধ্বনি – যেন ঘণ্টার ধ্বনির অনুরণন। তখন, আলোচনা থেমে যায়।

৮) ঠাকুর বলছেন — ''একদিন কুঠির সামনে দেখলুম, অর্জুনের রথ আর তাতে সারথির বেশে ঠাকুর বসে।''..... এই দর্শনের তাৎপর্য কী ?

পার্থসারথি অর্জুনের রথকে প্রথমে নিয়ে যান সেখানে যেখানে নারায়ণী সেনা আছে। প্রত্যহ দশ হাজার নারায়ণী সেনা বধ করে দ্বিপ্রহরে কৃষ্ণ অর্জুনের রথকে কুরুসেনার মুখোমুখি দাঁড় করান। অর্জুন পাণ্ডবদের সাথে যুক্ত হন ও শুরু হয় কুরুপাণ্ডবের আসল যুদ্ধ।

এখানে রথ মানে দেহরথ। নারায়ণী সেনার সাথে যুদ্ধ মানে ব্যবহারিক জগতে খেয়ে পরে বাঁচার লড়াই। সৎপথে খেটে খেতে হবে। এও কঠিন লড়াই। ঠাকুর মন্দিরে পূজারীর চাকরী করেছিলেন। তাই তার রথ কুঠিবাড়ীর সামনে অর্থাৎ মন্দির কর্তৃপক্ষ মথুর বাবুর কাছে রয়েছে।

দুর্যোধনের সেনার সাথে লড়াই মানে ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই। কৃষ্ণ

মানুষকে যদি এই সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড় করান ও লড়বার শক্তি দেন তবে এই যুদ্ধে জেতা যায়। বেশীরভাগ মানুষ এই লড়াইয়ে যোগ দেয় না। বাপ ঠাকুরদার আমল থেকে যে প্রথা চলে আসছে ভালোমন্দ বিচার না করে তা-ই পালন করে। তার মর্মার্থ বোঝার চেষ্টাও করে না। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে বিভিন্ন ভক্ত আসছেন, তিনি তাদের সঙ্গে ঈশ্বরীয় আলোচনা করে ধর্মীয় কুসংস্কারগুলি চিহ্নিত করছেন ও নিজে তা নির্মূল করে বাকীদের কাছে তার দৃষ্টান্ত রাখছেন।

এখানে ঠাকুর হলেন অর্জুন, যিনি ভগবানকে ভিতরে পেয়েছেন গুরু রূপে, সখা রূপে।

ঠাকুরের কৃপা পেলে সাধারণ মানুষও সৎপথে খেটে খেয়ে দিনান্তে পাঠচক্রে যোগ দিয়ে কুসংস্কার উচ্ছেদের জন্য অনুশীলন করতে পারেন। ভিতরে নানান দর্শন অনুভূতি দানে শ্রীভগবান তাদের গাইড (guide) করেন।

মহাভারতের যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি অস্ত্রধারণ করবেন না। কিন্তু দু'বার তিনি বিচলিত হয়ে প্রতিজ্ঞা ভেঙেছিলেন।

প্রথমবার, যখন ভীষ্মের সাথে যুদ্ধে অর্জুন সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হন তখন শ্রীকৃষ্ণ রথের চাকা তুলে ধরে ভীষ্মকে মারতে উদ্যত হন। ভক্ত ভীষ্ম অমনি অস্ত্র ত্যাগ করে তাঁর স্তব করতে শুরু করেন। অর্জুনও ছুটে গিয়ে কৃষ্ণের পা জড়িয়ে ধরে তাকে তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে অনুরোধ করেন।

এর মর্মার্থ হ'ল সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যখন ভীষ্মের ন্যায় কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী প্রবল প্রতিপক্ষের কাছে ভক্তের পর্যুদস্ত হবার উপক্রম হয়, তখন ভগবান স্থূলে সেই কুসংস্কারবান অথচ সমাজে বা পরিবারের সম্মানীয় ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির জীবনের রথ টেনে ধরে যুদ্ধের ময়দানে কৃপা প্রাপ্ত ভক্তের হার আটকে দেন। তখন কৃপা প্রাপ্ত ভক্ত (অর্জুন) বাধা মুক্ত হয়ে কুসংস্কার বর্জন করে সংসারজীবন যাপন করতে পারে। হয়ত সেই প্রভাবশালী ব্যক্তি অসুস্থতা বা অন্য কোন প্রকার অশান্তিতে ভুগে যান। ফলে ভক্তের পথের বাধা হতে পারেন না।

২য় ঘটনা হ'ল, অর্জুন প্রতিজ্ঞা করলেন যে সূর্যাস্তের পূর্বে তার পুত্রহন্তা জয়দ্রথকে বধ করতে না পারলে তিনি নিজেই চিতাগ্নিতে প্রবেশ করে মৃত্যুবরণ করবেন। দিন অবসান প্রায় অথচ জয়দ্রথ বধ সম্ভব হচ্ছে না। অর্জুনকে বাঁচাতে সেবারও কৃষ্ণ অস্ত্রধারণ করেছিলেন। যদিও তা দিয়ে কাউকে আঘাত করেন নি। শুধুমাত্র সুদর্শন চক্রের সাহায্যে অস্তগামী সূর্যকে ঢেকে দিলেন, কৃত্রিম সন্ধ্যা সৃষ্টি হ'ল, যুদ্ধ থামল। জয়দ্রথ দেখতে এল কিভাবে অর্জুন মৃত্যুবরণ করে। তখন সুদর্শনচক্র সরে গেলে আবার সূর্য দেখা গেল। কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন বাণ ছুঁড়ে জয়দ্রথের মস্তক ছিন্ন করে ওর বাবা বৃদ্ধক্ষত্রের কোলে ফেললেন। উনি সবে উপাসনায় বসেছিলেন। কোলে কাটামুণ্ড দেখে চমকে উঠে তা মাটিতে ঝেড়ে ফেললেন। সেই সঙ্গে তার মাথাও ফেটে চৌচির হয়ে গেল। কারণ তিনি পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন, যদি কেউ তার পুত্রকে হত্যা করে তার ছিন্নমুণ্ড মাটিতে ফেলে তাহলে তার মাথা

ও ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

এর মর্মার্থ হ'ল, সত্যের পূজারী কোন ভক্তকে কুসংস্কার মানতে চাপ দেন যিনি, তাকে সুন্দর সুন্দর আত্মিক দর্শন (সুদর্শন) দান করে ভিতর থেকে তার বিরুদ্ধতাকে, বিজয়রথকে (জয়দ্রথ) থামিয়ে দেন শ্রীভগবান। ফলে ঐ ভক্তটি সংস্কারমুক্ত জীবনযাপনে সফল হন।

একটি উদাহরণ ঃ কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতী সন্ন্যাসী হয়ে হরিভক্তির উচ্ছ্বাস দেখানোর জন্য মহাপ্রভুর সমালোচনা ও ভর্ৎসনা করলেন এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে, যেখানে দুজনেই অনুরাগীজন সহ আমন্ত্রিত ছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমের আবশ্যকতা নিয়ে কথা বলার সময় মহাপ্রভুর দেহে যোগৈশ্বর্য দেখে প্রকাশানন্দ একটু অবাক হলেন। রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন, দেবী সরস্বতী বলছেন, ও (মহাপ্রভু) আমার বরপুত্র, ওকে কটুকথা বলেছিস কেন ? ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিবি। পরদিন পথে দেখা হলে প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

১০) ''যে শাল পায় সে বনাতের খোঁজ করে না।''

মথুরবাবু ঠাকুরকে দামী শাল কিনে দিয়েছিলেন। ঠাকুর তা গায়ে দেবার পর বললেন, ''মন, এর নাম শাল''। তারপর তা মাটিতে ফেলে দিলেন। পরে একদিন বললেন, ''সব বাসনা যায় না, যেমন আমার আলোয়ান গায়ে দেবার বাসনা আছে। বাসনা না থাকলে দেহ ধারণ হয় না।''

বনাত হ'ল বেদ ও বেদান্ত সাধনের উপযোগী দেহের প্রতীক।

শাল হ'ল বেদ, বেদান্ত, তত্ত্বজ্ঞান, অবতারতত্ত্ব ও নিত্যলীলা যোগের সাধনোপযোগী দেহের প্রতীক।

আলোয়ান হ'ল পশমী শাল যার কোন পাড় নেই। ঠাকুর আলোয়ান চাইছেন। এটি স্থূলে চাওয়া নয় কারণ তাহলে মথুরবাবুকে বললেই তিনি তা এনে দিতেন। এটি যোগের কথা। ঠাকুর আসলে চান একটি নিখুঁত দেহ – যেখানে পাড় অর্থাৎ আত্মিক স্ফুরণের কোন সীমা থাকবে না। তিনি আত্মিকে জগৎব্যাপী হতে চান। তাঁর প্রার্থনা বাস্তবায়িত হয়েছিল শ্রীজীবনকৃষ্ণের জীবনে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ অবশ্য আলোয়ান পেয়ে অর্থাৎ জগৎব্যাপী হয়ে সন্তুষ্ট থাকলেন না। তিনি চাইলেন সব মানুষকে তার কোলে বসিয়ে তার আলোয়ানে ঢেকে নিতে ; সকলকে সমভাবে আলোয়ানের উত্তাপ দান করতে, অর্থাৎ তার সাথে আত্মিকে এক করে নিয়ে মানুষকে ঈশ্বরত্ব দান করতে। তার দেহ থাকতে যদিও তা সম্ভব হয়নি। তবে দেহ যাবার ৫০ বছর পর অর্থাৎ এ বছর (২০১৭) থেকে সাধারণ মানুষের তাঁর সাথে আত্মিকে একত্ব লাভের সূচনা হচ্ছে বলে ইঙ্গিত মিলছে কিছু কিছু স্বপ্নে।

রূপা মাজির প্রাসঙ্গিক একটি স্বপ্ন – একজন একটা আলোয়ান বিক্রি করতে এসেছে। জিজ্ঞেস করলাম, দাম কত ? বলল, একলাখ টাকা। আমি বললাম, তবে থাক।

অত টাকা নেই। তখন ও আলোয়ানটা রেখে চলে গেল। আমি ওটা খুলে দেখতে গেলাম। দেখি ওটার ভিতর থেকে আলো বেরোচ্ছে। পাঠের লোকেরা একে একে ওখানে আসতে লাগল ও ওটা দেখতে লাগল। ওটা ক্রমেই বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সকলকে ঢেকে ফেলা যাবে এই একটা আলোয়ানেই। ....

১১) ভক্ত, ভগবান, ভাগবত — তিন-ই এক।

শ্রীরামকৃষ্ণ একথা জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন; কেননা তাঁর একটি বিশেষ দর্শন হয়েছিল। তিনি দেখলেন জ্যোতির্ময় বিষ্ণুমূর্তি থেকে একটি আলোর কিরণ এসে পড়েছে ভাগবতে, সেখান থেকে ঐ আলোক রশ্মি আবার বেরিয়ে ঠাকুরের বুকে এসে মিশেছে। উনি বুঝলেন, ভগবান, ভক্ত ও ভাগবত তিন-ই এক। বিষয়টি আরও ভেঙে দেখা যাক।

ভক্ত কে ? না যিনি ভগবানকে দর্শন করেছেন নিজের দেহের ভিতর। এই ভগবান ভক্তের প্রাণশক্তির নির্যাসের ঘনীভূত রূপ। তাহলে ভক্ত ও ভগবান এক। আর দেহমধ্যে ভগবানের লীলা কাহিনীই ভাগবত। তাহলে ভক্ত, ভাগবত ও ভগবান তিন-ই এক।

অখণ্ড চৈতন্য মানুষরতনের রূপ নিয়ে দেহের ভিতর দেখা দিলে সাধক ঠিক ঠিক ভক্ত হন, যার ভক্তি শুদ্ধাভক্তি। এই ভক্তের জীবনে ভক্ত, ভগবান ও ভাগবত যে এক তা বিশেষ ভাবে অনুভূত হয় ; অপরের তা মেনে নিতেও অসুবিধা হয় না যদি তারা তাঁকে অবতার বা সচ্চিদানন্দগুরু রূপে দেখে ভিতরে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণকে বহু মানুষ প্রথমে সচ্চিদানন্দগুরু ও পরে ভগবান রূপে দেখতে লাগল। বিষয়টি তাদের কাছে পরিষ্কার হতে লাগল। কিন্তু বিশ্বব্যাপীত্ব লাভ করার পর জীবনকৃষ্ণ নতুন এক উপলব্ধিতে পৌছালেন। বললেন, ''আমি দেখছি আমিই এতগুলি মানুষ হয়েছি। আত্মিকে দ্বিতীয় কেউ নেই, ভক্ত কোথায় পাব? তোরা সব ঠাকুরের (রামকৃষ্ণের) ভক্ত, আমার কোন ভক্ত নেই।'' বিশ্বব্যাপীত্বে ভক্তি ভক্ত নেই। ভাগবতও নেই – আছে এক আর তার একত্বের প্রকাশ কাহিনী।

২য় স্তরে ঃ সাধারণ মানুষ জীবনকৃষ্ণকে যখন অন্তরে চিন্ময় রূপে দেখছে – তারা ভগবান রূপে দেখছে। ফলে ভক্তি জাগছে। পরে অনেক দর্শন অনুভূতি লাভে ও তাদের মননে এবং সংস্কার উচ্ছেদে জীবনকৃষ্ণই একমাত্র ভগবান, ভগবান সম্বন্ধে আর সব ধারণা কল্পনা, এটি উপলব্ধি হয়, তখন শুদ্ধাভক্তি জাগে। পরে যখন উপলব্ধি হয় আত্মিকে এক জীবনকৃষ্ণই আছেন, এক অখণ্ড চৈতন্যই আছে, আমি নেই, তখন ভক্তি উচ্ছেদ হয়। পরে আবার দ্বৈতবাদে নেমে উপলব্ধি হয় জীবনকৃষ্ণ আছেন বহু মানুষও আছেন, আমিও আছি। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক কী ? আত্মিকে তিনি যেন সমুদ্র। তাতে আমরা প্রত্যেকে এক একটি ঢেউ – তার সত্তায় সত্তাবান ও তার সাথে বিজড়িত, ওতপ্রোত। এই একত্ববোধে জাগে প্রগাঢ় প্রেম। এখানে আছে এক ও তার প্রেমের টানে একত্ব।

প্রশ্ন উঠতে পারে ভক্তি ও প্রেমের মধ্যে পার্থক্য কি ?

ভক্তি হ'ল – ঈশ্বর বিরাট, আমি তার পদধূলির এক কণা – এই বোধ, তখন মানুষটা স্তব স্তুতি করে, পুজো করে, ঈশ্বরের রূপ বর্ণনা, মহিমা বর্ণনা করে।

প্রেম হ'ল – ঈশ্বরের সাথে একীভূত হবার প্রেরণা। পুজো নেই, প্রণাম নেই, স্তুতি নেই, রূপ বর্ণনা নেই – শুধু ভালবাসা, ভালো লাগা, তার সাথে বিজড়িত বা ওতপ্রোত হয়ে আনন্দ সাগরে ভাসা।

নদীয়া জেলার শিমূরালী গ্রামের অরুণ ব্যানার্জী এক স্বপ্নে দেখলেন (১৩.২.২০১৭) – বৌমাকে বললেন, কাকলী তুমি কার দলে ? বৌমা বলল, আমি কারও দলে নই। দ্রষ্টা বললেন, বাঃ, বেশ বলেছ। তখন দেখেন দূরে পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন বিরাট দেহী জীবনকৃষ্ণ। তিনি ঈশারায় দ্রষ্টাকে কাছে ডাকলেন। দ্রষ্টা তার দিকে ছুটে যেতে লাগলেন, আর ভিতরে ব্যাকুল প্রার্থনা জাগল, হে জীবনকৃষ্ণ তুমি তো চৈতন্যের সমুদ্র, আমি সেই সমুদ্রের একটা ঢেউ মাত্র – এই সত্য ধারণা করিয়ে দাও। ......

স্মৃতিচারণ

শ্রীজীবনকৃষ্ণের পূতঃসঙ্গ লাভে ধন্য কিছু মানুষের টুকরো কিছু স্মৃতিকথা এখানে উল্লেখ করা হলো।

বিমল সরকার

ক) ওনার ঘরে গিয়ে এক একদিন এক এক রকম অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ হতো। একদিন রথ উপলক্ষে অফিস ছুটি ছিলো বোধহয়। ওঁর কাছে তাড়াতাড়ি গেছি। উনি বললেন, ‘আজ পাঠ হবে না’, আয় আজ ধ্যান করি। সকলে ধ্যানে বসলাম। ধ্যানে দর্শন হল – একটা রথ, অপূর্ব পৌরাণিক যুগের রথ। সামনে অনেক ঘোড়া। উনি চালাচ্ছেন। ভেতরে আমরা সবাই আছি, যাঁরা এখানে আসেন সকালে, বিকেলে, রাতে, সকলেই আছেন, কেউ যেন বাদ নেই। অবাক হয়ে ভাবছি আমরা এতজন কি করে এতটুকু একটা রথের মধ্যে আছি। উনিও রথ চালিয়ে নিয়ে চলেছেন তো চলেছেনই।

খ) আর একদিনের ঘটনা। উনি একদিন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তখন ঘরে সকলেরই যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিলেন বিশেষ কারণবশত। তা সত্ত্বেও কেন ডেকে পাঠালেন বুঝতে পারলাম না। অনিল গিয়ে আমাকে খবর দিল উনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। অফিস থেকে কিছু সময় ছুটি করে নিয়ে গেলাম ওঁর কাছে। দেখি কমলবাবু নামে একজন ভদ্রলোকও গেছেন। যেতেই শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, দেখ এই এই প্রশ্ন আছে, তুই ধ্যান করে এর উত্তরগুলো দিবি, বলে আমাকে ছুঁয়ে রইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ধ্যানে ডুবে গেলাম। ধ্যানে অনেক কিছু দর্শন হল। দর্শনের কথা জিজ্ঞাসা করাতে ওঁকে সব বললাম। ধ্যানের দর্শনের কথা শুনে বুঝিয়ে দিলেন ঐ দর্শনগুলির মধ্যেই ওঁর অনেক প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। খুব অবাক হলাম। “এখান থেকেই সব হচ্ছে যাচ্ছে”–ঠাকুরের এই কথার যেন এক বাস্তব প্রদর্শন (Practical demonstration) হ'ল।

মানিকলাল বসু

আমার দাদা ছিলেন নির্লোভ পুরুষ। তাঁর বন্ধুরাও ছিলেন তাঁর মতো। কখনও তাদের মধ্যে ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি ছাড়া অন্য কোন আলোচনা শুনতুম না। দাদাকে কলকাতার চৈতন্য লাইব্রেরী থেকে বই এনে দিতুম পড়বার জন্য। দাদা যখন ‘জগতের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধী’ লিখে বিষ্টুদাকে পড়ে একদিন শোনাচ্ছিলেন, আমার এত আনন্দ হয়েছিল যে, তা বলতে পারি না। লেখাটার প্রথম কয়েক লাইন আমার মুখস্থ ছিল।

অনাথনাথ মণ্ডল

ক) আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ হয়েও জীবনকৃষ্ণ কতখানি আধুনিক ও বাস্তববাদী

ছিলেন তার বহু পরিচয় আমরা লক্ষ্য করেছি। একদিনের ঘটনা – উনি কথামৃতের একটা ভাগ প্রণাম করে আমার হাতে দিয়ে পড়তে বললেন। ইতিমধ্যে অনেকেই ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমি পাঠ আরম্ভ করলুম। কথামৃতে যখন পড়লুম, ঠাকুর বলছেন–''রাখাল তুই জগন্নাথের প্রসাদ খা।" উনি ওই কথা শুনে সত্যবাবুর দিকে চেয়ে বললেন "দেহের মধ্যে 'সু' আর 'কু' দুই-ই আছে। অসুখ হয়েছে মানে দেহে 'কু' ফুটে উঠেছে। ঠাকুর সেইজন্য জগন্নাথের প্রসাদ খেতে বলছেন অর্থাৎ ভগবানের শরণ নিতে বলছেন যাতে দেহে 'কু' এর পরিবর্তে 'সু' ফুটে ওঠে। তাই গীতাকারও বলেছেন–'অনিত্যমসুখল্লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্'। তা বলে মশাই যেন মনে করবেন না, অসুখ হলে ডাক্তার-বদ্যি দেখাতে হবে না। সেখানে ইংরেজদের শিক্ষা খুব ভালো। ওরা বলে– তোমার অসুখ করলে ডাক্তারের পরামর্শ নেবে। আর জমি-জায়গা সংক্রান্ত কিছু অসুবিধা দেখা দিলে lawyer-এর পরামর্শ নেবে। এমন সময় মানিকবাবু ওঁর ঘরের দরজার সামনে দিয়ে রাস্তার দিকে যাচ্ছেন দেখে উনি মানিকবাবুকে ডাকলেন–"এই মেনো শোন্!" মানিক বাবু ঘরে ঢুকলে পর উনি মানিক বাবুর হাতে এক আনা পয়সা ও নস্যির ডিবেটা দিয়ে বললেন–'দু' পয়সার 'র' আর এক পয়সার 'পরিমল' নস্যি নিবি। 'তুই আনলে দোকানদার একটু বেশী দেয়'। মানিক বাবু পয়সা ও নস্যির শিশি নিয়ে বেরিয়ে যেতেই সত্যবাবু ও অন্যান্য সকলে হেসে ফেললেন।

(খ) ১৯৫৩ সালের দুর্গাপূজার সপ্তমী তিথি। বিকাল প্রায় তিনটের সময় শ্রীজীবনকৃষ্ণের ঘরের কাছে গিয়ে দেখলুম, ওঁর ঘরের দরজা বন্ধ। তখন মানিক বাবুর সেজ ছেলে আমাকে দেখতে পেয়ে ঘরের দরজা খুলে দিল। আমি ঘরে ঢুকে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিতে প্রণাম করে ওঁর খাটের উত্তর-পূর্ব কোণে বিছানার ওপর চুপ করে বসে রইলুম। উনি প্রায় সাড়ে তিনটে নাগাদ ধুতি পাঞ্জাবী পরা অবস্থায় ছাতি হাতে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর জুতো খুললে পর আমি তাড়াতাড়ি ওঁকে প্রণাম করলুম ও কোথায় গেছিলেন জিজ্ঞাসা করলুম। উনি জামা খুলতে খুলতে উত্তর দিলেন, আর বাবা, বেলা বারটা নাগাদ কলকাতায় বেরিয়েছিলুম বিজয়া দশমীর জন্য মিষ্টির অর্ডার দিতে। তা বাবা শেষকালে হাওড়ায় ফিরে এসে ভীমনাগের নতুন দোকানে লাল রাজভোগের অর্ডার দিলুম, আর দুলাল ঘোষের দোকানে বড় ফুল-সন্দেশ ও সরের নাড়ুর অর্ডার দিলুম। দুলাল ঘোষ দোকানে বসে ছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে দোকানের ভেতরে আসতে বলে ঠাকুরের কথা শোনাতে বলল। 'আমার এখন তাড়া আছে' বলে কোন রকমে অর্ডার লিখিয়ে আমি দোকান থেকে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালুম। তারপর 'আমি ভেতরে যাচ্ছিরে' বলে উনি বাড়ীর ভেতর দিকে ঢুকলেন হাত মুখ ধোয়ার জন্য। এমন সময় সত্যবাবু ওঁর ঘরে এসে হাজির হলেন। উনি হাত মুখ ধুয়ে ফিরে এসে সত্যবাবুর কুশলাদি প্রশ্ন করলেন ও তাঁর মিষ্টির অর্ডার দেওয়ার কথা জানালেন। সত্যবাবু শুনে বললেন, আপনি রিটায়ার করেছেন, এ সময়ে ও সবের ব্যবস্থা না করলেই হত। উনি বললেন–এ বাড়ীতে এটাই শেষ বছর, এরপর কদমতলায় থাকতে হবে, তখন দেখা যাবে কী করা যায়। বেশি কিছু করছি না, যেমন প্রতি বছর হয় সে রকমই প্রায়। এবার

থাকবে দুটো বড় রাধাবল্লভী, খানিকটা ঘুগনি, একটা বড় রাজভোগ, একটা বড় ফুল- সন্দেশ, দুটো সরের নাড়ু। দুলাল ঘোষ এবারে সরের নাড়ুর ন'টাকা করে সের ধরল। ভীমনাগ কিন্তু সের ছ'টাকার কমে রাজভোগ দেবে না।

(গ) জীবনকৃষ্ণের অপরিগ্রহের ছোট্ট একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরের দ্বিতীয় রবিবার তাঁর ঘরে অনেকক্ষণ কাটিয়ে যখন বিদায় নিচ্ছি, উনি আমাকে বললেন 'ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ছবিওয়ালা ১৯৫৮ সালের একটা ক্যালেণ্ডার ১লা জানুয়ারীতে কিনে আনবি'। সেই মত ১লা জানুয়ারী, ১৯৫৮, সকালবেলা ঠাকুরের ছবিওয়ালা একটা ক্যালেণ্ডার নিয়ে ওঁর কাছে গিয়ে হাজির হলুম। তখন প্রায় সকাল আটটা হবে। সেদিন সৌরেনের বাসায় আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার ছিলো। আমি ওঁর কাছে যেতে উনি 'আয়' বলে আমাকে খাটে বসালেন ও কুশল প্রশ্নাদি করলেন। উনি ক্যালেন্ডারটা হাতে নিয়ে ভালো করে দেখলেন, মাথায় ঠেকালেন ও আমাকে দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে দিতে বললেন। আমি সেটা টাঙ্গিয়ে দেওয়ার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন–"কত দাম রে ক্যালেণ্ডারের?" আমি বললুম–"চার আনা।" উনি বললেন–"তুই আমার পাঞ্জাবীর পকেট থেকে চার আনা পয়সা নিয়ে নে"। আমি তাই করলুম।

আশালতা বসু

(ক) বড়ঠাকুর আমাদের এনাকে (মানিক বাবু) খুব ভালোবাসতেন। সে ভালোবাসা না দেখলে বিশ্বাস হবে না। আবার দু'জনের মধ্যে মাঝে মাঝে ঝগড়াও হতো, তা ক্ষণস্থায়ী। বড়ঠাকুরের শিক্ষা কি রকম ছিল। একবার বড় ঠাকুর আমাদের এনাকে বলছেন–'দ্যাখ অফিস থেকে কাগজ পেন্সিল এনে ছেলেদের লেখাপড়া শেখাস নি, তাহলে তোর ছেলেরা চোর হবে'। তাই উনি কোনদিন অফিস থেকে কাগজ পেন্সিল আনতেন না। আবার কখনও বড়ঠাকুর তাঁর ভাইয়ের প্রতি খুব কঠোর হতেন। আমরা তখন লক্ষণদাস লেনে আছি। আমার বড় ননদ তখন বিধবা হয়ে তার ছেলেমেয়ে নিয়ে আমাদের কাছে আছেন। এমন সময় আমার ছোট নন্দাই দেউলে খাতায় (insolvency) নাম লিখিয়ে তাঁর সংসার নিয়ে আমাদের সংসারে এসে উঠলেন। বড়ঠাকুর (ভাসুর) শুনে আমাদের এনাকে বললেন–"দ্যাখ, তুই যদি ওদের এখানে রাখিস্ তাহলে আমি তোদের এখান থেকে চললুম।" আমাদের উনি বোন–ভগ্নীপতিকে তো সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতে পারেন না, তাই ওঁরা আমাদের সংসারে তখনকার মত থেকে গেলেন। বড়ঠাকুর কিন্তু আমাদের কাছ থেকে চলে গেলেন। পরে আমার ননদ নন্দাই চলে গেলে আবার বড়ঠাকুর আমাদের কাছে এলেন।

(খ) যুদ্ধের সময় যখন কয়েক মাস আমরা আলপুকুরে ছিলুম, তখন ওঁরা দু'ভাই ওখান থেকে অফিস করতেন। সেখানেও বড়ঠাকুরের ফরমাস্ মত খাওয়া, দাওয়া খুব চলতো। খুব খরচ হচ্ছে দেখে একদিন আমাদের ইনি আমার কাছে বলছেন – "আর পারি না বাবা, এবার আমাকে সব ফেলে পালাতে হবে"। তখন বড়ঠাকুর ঐ কথা শুনে দূর থেকে

চেঁচিয়ে ভাইকে বলছেন – 'তোর কাছে পয়সা আছে, না আমি দেব ? যা কোথায় যাবি যা।'

(গ) বড়ঠাকুর তাঁর ভাইয়ের কখনও অসুখ করলে স্থির থাকতে পারতেন না। আমাদের এনাকে কিছু কাজ করতে দেখলে, বড়ঠাকুর মাঝে মাঝে আমাকে শুনিয়ে অনেক কথা বলতেন। কদমতলার বাড়িতে আমাদের ইনি অসুস্থ হয়ে অনেকদিন বাড়িতে বসে ছিলেন। তখন কিছুদিন কবিরাজ শৈলেনবাবুর চিকিৎসাধীনে ছিলেন। শৈলেনবাবুর পরামর্শে উনি আবার অফিস যেতে আরম্ভ করলেন।

বড়ঠাকুর এসব কিছুই জানেন না। তাই একদিন সকালে কলতলায় চান করবার সময় আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে আপন মনে বলছেন – 'এরা কিরকম লোক রে বাবা! ঐ রকম অসুস্থ লোকটাকে আবার অফিসে পাঠিয়েছে!' ইতিমধ্যে শৈলেনবাবু এসে বড়ঠাকুরের ঘরে বসে ঐসব কথা শুনেছেন। বড়ঠাকুর ঘরে ফিরে এসে শৈলেনবাবুকে দেখতে পেয়ে তাঁকেও ঐ কথা বলাতে শৈলেনবাবু হাসতে হাসতে বড়ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন–'আচ্ছা, আপনার ভাই আপনাকে বেশী ভালোবাসে, না আপনি আপনার ভাইকে বেশী ভালোবাসেন ?' তারপর শৈলেনবাবু নিজেই বললেন যে তিনিই ওঁকে অফিস পাঠিয়েছেন।

(ঘ) আমাদের এনার আবার থিয়েটার করা বাই ছিলো। হালদার পাড়া লেনে থাকাকালীন 'লিট্‌ল এ্যাসেম্বলী' ক্লাবে ইনি নিত্য যাতায়াত করতেন। মাঝে মাঝে থিয়েটারের রিহার্সাল দিয়ে যখন রাত করে বাড়ি ফিরতেন, বড়ঠাকুর জানতে পারলে খুব বকতেন। বড়ঠাকুরের ভাব– বাড়ির ছেলেরা বাইরে গিয়ে আড্ডা দেবে কেন? একদিন বড়ঠাকুর সকালে বেড়িয়ে এসে আমাদের ঠাকুরদাসকে দেখতে পেয়ে ডেকে বললেন –"এই ঠাকুর, আমার কাছে আয়। দুজনে মিলে একটু আড্ডা দিই।"

(ঙ) বড়ঠাকুর পয়সা কড়ি হিসেব করে নিতেন। কোনকিছু হয়তো কিনতে দিয়েছেন, সে পয়সা থেকে কিছু হয়তো ফিরেছে। আমি ছেলেদের হাত দিয়ে বড়ঠাকুরের কাছে পয়সা ফেরৎ পাঠালুম। তাতে হয়তো এক নয়া পয়সা কম হয়েছে। উনি পয়সা গুনে সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের বলতেন – 'এই, বৌমা আমাকে এক নয়া কম দিয়েছে। বৌমার কাছে তাহলে এক পয়সা পাওনা রইল।' কিন্তু উনি তক্ষুণি হয়তো আট আনা পয়সা ছেলেদের হাতে দিয়ে বলতেন – 'যা তোরা মিষ্টি কিনে খা।'

মানিক ৬৮ সংখ্যা

ভূমিকা

আধ্যাত্ম পিপাসু মানুষদের কথা বলতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ চাতক পাখির উপমা ব্যবহার করেছেন–- 'চাতক আকাশের জল ছাড়া অন্য জল খায় না। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে গেলেও অন্য জল খাবে না।' চাতক বলতে এখানে সেইসব মানুষদের কথা বলা হয়েছে যাদের ঈশ্বরীয় অনুভূতিলব্ধ জ্ঞান ভিন্ন অন্য জ্ঞানে আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মেটে না। নির্গুণ থেকে আগত ঈশ্বরীয় অনুভূতিই হ'ল আকাশের জল। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে ছিলেন এইরূপ এক চাতক যিনি মাত্র ১১ বছর বয়সেই এই জলের আস্বাদন পেয়েছিলেন। মহাভারতেও এর নিদর্শন আছে। ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত। তিনি তৃষ্ণার্ত। জল চাওয়া মাত্র দুর্যোধনের ইঙ্গিতে সুশীতল পরিস্রুত জল রৌপ্যপাত্রে আনা হ'ল। উনি গ্রহণ করলেন না। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে অর্জুন ভূমিতে বাণ নিক্ষেপ করলেন, ভূমিগর্ভ থেকে জল উঠে এসে ভীষ্মের মুখে পড়ল। ভীষ্ম তৃপ্ত হলেন। ভীষ্ম চাতকপাখি তথা মুমুক্ষু ভক্তদের প্রতিনিধি। বৈদিক যুগের চাতক তথা ঋষিরা যে জল পান করেছিলেন তা অন্যেরাও যাতে পরোক্ষভাবে কিছুটা আস্বাদন করতে পারে তার জন্য রচিত হল বেদ। প্রাচীনকালে সাধারণের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পুষ্করিনী খনন করা হ'ত। বেদ হল সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এইরূপ এক পুষ্করিণী, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় হালদার পুকুর।

মানুষ স্বরূপত ব্রহ্ম হ'লেও দেহ প্রকৃতির ভিন্নতা হেতু সকলে তাদের দেহমধ্যস্থ ব্রহ্মত্ব আস্বাদনে সক্ষম হয় না। বৈদিক যুগের ঋষিদের ব্যক্তিগত দর্শন ও অনুভূতি থেকে উপলব্ধ জ্ঞানের কথা নিয়ে রচিত যে বেদ তাতে বিশ্বব্যাপিত্ব ও সমষ্টির ধর্মের কথা থাকলেও তা আভাস মাত্র। প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে সাধারণ মানুষের কাছে তা বোধগম্য হয়নি এবং কালক্রমে তা গুরুত্ব হারায়। এযুগের ঋষি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আবার সেই অনুভূতি সমূহ ফুটতে শুরু করল আরও একটু স্পষ্টতর ভাবে। পঞ্চকোষ ও সপ্তভূমির সাধন হ'ল তাঁর দেহে। তাঁর সেই ব্যক্তিগত সাধনের অনুভূতির কথা দিয়ে সৃষ্টি হ'ল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত তথা দ্বিতীয় এক হালদার পুকুর।

পরবর্তীকালে আমরা পেলাম শ্রীজীবনকৃষ্ণকে যাঁর দেহে বেদ এবং বেদান্ত সাধনের প্রতিটি অনুভূতি পূর্ণমাত্রায় হল। ব্যষ্টির সাধন শেষে বিশ্বব্যাপিত্বও সম্পূর্ণতা পেল তাঁর মধ্যে। আর সে কথাই লিপিবদ্ধ হ'ল "ধর্ম ও অনুভূতি" গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে। তাই এটিকে বলা যেতে পারে তৃতীয় হালদার পুকুর।

কিন্তু শ্রীজীবনকৃষ্ণের নিজের কথায়, বিশ্বব্যাপিত্ব হল বৃহৎ ব্যষ্টি। পরবর্তীকালে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি থেকে ঘোষণা করলেন ব্যষ্টির সাধন সকলের হয় না। এক যুগে একজন মানুষের হয় আর সেই একজন মানুষকে হতে হবে ঊর্দ্ধরেতা পুরুষ। তাই যে তিনটি হালদার

পুকুরের কথা বলা হ'ল সেখান থেকে প্রকৃত অর্থে সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মিটলেও তা স্থায়ী হয় না। কারণ শুধু ব্রহ্মবারির কথা জানা গেল, দর্শন হল কিন্তু তা পানের নিজস্ব অনুভূতি হল না। তাই তাদের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হ'ল দীর্ঘদিন। বস্তুতত্ত্বের সাধন যার হয় সেই মানুষটির এগিয়ে যাওয়ার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে "ধর্ম ও অনুভূতি" গ্রন্থে আর আছে সাধারণ মানুষের দর্শনে সেই একজন মানুষের এগিয়ে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়ার কথা। কিন্তু অনুভূতি ও উপলব্ধির নিরিখে সাধারণ মানুষের কতখানি অগ্রগতি ঘটবে তারা কিভাবে হালদার পুকুরের জল পান করবে তার কোন স্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেল না। বর্তমানে অসংখ্য সাধারণ মানুষের দর্শন ও অনুভূতি থেকে জানা যাচ্ছে দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি লাভ করে সাধারণ মানুষও সরাসরি ব্রহ্মবারি পান করতে সক্ষম হচ্ছে। এছাড়া পরম এক তথা অখণ্ডচৈতন্যের সঙ্গে তাঁদের একত্বের অনুভূতির সংকলন পরবর্তীকালে রূপ নিতে পারে নতুন এক পুষ্করিনীর তথা চতুর্থ হালদার পুকুরের।

সাধারণ মানুষের গুরু, ভগবান, চৈতন্য ইত্যাদি ব্যষ্টির সাধনের দর্শন লাভের আকাঙ্খা মিটে যায় যদি ঐ বিষয়ে তাঁদের নিজস্ব ধারায় অনুভূতি হয় যা সকল সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

যেমন, সচ্চিদানন্দ গুরুলাভ—শ্রীজীবনকৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দগুরু হিসাবে পেয়েছিলেন যিনি ভগবান দর্শন করিয়ে দিয়েছিলেন। এযুগের মানুষ দেখেন সর্বজনীন সর্বকালীন মানব শ্রীজীবনকৃষ্ণকে ষোল আনা ভগবান রূপে, আবার তিনিই গুরু রূপে তাকে শিক্ষা দিচ্ছেন।

অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি দর্শন—শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেখেছিলেন নিজের ঊর্দ্ধাঙ্গ পুরুষ নিম্নাঙ্গ নারী। সাধারণ মানুষ দেখে তার ঊর্দ্ধাঙ্গ (মুখমণ্ডল) জীবনকৃষ্ণের এবং নিম্নাঙ্গ (ধড়) নিজের। অর্থাৎ ব্যবহারিকে তার নিজস্ব সত্তা থাকলেও আত্মিকে সে জীবনকৃষ্ণ।

ভগবান দর্শন—বস্তুতত্ত্বের সাধনে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মাকে ভগবানরূপে দর্শন হয়। আর সাধারণ মানুষের দর্শনে অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতিতে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত মানুষকে (যেমন জীবনকৃষ্ণকে) দেখিয়ে একজন বলে দেয়, 'এই ভগবান, এই ভগবান দর্শন'।

বিশ্বরূপ দর্শন—আত্মাপুরুষ তথা জীবনকৃষ্ণের আউট লাইন (outline)-এর ভিতর মনুষ্যজাতিকে দেখা যায় ও তার ভিতর নিজেকেও দেখা যায়। আবার কেউ দেখেন সব মানুষের মুখ জীবনকৃষ্ণের মুখ হয়ে গেছে।

চৈতন্য দর্শন—শ্রীজীবনকৃষ্ণকে সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষরূপে দেখা বা স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নে সূর্য দেখা। তাঁর রূপে অখণ্ড চৈতন্যকে দেখা জ্ঞানদীপ লাভ।

পরম এককে দর্শন —পাঠচক্রের সকলের মুখ জীবনকৃষ্ণের মুখ হয়ে গেল বা যাত্রীবাহী বাসে সকল যাত্রী, ড্রাইভার, কণ্ডাকটর ইত্যাদি সকলের মুখ জীবনকৃষ্ণের মুখ হয়ে গেল— এরূপ দর্শন হ'ল ।

তবে মনে রাখতে হবে বস্তুতত্ত্বের সাধন হয়ে যিনি নির্গুণের ঘণীভূত রূপ বা সমষ্টিচৈতন্য হয়ে উঠেছেন তার সাথে একত্বলাভের অনুভূতি গুলিই মূলত ৪র্থ হালদার পুকুরকে পূর্ণ করছে। এবছর থেকে এরূপ অনুভূতি বেশি করে হতে শুরু করেছে যার প্রতিফলন ঘটেছে বর্তমান পত্রিকায়। এখানে উল্লেখিত এক একটি দর্শন যেন সেই পুকুরের এক এক ফোঁটা জল।।

২৬শে কার্ত্তিক, ১৪২৪

পিতা হতে প্রিয়তর

● দেখছি (১৮/৭/১৭) –রাত্রে শুয়ে আছি। বাবা এসে আমার মাথায় হাত বোলাচ্ছে। কখনও বাবা একজন বুড়ো মানুষ হয়ে যাচ্ছে। মাথা ন্যাড়া, খালি গা, ধুতি পরা এক বুড়ো মানুষ। খুব আদর করে তিনি আমার মাথায় গায়ে হাত বোলাচ্ছেন। ...ঘুম ভাঙল।

সকালে বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার তো নাইট ডিউটি ছিল, তুমি কি মাঝে একবার এসেছিলে? বাবা বলল, না তো! আবার বললাম, তোমার কি কোন বুড়ো মানুষ বন্ধু আছে ? বাবা বলল, কেন ? তখন স্বপ্নের কথা বললাম। শুনে বাবা একটু ভেবে জীবনকৃষ্ণ নামে একজনের ফটো দেখালেন ফোন থেকে। কী আশ্চর্য! আমার স্বপ্নে দেখা বুড়ো আর জীবনকৃষ্ণের ছবি হুবহু এক।

আমান মোল্লা, উলুবেড়িয়া, হাওড়া
দ্বিতীয় শ্রেণি

● দেখছি (২১.৬.১৭) – সান্তাক্লজ আমার জন্য অনেক উপহার নিয়ে এসেছে। আমার খুব আনন্দ। আমার কাছে তিনি সারাদিন থাকলেন। রাত্রি হয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে পড়লাম। তখন দেখি উনিও গুটিসুটি মেরে আমার পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকালে ঘুম ভাঙলে ফটো দেখে বুঝলাম, সান্তাক্লজ রূপে জীবনকৃষ্ণই এসেছিলেন আমার কাছে।

স্বয়ংদীপ্ত কুণ্ডু, কাশীপুর, কোলকাতা

ব্যাখ্যাঃ- সান্তাক্লজ—ঈশ্বর। এ যুগে তিনি নিজে ধরা দিচ্ছেন। নিজেকে উপহার হিসাবে দান করছেন। মানুষ বুঝছে, ঈশ্বর কল্পনার বস্তু নয়—একজন জীবন্ত মানুষের রূপে তাঁর প্রকাশ--শ্রীজীবনকৃষ্ণের রূপে।

পরিত্যক্ত লজ

● গত জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে এক রাত্রে দেখছি– খেলার মাঠ থেকে বাড়ী ফিরছি বাইকে চড়ে। একটা কুকুরের সাথে ধাক্কা লাগল। কেউ কেউ বলল, কুকুরটাকে মেরে ফেললে গো। আমি বললাম, না, না, অত জোরে লাগেনি। আচ্ছা আমি দেখছি—ওকে ডাক্তারখানা নিয়ে যাব। গাড়ি একপাশে রেখে ঐ কুকুরটাকে দেখতে গেলাম। দেখি কুকুরটা নেই। রাস্তার উল্টো দিকে এগিয়ে গেলাম। একটা পুরোন পরিত্যক্ত বিরাট লজের গেট সামনে পড়ল। তার উপর লেখা—'বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ।' তবুও ঢুকতে গেলাম। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা এক রক্ষী বারণ করল। তখন ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, "তুমি কি ভিতরে যেতে চাও ? চল, আমি তোমায় নিয়ে যাচ্ছি।"

মনে হ'ল উনি রক্ষীদের অফিসার। তাই রক্ষীরা আর বাধা দিল না। উনি জিজ্ঞেস করলেন আমি কেন ভিতরে যাচ্ছি। যখন শুনলেন আহত কুকুরকে খুঁজতে যাচ্ছি, উনি হেসে উঠলেন। বললেন, এখন কেউ কুকুর নিয়ে অত ভাবে না। ভিতরে সাঁতার পুকুর রয়েছে কিন্তু জল নেই। বিড়ালছানা, হাঁস ইত্যাদি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ভদ্রলোক আমাকে একটা সিঁড়িতে চড়তে বললেন যার মাঝে মাঝেই কয়েকটা ধাপ নেই। উনি আমার বুক দু'হাত দিয়ে ধরে আমাকে তুলে দিলেন। উপরে গিয়ে দেখলাম ওখান থেকে পুরো এলাকাটা দেখা যাচ্ছে। একটু দূরে একটা হল ঘরে ৩০/৩২ বছরের এক তরুন যুবক কিছু যুবক যুবতীকে যোগব্যায়াম ও প্রাণায়াম শেখাচ্ছে। ওরা সহজেই ঐ ঘরে ঢুকতে ও বেরোতে পারছে। তার জন্য পৃথক পথ রয়েছে।

ওখান থেকে আমার সেই কুকুরটাকেও দেখলাম সুস্থ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর ঐ সিঁড়ি বেয়েই আবার ভদ্রলোক আমায় ধরে ধরে নামিয়ে দিলেন। তখন দেখি পাশে একটি সুন্দর সিঁড়ি রয়েছে। ঐ সিঁড়ি দিয়ে আমায় কেন নিয়ে গেলেন না ভেবে অবাক হলাম।... ঘুম ভাঙল। ফটো দেখে বুঝলাম স্বপ্নদৃষ্ট ঐ হিতৈষী বয়স্ক মানুষটি স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ।

শিবাশিস পাল, কালীমোহনপল্লী, বোলপুর

ব্যাখ্যাঃ- বাড়ী ফিরছি– মন অন্তর্মুখী হয়েছে। কুকুর– ধর্মীয় সংস্কার। ধাক্কা লাগল– বৈধী ধর্মের সংস্কারে আঘাত লাগল। পরিত্যক্ত লজ– বেদের সাধন। ৪ বছর বয়সে শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেখেছিলেন এক বিধবা রমণী পরিত্যক্ত রান্না ঘরের দিকে চলে গেলেন। উনি বললেন, পরাবিদ্যা তথা বেদের সাধন যা এযুগে পরিত্যক্ত ছিল জাগল তার দেহে। প্রহরী বা রক্ষী--দেহের সংবেদনশীলতা। যেমন ঠাকুরের হাতে টাকা ঠেকলে হাত বেঁকে যেত, সমাধি হত। সাধারণ মানুষের দেহ বেদের সাধন সহ্য করতে পারবে না তাই বাধা দিচ্ছে। ঢোকার অনুমতি দিল না। বেদের সাধন হবার অনুকূল নয়। ভদ্রলোক ঢোকালেন– শ্রীজীবনকৃষ্ণ নিজের ব্রহ্মতেজ সহায়ে ২য় স্তরের অনুভূতি দান করে বেদের সাধন বিষয়ে দ্রষ্টাকে পরিচিত করাচ্ছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের তো ধারাবাহিক সাধন হবে না, তাই Step jump দিয়ে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। পাশে সুন্দর সিঁড়ি– যার বস্তুতত্ত্বের সাধন তার ধারাবাহিক সাধন। এক যুবক যোগ ব্যায়াম শেখাচ্ছেন– এযুগে সমষ্টিচৈতন্যের বিকাশ শুরু হচ্ছে। তাই সেখানে সকলে ঢুকতে পারছে সহজে। এই চৈতন্য দ্রষ্টার ন্যায় অনেক যুবককে নির্বাচন করেছেন, তাঁর চৈতন্যের রস আস্বাদন করাবেন। কুকুরটি সুস্থ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে– বৈধী ধর্মের প্রতীকার্থ বৈদিক দৃষ্টির প্রেক্ষাপটে উদঘাটিত হওয়ায় তার সুস্থ রূপটি ধরা পড়ছে।

ভোগ গ্রহণ

● আমার মা সম্প্রতি পাঠে যাচ্ছে। মায়ের কাছে মহামানব জীবনকৃষ্ণের কথা শুনেছি। গত ২৫শে আগস্ট অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। বাড়ীতে রসিকনাগরের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয়। ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হয়েছে। পুরোহিত আছেন। আমি কাছে বসে

আছি। হঠাৎ দেখছি বিগ্রহমূর্তি নেই। পাশে পুরোহিত নেই। শ্রীজীবনকৃষ্ণ এসে বসে ভোগের থালা থেকে খেতে শুরু করলেন। আমি হাঁ হয়ে দেখছি আর আনন্দে দেহ মন ভরে উঠছে। কয়েক সেকেণ্ড পর এই দর্শন মিলিয়ে গেল। সম্বিৎ ফিরে পেলাম।

ভাবলাম, ভগবান কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন শ্রীজীবনকৃষ্ণ গ্রহণ করছেন—এমনটা দেখলাম কেন ? তবে কি সত্যিই এ যুগে জীবনকৃষ্ণের মধ্যে ভগবান কৃষ্ণের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে ?

[কথিত আছে শ্রীখণ্ডে এক বালকের দেওয়া নৈবেদ্যর নাড়ু বালগোপাল খেয়েছিলেন। বর্তমান দর্শনটি সংস্কারজ রূপদর্শন নয়, মানব ব্রহ্মকে আপনা হতে দর্শন। তাঁর কৃপায়।]

গত ষষ্ঠীর দিন দুর্গাপূজা শুরু হচ্ছে ভেবে খুব excited ছিলাম। পরদিন পুষ্পাঞ্জলি দেব। রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম—আমার দেহের ভিতর ছোট্ট একজন মানুষ—জ্যোতির্ময়। তিনি "হরি হরি..." বলছেন।... স্বপ্ন ভাঙলো। মনে হ'ল, ভগবান আমার দেহের ভিতর। সুতরাং পুষ্পাঞ্জলি দেবার কোন প্রয়োজন নাই। এবছর অষ্টমীর দিন আর পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারলাম না। আজন্ম লালিত সংস্কার কত সহজে দূর হয়ে গেল ভেবে অবাক হলাম। ভগবানের কী কৃপা !

কৌশিক ঠাকুর, দীঘা, বীরভূম।

চেয়েছি তোমায়

● দেখছি (২৯/১০/১৭)—শুভঙ্কর বলে একটি ছেলে আমার ঘরে এলো। বলল, তোমরা কীসের পুজো কর? কালী মন্দিরে পুজো দিলে না, অন্য কোন মন্দিরেও গেলে না, অঞ্জলিও দিলে না, তোমরা কীসের পুজো কর ? আমি ওকে জীবনকৃষ্ণের ফটো দেখিয়ে বললাম, আমি ওনার পুজো করি। ও ছবিটা দেখে কোন মন্তব্য না করে চলে গেল। তারপর ফটো থেকে জীবনকৃষ্ণ বেরিয়ে এলেন। সারা ঘর জ্যোতিতে ভরে গেল। আমার চোখ ঝলসে গেল। আমি হাতজোড় করে ওনাকে বললাম, সেই এলে, আগে এলে না কেন ? আগে এলে ওরাও তো বুঝতে পারতো ! তখন উনি বললেন, ওরা তো আমাকে কেউ চায়নি, তুই আমাকে চেয়েছিস তাই এসেছি।... ঘুম ভাঙল। এই প্রথম আমি স্বপ্নে জীবনকৃষ্ণের দেখা পেলাম।

রমা চ্যাটার্জী, সুলতানপুর, পঃমেদিনীপুর

ব্যাখ্যাঃ- ছবি দেখে মন্তব্য না করে চলে গেল— আত্মিক ক্ষিদে নেই। জানার আগ্রহ নেই। ওরা চায়নি—বেশিরভাগ মানুষ ভগবানকে চায় না। তুই চেয়েছিস—ঈশ্বরীয় সংস্কার আছে, তাই আত্মিক ক্ষুধা জেগেছে।

শান্তি মন্ত্র

● দেখছি (আগস্ট, ২০১৭)— ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে হাত জোড় করে বলছি আমায় ভয়মুক্ত কর। কীসের ভয়, কেন একথা বলছি জানি না। হঠাৎ ওনার হাত থেকে আলো বেরিয়ে আমার দেহে ঢুকল। আমি বেশ শক্তি পেলাম। ভয় কেটে গেল। তারপর উনি বললেন, তোর গোল্ডেন ব্রেন (Golden Brain) হবে।...

অগ্নিশ চ্যাটার্জী, শীলপাড়া, বেহালা

ব্যাখ্যাঃ- শ্রীরামকৃষ্ণ- রামকৃষ্ণময় জীবনকৃষ্ণ। তিনি মানুষকে অভয় দান করতে পারেন। ভয়—দুই থাকলেই ভয়, একজ্ঞানে ভয় নাই। গোল্ডেন ব্রেন— দর্শন অনুভূতি বিশ্লেষন করে আত্মিক একত্বের রসাস্বাদনে সক্ষম ব্রেন-ই গোল্ডেন ব্রেন।

● গত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে এক রাত্রে স্বপ্নে দেখছি— চুপ করে বসে আছি। মন ভালো নেই। শ্রীজীবনকৃষ্ণ এসে কাছে দাঁড়ালেন। আমার মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। শুধু বললেন—"জীবনকৃষ্ণ।" আর কোন কথা নয়। মন আনন্দে ভরে উঠল।... ঘুম ভাঙল। বহু বছর পর শ্রীজীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখে ও তার স্নেহস্পর্শ পেয়ে যে কী আনন্দ হ'ল তা বোঝাতে পারব না।

হারাধন মণ্ডল, বোলপুর

ব্যাখ্যাঃ- ১) "জীবনকৃষ্ণ" নাম-ই শান্তির চাবিকাঠি।।

২) জীবনকৃষ্ণই জীবনকৃষ্ণের নাম করেন, অর্থাৎ জীবনকৃষ্ণের সত্তা (ব্রহ্মত্ব) পেয়ে মানুষ জীবনকৃষ্ণচর্চা করে।।

আমৃত্যু ?

● স্বপ্নে দেখছি (১৩/৮/১৭)— নদীর পাড়ে গেছি। আমাকে একটা কাঁকড়া কামড়ে দিল। হাত থেকে রক্ত বের হচ্ছে। তাই নদীতে হাত ধুতে গেছি। দেখছি নদীর পাড়ে শ্রাদ্ধের উপকরণ সাজানো রয়েছে। তাই দেখে হাত না ধুয়ে আমি বাড়ি চলে এলাম। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নের মধ্যেই স্বপ্ন হচ্ছে। জীবনকৃষ্ণ এসে আমায় করুণ ও রাগত স্বরে বলছেন—তোরা কী ব্যষ্টি আর সংস্কার মরলে ছাড়বি ?... খুব অস্বস্তি নিয়ে ঘুম ভাঙল।

রাজীব রায়চৌধুরী, সখেরবাজার, কলকাতা

ব্যাখ্যাঃ- নদী—পাঠচক্রে যে চৈতন্যের স্রোত বইছে। নদীপাড়—জগৎ, কাঁকড়া—তথাকথিত অবতারবাদ বা গুরুবাদ। কামড়—যা ব্যক্তির সাধনে প্রলুব্ধ করে, ফলে রক্তক্ষরণ হয় অর্থাৎ প্রাণশক্তির অপচয় হয় এবং বিভিন্ন সংস্কারে জড়িয়ে দেয়, যেমন "শ্রাদ্ধই মুক্তির পথ"—এই

ধরনের সংস্কারে জড়িয়ে দেয়। নদীতে হাত ধোওয়া হল না– সঠিক অনুশীলনের অভাবে সমষ্টি চৈতন্যে অবগাহন করা হচ্ছে না। স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নে ভুল ধরিয়ে দিচ্ছেন–তুরীয় অবস্থায় চেতনার জাগরণ ঘটিয়ে সঠিক দিশা দিচ্ছেন।

● দেখছি (আগস্ট-২০১৭)–একটা বড় গাছ। জায়গাটা খুব অন্ধকার। কে যেন গাছটার গোড়ার দিকটা কেটে ফেলেছে। শুধু একটা সরু শিরার মাধ্যমে যেন গাছটার মূলের সঙ্গে ওপরটা যুক্ত হয়ে আছে। ঐ শিরা দিয়ে রক্ত বয়ে যাচ্ছে উপরের দিকে। ঐ রক্ত থেকে হাল্কা আলোয় জীবনকৃষ্ণের মুখ দেখতে পেলাম। উনি বললেন, "আমি ভগবান, আমি ভগবান।"...ঘুম ভাঙল।

অতনু মাইতি, কাঠডাঙা, সরশুনা

ব্যাখ্যাঃ- অন্ধকার–নির্গুণ। গোড়া কাটা হয়েছে–জীবনকৃষ্ণ যে ভগবান এই ধারণা বদলে যাচ্ছে। উপলব্ধি হচ্ছে তিনি অখণ্ডচৈতন্য, পরম এক। ভগবান নেই, তাই ভক্তও নেই। সকলে সেই এক চৈতন্যসাগরের এক একটি ঢেউ।।

পুকুরের জল

● স্বপে দেখছি (১.১০.১৭)–আমি ও ভাস্কর দু'জনে দুটি ঘটি নিয়ে পুকুরে জল আনতে যাচ্ছি বাড়ীতে সন্ধ্যা দেব বলে। আমার ঘটিটা বড় আর ভাস্করেরটা ছোট। আসার পথে একটা মন্দির পড়ল। সেখানে জল দিতে গেলাম। দেখি মন্দিরের বেদীর উপর একটা কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওকে তাড়াবার জন্য জলের ছিটে দিতে যাচ্ছি, অমনি ভাস্কর আমাকে নিষেধ করল। বলল, কুকুরটা কামড়ে দেবে। বাড়ীতে এসে দেখি দু'জনের ঘটিতেই জল নাই। আমি টিউবওয়েলের জল নিতে যাচ্ছি। ভাস্কর বলল, এ ব্যাপারে পুকুরের জল আনতে হয়। আমি বললাম, না পুকুরের জল নোংরা, ওখানে অনেকে শৌচ করে।....

বিশ্বজিৎ দাস, গড়গড়িয়া, বীরভূম।

ব্যাখ্যাঃ- পুকুর– ধর্মশাস্ত্র। এটি হালদারপুকুর নয়, সাধারণ পুকুর। ওখান থেকে জল নিলে--শাস্ত্রমতে আচার অনুষ্ঠানগত ধর্ম মেনে চললে কুকুরের অর্থাৎ কু-সংস্কারের তথা কুসংস্কারছন্ন আচার্যদের কামড় খেতে হবে। টিউবওয়েলের জল– নিজের দেহে জেগে ওঠা দর্শন অনুভূতি লব্ধ জ্ঞান। পুকুরের জল নোংরা– এটি সংস্কারমুক্ত মানুষের দর্শন অনুভূতির সংকলন নয়, সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের ধর্মীয় বিধান যা শাস্ত্রের (ভাগবতের) শুদ্ধতা নষ্ট করে, এতে সন্ধ্যা হবে না। সন্ধ্যা– সম্যক রূপে ধ্যান, ঈশ্বরের সাথে যোগসাধন। পুজো, যজ্ঞ,নামাজ, প্রার্থনায় এই যোগ হয় না। দ্রষ্টাকে কথামৃত ও ধর্ম অনুভূতি ছাড়া অন্য ভাগবত পাঠে যেতে বারণ করছে।

● দেখছি (১০/০৭/১৭)–আমাদের বাড়ীটা মাটির বাড়ী। আমি শুয়ে আছি।

পাশে একটা বুড়ো আঙুল দেখা গেল। সেটা ধরতে চেষ্টা করলাম। ওটাকে ধরতেই ওটা অনেক বড় হয়ে গেল। এমনকি ঘর ভেদ করে বাইরে গিয়ে পড়ল, এত বড় হয়ে গেল। অবাক হয়ে দেখতে দেখতে ঘুম ভাঙল।

মিঠু বসাক, আমতলা, দঃ২৪ পরগনা

ব্যাখ্যাঃ- বুড়ো আঙুল–আত্মা, ব্যষ্টিচৈতন্য। ধরা--ধারণা করা। বাড়ী ভেদ করে গেল–আত্মা পরমাত্মায় পরিবর্তিত হয়। ব্যষ্টি চৈতন্য ধরে সমষ্টি চৈতন্যকে জানতে হয়।

সেতার শিল্পী

● গত ২৪-৫-১৭ রাত্রে স্বপ্ন দেখছি – ছেলে ঋতম্‌কে নিয়ে গেছি বিখ্যাত এক সেতার শিল্পীর বাড়ি। মনে হচ্ছে আমি বহু আগে একবার এখানে এসেছিলাম। বাড়ীটা পুরোন রাজপ্রাসাদের মতো। বড় বড় ঘরের এক একটায় এক এক রকম পশু রয়েছে – কোথাও হাতী, কোথাও শুয়োর। দোতলায় উঠে দেখি একটা বিরাট পাখি বসে রয়েছে –বৃদ্ধ– তার ডানায় অসংখ্য ছোট ছোট পাখি। তারা বড় পাখিটির গা থেকে কী যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।...

বাণী দাস, সুরুল, শ্রীনিকেতন

ব্যাখ্যা – সেতার শিল্পী – শ্রীজীবনকৃষ্ণ। সেতার – তিন তারের সমাহার। প্রথম তার বাজানো–"ধর্ম ও অনুভূতি" গ্রন্থের ১ম ও ২য় ভাগ লেখা।। দ্বিতীয় তার বাজানো–"ধর্ম ও অনুভূতি" গ্রন্থের তৃতীয় ভাগ লেখা। তৃতীয় তার বাজানো- " বৈদিক সত্য এবং একজন হিন্দু হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণ" পুস্তিকা লেখা। তাঁর দেহবীণায় তিনটি ভিন্ন রাগিনী বেজে উঠেছিল, যা লেখনীর মাধ্যমে স্থায়ীভাবে ধরে রেখেছেন। বৃদ্ধ পাখি–হোমাপাখি–সেতার শিল্পী জীবনকৃষ্ণেরই একরূপ। অসংখ্য পাখি তার গায়ে–সাধারণ মানুষকে তার সাথে আত্মিকে এক করে নিচ্ছেন–তারা সেই একত্বের মাধুর্য আস্বাদন করছে।

● গতবছর একদিন একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ল। দেখছি--একটা বন্দর। একটা জাহাজ থেকে প্রচুর লোক নামছে। এদিক ওদিকেও নানা মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে–বিভিন্ন বয়সের নারী পুরুষ। কিন্তু অবাক হয়ে দেখছি সকলের মুখ একটি ১৪/১৫ বছরের ফর্সা ছেলের মুখ। চোখে চশমা।...ঘুম ভাঙল।

দিশা গাঙ্গুলী, বেলুড়, হাওড়া

ব্যাখ্যাঃ- আমরা বাইরে বহু কিন্তু আত্মিকে একজন মানুষ।

জাহাজ বন্দরে ভিড়েছে–চৈতন্যের যাত্রাপথে মানুষ গন্তব্যে পৌঁছেছে, সবার মধ্যে একজনকে দেখে আত্মিক একত্ব বোধের সূচনা হচ্ছে।

১৪ বছর বয়স– মুক্ত পুরুষ। ১৪ সংখ্যাটি মুক্তির প্রতীক।

রিক্সাওয়ালা

● গত ১২/৫/১৭, রাত্রে স্বপ্ন দেখছি—কে একজন বলল, মদনমোহন তলায় একটা রিক্সাওয়ালা থাকে, খুব ভালো ভালো কথা বলে। আর লোকেদের কিছু খেতে দেয়। স্বপ্নে আমার ঘুম ভাঙলো। সেই রিক্সাওয়ালার অনেক খোঁজ করে শেষে দেখা পেলাম। আমি ফোন করে পাঠের মায়েদের ডেকে নিলাম। দেখি ও মদ খেয়ে চুর হয়ে খাটে বসে আছে। ওর সামনে কতকগুলি হাতপাখা, একটা টিনের বাক্স, একটা মাটির কুঁজো—এই সব জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। পুতুলদিকে বললাম, এগুলো কী জীবনকৃষ্ণের ব্যবহৃত জিনিসপত্র ? পুতুলদি বলল, দেহে সাড়া না জাগলে কিছু বলব না। অমনি রিক্সাওয়ালা ওর দিকে তাকালো। তখন পুতুলদি বলল, বুঝেছি, ওগুলো জীবনকৃষ্ণেরই জিনিস। রিক্সাওয়ালাকে এবার চিনতে পারলাম। ও তপস্বিনীর বাবা। ওকে বললাম, জিনিসগুলো এমন অবহেলায় ফেলে রেখেছো কেন ? রামকৃষ্ণের জিনিস মঠ কত যত্নে রেখেছে। এমনকি চিতাভস্মের কলসীটিও। অমনি ও বলল, ওসব তো অবস্তু। বললাম, মঠ কেমন কৃত্রিম পঞ্চবটী সাজিয়ে রেখেছে, মনে হবে ঠাকুরের যুগে আছি। অমনি ও বলল, পঞ্চবটী তো বাইরে নয়, দেহের ভিতরের সাধন বস্তু। এরপর বলল তপস্বীনীর মা ভাত রেঁধে জলভাত রেখে দিয়েছে । কেউ জল খায়, কেউ ভাত। তোমরা একটু করে ভাত খাও।

বলেই তপস্বিনীর মা-কে ডাকল। ও বটপাতায় করে একটু একটু ভাত আমাদের সবাইকে দিল। কৃষ্ণা বলল, বট পাতায় কেন ? উত্তরে বলল, বটপাতা কুড়িয়ে পাই, গাছ দেয় কুড়িয়ে আনি তাই। ......স্বপ্ন ভাঙল

রেণু মুখার্জী, সখের বাজার, কোলকাতা

ব্যাখ্যাঃ- স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন—তূরীয় অবস্থার অনুভূতি।

রিক্সাওয়ালা—নির্গুণ—মানুষকে আত্মিকজীবন দানে ত্রিমাত্রিক জীবনের অধিকারী করেন যিনি।

মদনমোহন তলা—সহস্রার—যেখানে কাম নিষ্ক্রিয়, কাজ করে না। "যাঁহা রাম তাঁহা নেহি কাম।"

আকণ্ঠ মদ পান করেছেন— মদ মানে অহং। মদপান মানে অহং নাশ— অর্থাৎ অহং-এর ক্রিয়া নেই সেখানে।

জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে—স্বপ্নেই কথোপকথনের মাধ্যমে স্বপ্নের এই অংশের ব্যাখ্যা প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

তপস্বিনী—যারা দর্শন অনুভূতির অনুশীলন করে সত্য খুঁজছে। দ্রষ্টা ও তার আত্মিক জীবনের সঙ্গীরা। তপস্বিনীর মা—জীবনকৃষ্ণের স্থূল দেহ । "বাড়ীতে মাছ এসেছে, মা নানা রকম রান্না করেছেন। কারও জন্য মাছের ঝোল, কারও জন্য কালিয়া পোলোয়া, কারও জন্য মাছ ভাজা, কারও জন্য মাছের টক, যার যা পেটে সয়।" সেই মা। যে দেহে বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র, অবতারতত্ত্ব, রসতত্ত্ব ইত্যাদি সবরকম সাধন হয়েছে।

পঞ্চবটী—পঞ্চবৃক্ষের সমাহার যেখানে— বট, অশ্বত্থ, বেল, আমলকী ও অশোক গাছ। দেহতত্ত্বে পঞ্চবটী—মূলাধার—এখান থেকে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, চিত্রা ও বজ্রানী—এই পাঁচটি নাড়ী সহস্রারে গেছে।

জলভাত রেখেছে—ব্রহ্মাবিদ্যাকে জলভাত অর্থাৎ সহজ করে প্রকাশ করেছেন। কেউ জল খায়, কেউ ভাত—কেউ জীবনকৃষ্ণকে ভগবান রূপে দেখে ভক্তিরস নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে কেউ বা ব্রহ্মজ্ঞান বা একজ্ঞান চায়।

ভাত খায়—যারা উপলব্ধি করে জগৎবৃক্ষের ভিতর প্রাণের নির্যাস দিয়ে গড়া এক শাখাবিহীন আত্মিকবৃক্ষ (spiritual tree) রয়েছে ও তারা প্রত্যেকে সেই বৃক্ষের এক একটি পাতা। একজ্ঞান হয়।

বটপাতা- দর্শন ও অনুভূতি, খসে পড়ে—নির্গুণ থেকে প্রকাশ পায়, কুড়িয়ে পায়- —আপনা থেকে হয়। বটপাতায় রেখে ভাত খায়—এই দর্শন অনুভূতি মাধ্যমেই ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন করে।

আর কবে ?

● বেলঘরিয়াতে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ইস্কনের পক্ষ থেকে এ বছর বড় আকারে উৎসব করা হয়েছে। আটদিন ধরে নাম-কীর্তন ও জগন্নাথের ভোগের আয়োজন করা হয়েছিল।

আমি চারজন বন্ধুর সঙ্গে ২৭-৬-২০১৭ তারিখে সন্ধ্যাবেলা জগন্নাথের সন্ধ্যারতি দেখতে গিয়েছিলাম। উৎসব মাঠে ঢোকার সময় আমার মাথাটা ঘুরে গেল। আমি নিজেকে সামলে নিয়ে প্যাণ্ডেলের ভিতর গেলাম। কিন্তু আমি সবকিছু অস্পষ্ট দেখছি। জগন্নাথের সামনে লাল রং-এর পর্দা দেওয়া আছে। মঞ্চের বামদিকে কীর্তন হচ্ছে। কিন্তু আমি কীর্তন শুনতে পাচ্ছি না, আমি যেন শুনছি রবীন্দ্রসঙ্গীত। আমার শরীরে অস্বস্তি শুরু হ'ল। কিছুক্ষণ পর পর্দা সরে গেল জগন্নাথের সামনে থেকে। কী আশ্চর্য, আমি জগন্নাথকে দেখতে পেলাম না। যারা হাত পা নেড়ে কীর্তন করছে তাদেরকে ভূতের মতো ছায়ামূর্তি দেখছি। স্পষ্ট কিছু দেখছি না। খুব জোরে খোল বাজছে, নাচ হচ্ছে। আর আমি দেখছি ওখানে বোলপুরের গত ৭ই জ্যৈষ্ঠের অনুষ্ঠান হচ্ছে। স্নেহময়দা পাঠ করছেন। একসময় স্নেহময়দা বৌদি (সুনন্দিতা ঘোষ) ও মাধাইদাকে মঞ্চে ডেকে গান গাইতে বললেন। ওরা গান গাইতে শুরু করল। ওদের গাওয়া "বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা"—গানটা স্পষ্ট শুনতে পেলাম। শরীরের অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল। আমি আর থাকতে পারলাম না। আমি একাই মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। আমার শরীর আরও খারাপ হতে লাগল। রাত্রে কিছু না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঐ রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম—কে যেন একজন বলছেন, "তোদের আর কবে চৈতন্য হবে ?"...

দেবনাথ রানা,বেলঘরিয়া, কোলকাতা

দেরী কেন ?

● স্বপ্নে দেখছি (০১/০৮/২০১৭)—একটা বিয়ে বাড়ি অনেক আলো দিয়ে সাজানো। উঠানের মাঝখানে মণ্ডপ আছে। আমার কাঁধে বেনারসী শাড়ি নিয়ে এঘর ওঘর করছি শাড়ী পরার জন্য। কিন্তু সব ঘর লোকে ভর্তি। বাইরে থেকে হাঁক দিয়ে কে বলছে, কনের আসতে দেরী কেন ? বর এসে অপেক্ষা করছে। এই শুনে আমি কোন মতে একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে শাড়ীটা পরে নিলাম ও মালা হাতে নিয়ে মণ্ডপে গেলাম। বরের সামনে দাঁড়িয়ে বরকে মালা পরিয়ে দিলাম। পরে মুখ তুলে দেখি বর স্বয়ং শ্রীজীবনকৃষ্ণ। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছেন।....

চন্দনা সিন্‌হা, দুবাই, UAE

ব্যাখ্যাঃ- বর আগে এসেছেন—চৈতন্য জাগ্রত করেছেন—তাই দ্রষ্টা জীবনকৃষ্ণকে পরম অবলম্বন (বর বা স্বামী) রূপে বরণ করলেন। 'মানুষের ধর্ম' বইতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বরযাত্রীরা যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করছে। বরের রথের চাকার ঘর্ঘর শব্দ শোনা যাচ্ছে কিন্তু বর এখনও এসে পৌঁছান নি। অর্থাৎ মানুষের বহু যুগের আকাঙ্খিত মানব ব্রহ্মের প্রকাশ হয় নি।

আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে, তিনি প্রকাশ হয়েছেন। আমাদের সচেতন হয়ে তাঁকে বরণ করে নেওয়ার জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন।

● দেখছি (২৯/১০/১৭)—আমার কাজটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কী করব---এই ভেবে টেনশন করছি। হঠাৎ দেখি স্নেহময় এল দু'হাতে একটা বাচ্চা ছেলেকে ধরে। ৭/৮ মাসের বাচ্চা। ও খুব ছটফট করছে। ওকে আমার হাতে দিয়ে বলল, একে নিয়ে থাকবে। বাচ্চাটা আমার হাতে এসে ১টি কথামৃত ও ১টি ধর্ম ও অনুভূতিতে পরিবর্তিত হয়ে গেল। খুব অবাক হলাম।...

আরাধনা চ্যাটার্জী, বেলঘরিয়া,কোলকাতা

ব্যাখ্যাঃ- ৭/৮ মাসের বাচ্চা—২০১৭ থেকে আধ্যাত্মিক জগতে নতুন বিকাশ ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী জাগছে। এই নতুন বিকাশের বয়স ৭/৮ মাস। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কথামৃত এবং ধর্ম ও অনুভূতি পাঠ করতে হবে।

● দেখছি— কে যেন আমাকে একটা মানিক দিয়েছে। সেটা কালো সাইড ব্যাগের ভিতর রেখেছি। কিন্তু ব্যাগ ভেদ করে মানিকের আলো বাইরে ঠিকরে পড়ছে। লোকে দেখলে কেড়ে নিতে পারে ভেবে ছুটতে লাগলাম শ্রীনিকেতন বাজারের দিকে।...

প্রশান্ত রুজ, বোলপুর

ব্যাখ্যাঃ- শ্রীনিকেতন বাজার—পাঠচক্র, দৈবী মানুষদের সম্মিলন। অনুশীলনে যুক্ত থাকলে মানিক চুরি যাবার ভয় থাকে না।

স্বপ্ন নয়

● গত আগস্টের মাঝামাঝি একদিন আমি মেয়েকে স্কুল থেকে আনতে যাচ্ছি। তখন দেখছি আমার ডানদিকের রাস্তা দিয়ে অনেক জীবনকৃষ্ণ সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে আর আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে ও টা টা করছে। সবাই ধুতি পরে খালি গায়ে। আমি অবাক হয়ে ভালো করে দেখলাম। তারপর চোখ মুছে নিয়ে আবার যখন দেখছি তখন দেখি ওরা সবাই সাধারণ মানুষ। এটা স্বপ্ন নয়—আমার জাগ্রত দর্শন।

সুস্মিতা দে, বেহালা, কোলকাতা

● গত জুলাই মাসে এক রাত্রে স্বপ্নে দেখছি—রেল স্টেশনে আছি। বাথরুমে যেতে গিয়ে দেখি নোংরা। বাথরুম না করে চলে এলাম। হঠাৎ দেখি স্নেহময়দা পাঁচীর টপকে ঢুকলেন ঐ প্লাটফর্মে। তরপর ঐ বাথরুমে গিয়ে তা ব্যবহার করে বেরিয়ে এলেন হাসতে হাসতে। আমি তো অবাক। দেখি উনি ফোনে কথা বলছেন কারও সঙ্গে। ওনার বুকের ভিতর জীবনকৃষ্ণ রয়েছেন। তাঁর সাথেই ফোনে কথা হচ্ছে। জীবনকৃষ্ণ যেন কোন কাজ করার জন্য ওনাকে জোর করছেন, চাপ দিচ্ছেন। তখন দাদা বললেন, আচ্ছা আচ্ছা করে দেব।.... ঘুম ভাঙল।

সনাতন সাহা, পাটুলী, কাটোয়া

ব্যাখ্যাঃ- স্নেহময়দা—একত্ব লাভকারী মানুষদের প্রতিনিধি। পাঁচীর টপকে আসা— আত্মিক জগৎ থেকে ব্যবহারিক জগতে নেমে এলেন। নোংরায় ভ্রুক্ষেপ নেই—একত্বলাভ হলে সংসারে নির্লিপ্ত থাকা যায়। ফোনে কথা হচ্ছে— ভিতর থেকে নির্গুণের বার্তা আসে। তার এত জোর যে দেহী সেই কথা মতো কাজ করতে বাধ্য হন।

কুনাল

● দেখছি (১১.০৬.১৭)— কুনাল বলল, নির্গুণের ক্রিয়া শুরু হলে সারা পৃথিবী জুড়ে ভূমিকম্পের মত কম্পন শুরু হবে। যদিও তাতে কারও কিছু ক্ষতি হবে না। এই ম্যাগাজিনে সেকথা লেখা আছে বলে একটা ম্যাগাজিন দেখালো। তারপর বলল, দ্যাখ কম্পন শুরু হয়ে গেছে। আমি দেখলাম, তাই তো। মাটি কাঁপছে। পুরো এলাকার ঘরবাড়ী সব কাঁপছে। কিন্তু কোন অসুবিধা হচ্ছে না। কারও কোন ক্ষতি হচ্ছে না।....

পার্থসারথি ঘোষ, বেলঘরিয়া,কোলকাতা

ব্যাখ্যাঃ- কুনাল—পদ্ম—দ্রষ্টার চৈতন্যসত্তা। নির্গুণের সর্বব্যাপী ক্রিয়া শুরু হয়েছে—অর্থাৎ সমষ্টির ধর্ম শুরু হয়েছে। ম্যাগাজিনে লেখা আছে— ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষের আত্মিক একত্বের স্ফুরণের কথা নিয়ে অনুভূতি সমৃদ্ধ কোন ম্যাগাজিন বেরোবে।

● আজ (১৭/৬/১৭) দুপুরে স্বপ্ন দেখছি—ঘরে কাপড় ছাড়ছি হঠাৎ দরজা ঠেলে মাসীমা ও তার ছেলে রণবীর ঢুকল। আমার গায়ে কাপড় নেই। লজ্জায় পড়ে গেলাম। মাসীমা বিছানায় বসল। রণবীর নামকরা বিজ্ঞানী এখন। ও নীচে মেঝেতে বসে একটা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াতে লাগল। আমি বললাম, এ কী করছ ? তুমি দুধ খাওয়াচ্ছ কেন ? আমি খাইয়ে দিতাম। মাসীমা বলল, না, ও খাওয়ালে বাচ্চাটার কল্যাণ হবে। শুনে অবাক হলাম। তখন দেখি মাসীমায়ের দাঁতগুলো সব নীল। আবার আয়নায় দেখি আমার দাঁতগুলোও নীল। খুব অবাক হলাম। .... ঘুম ভাঙল।

রূপা মাজি,আমতলা, দঃ ২৪ পরগনা

ব্যাখ্যা ঃ--পুরুষের দুধ — অর্থাৎ নির্গুণের তেজ লাভ করলে সত্যের ধারণা হয়, প্রকৃত কল্যাণ হয়। বাচ্চা — দ্রষ্টার নতুন আত্মিক অবস্থা। মাসীমা — জগৎ। নীল দাঁত — বিশ্বব্যাপীত্বের সাধনের ফল উপভোগ করেছেন। দ্রষ্টা এবার নতুন সাধনতত্ত্ব সমষ্টির ধর্ম বুঝবেন তাই কাপড় ছাড়ছেন— দেহের পরিবর্তন হচ্ছে।

ভোগান্ন

● দেখছি (২৫-৯-১৭) — দুর্গাপুরে বাজার করতে গেছি। একটা গলির কাছে এসে ছেলে বলল, দাদুর সঙ্গে দেখা করবে না ? তখন একটা বাড়ীতে গেলাম। দেখি ধুতি পরে খালি গায়ে একজন বসে আছে। ওকেই আমার ছেলে দাদু বলছে। হঠাৎ মনে হ'ল ওনার নাম ভৈরব ভট্টাচার্য্য। উনি বললেন, অনেকদিন থেকে কথা হয়ে আছে যে আজ তোমরা এখানে খেয়ে যাবে। তখন আমার এক ছাত্র দুটি বেগুন আর এক গ্লাস জল নিয়ে এসে বলল, এই পরীক্ষাটা দেখুন স্যার। আমি বললাম, কেন, নীল হচ্ছে না ? ও বলল, দেখুন না। ...ঘুম ভাঙল। মনে হল ভৈরববাবু রূপে তো শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দেখলাম।

অমরেশ চ্যাটার্জী, ইলামবাজার, বীরভূম

ব্যাখ্যাঃ- ভৈরব—শিব-পরম এক। খাওয়া—সাধন হওয়া। সমষ্টির সাধন হবে। তখন নির্গুণ (বেগুন) ও নিরাকারের (জল) ধারণা হবে। এ জিনিস বিশ্বব্যাপিত্বের ঊর্ধ্বে। আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে— জীবনকৃষ্ণের এক স্বপ্নে জানা গিয়েছিল পঞ্চাশ বছর পর অর্থাৎ 1967+50=2017 থেকে এই সমষ্টির সাধন শুরু হবে।

● আজ ভোরে (৮.১০.১৭) ঘুম ভাঙছে আর মুখে বলছি—"ভোগান্ন সম্ভূত।" উঠে ভাবছি, এ কী বলছি! এ তো জীবনকৃষ্ণ এক দৈববাণীতে শুনেছিলেন।...

স্নেহময় গাঙ্গুলী, চারুপল্লী

ব্যাখ্যা- বাহ্যধর্মে বলা হয় প্রসাদ কনিকা মাত্র। প্রসাদ পেটভরা হলে তাকে ভোগ বলে। বস্তুত যেখানে যতটুকু আত্মিক বিকাশ প্রত্যক্ষ করা যায় তার উৎস কিন্তু সেযুগে নির্গুণের সম্যক প্রসন্নতাপ্রাপ্ত মানুষটি। যুগে একজনের মধ্যে ষোলআনা প্রকাশ, অন্যত্র আংশিক প্রকাশ।

বিম্ব নয়

● দেখছি (অক্টোবর, ২০১৭)- জ্যাঠতুতো বোন সোমশ্রীর বিয়ে। ওকে খুব সুন্দর লাগছে। রান্নাঘরে মা-কে সেকথা বলছি। মা একটা থালার উপর কীসব স্তূপাকার করে রেখে সেদ্ধ করছে। একটু পর ওগুলো তুলে নিল। থালায় যে সেদ্ধ জলটা থাকল তাতে জীবনকৃষ্ণের প্রতিচ্ছবি দেখা গেল। উনি আমাকে বললেন, "সত্যকে খুঁজে বার করতে হবে। সত্যকে জানাই জীবনের সার কথা।" তারপর মা থালা থেকে ঐ প্রতিচ্ছবিটা তুলে অন্য এক স্থানে রাখল।...

রোহিনী সিন্হা, দক্ষিণেশ্বর

ব্যাখ্যাঃ- বোনের বিয়ে—জগৎ পরমপুরুষের সাথে মিলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। জীবনকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষের দেখা প্রতিবিম্ব সূর্য দর্শন। প্রতিবিম্ব সূর্য ধরে ধরে সত্য সূর্য পাওয়া যায়। "মনুষ্যজাতির মধ্যে এক অখণ্ড চৈতন্যকে বোধে বোধ করা চাই, তবেই সত্যকে পাওয়া হবে।"

● গতকাল রাতে (৩০/১০/১৭) স্বপ্নে দেখছি—রামেশ্বরম্ যাওয়ার জন্য সমুদ্রের মাঝে রাস্তা তৈরী হয়েছে। সেই পথে পাঠচক্রের সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ হুড খোলা গাড়ি করে সহজেই সমুদ্র পার হয়ে যাচ্ছে। পরের দৃশ্যে দেখছি— রামেশ্বরমে কোন এক বাড়ির দেওয়ালে শ্রীজীবনকৃষ্ণের প্লাস্টার অফ্ প্যারিসে তৈরী মুখমণ্ডল আটকানো আছে। স্নেহময়দা জীবনকৃষ্ণের ঐ মূর্তির নাকে হাত দিয়ে আমাদের বললেন, কী টিকালো নাক! এই কথা বলে যেন ভাস্করের মত নাকের একটা shape দিতে লাগলেন। plaster of paris তখনও কাঁচা ছিল। স্নেহময়দা বললেন, কী গরম নিঃশ্বাস পড়ছে দ্যাখ এসে। আমরা মূর্তির নাকের নীচে হাত রেখে তা অনুভব করলাম। বেশ গরম নিঃশ্বাস।....

সুনন্দিতা ঘোষ, বেলঘরিয়া, কোলকাতা

ব্যাখ্যাঃ- আমরা প্রতিবিম্ব থেকে সত্যসূর্যের কাছে পৌঁছে গেছি ও একত্বের সূচনা হচ্ছে। রামেশ্বর- শিব—এক।

পুলিশ

● দেখছি (৩০.০৭.১৭)- স্নেহময় হাতে করে একটা কাঁসার বাটি ধরে আছে। বাটির উপরটা কাগজ দিয়ে ঢাকা। ও নীচ থেকে ওর হাতটা সরিয়ে নিল। কিন্তু বাটিটা শূন্যে দাঁড়িয়ে রইল, নীচে পড়ে গেল না। আমাকে বলল, এটা কী করে হচ্ছে? আমি বললাম, কাগজে যে পুলিশের ছবি রয়েছে সেই পুলিশগুলো বাটিটা ধরে আছে।.... ঘুম ভাঙল।

শিপ্রা নাথ (লিলি),শীলপাড়া,কোলকাতা

ব্যাখ্যাঃ- কাঁসার বাটি শূন্যে রইল—দেহের উচ্চ আত্মিক অবস্থা বজায় থাকল। কাগজ--যাতে স্বপ্ন লেখা থাকে। এখানে স্বপ্নকে বোঝাচ্ছে। পুলিশ—কর্মফল। স্বপ্ন লেখা ও তা স্মরণ মনন করার সুফল (effect) স্বরূপ দেহের উচ্চ আত্মিক অবস্থা বজায় থাকে।

● দেখছি (৩.১০.১৭)—আমার হাতে একটা ঝিনুক রয়েছে। যেন ঐ ঝিনুকটাই আমার সন্তান। হাতের তালুতে ওকে রেখেছি। বাচ্চাটার কোন ক্ষতি যেন না হয়। ভাবছি এইটুকু ছেলে বাঁচবে কী করে ? কী করেই বা ওকে মানুষ করব। বাড়ীর অন্যান্য কাজ করে যাচ্ছি। তারপর হঠাৎ ঝিনুকটার মুখ খুলে গেল। অবাক হয়ে দেখছি ওর ভিতর থেকে ছোট্ট একটা মানবশিশু বেরিয়ে এল। ওটাকে নিয়েও একই ভাবনা। বাঁচবে তো ? কীভাবেই বা বড় হবে ?....

মিতালী দত্ত, গড়গড়িয়া

ব্যাখ্যাঃ- ঝিনুক—সর্বজনীন মানবের চিন্ময় রূপ যা ভিতরে দেখা যায়। মানব শিশু—নিজের ব্রহ্মস্বরূপ। হাতের মধ্যে— অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের ব্রহ্মসত্তার বিকাশ ঘটানোর কিছু দায়িত্ব দ্রষ্টার হাতে ন্যস্ত।

বিচ্যুতি

● দেখছি—এক জায়গায় একজন সুদর্শন যুবককে গোল করে ঘিরে বেশ কয়েকজন ছেলে বসে আছে। ওদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে কথা হচ্ছে। আমাকে দেখতে পেয়ে মধ্যমনি যুবকটি ডেকে কাছে বসতে বলল। আমি ওর কাছে গিয়ে বসলাম। ও বলল, দ্যাখো বেদের ঋষিরা বলেছিল—"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতু।" শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "মানুষের দেহে ভগবান।" আর জীবনকৃষ্ণ বললেন, "তোর দেহে ভগবান।" আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে **"তোর দেহে ভগবান"** কথাটা এত জোরে বললো যে চমকে উঠলাম। ঘুম ভেঙে গেল।

মিনতি ব্যানার্জী, জামবুনি, বোলপুর

● দেখছি (১৯.৭.১৭)—একটা সরলরেখা দেখিয়ে বাবা বলল, এর বিচ্যুতি কত? বললাম, এর বিচ্যুতি নেই। এটা সরলরেখা। তখন বাবা ওর গায়ে আর একটা সরলরেখা আঁকল। দুটি রেখা একটি কোণ তৈরী করল। বললাম, এবার বিচ্যুতি কত বলা যাবে। মনে হঠাৎ স্ফুরণ হ'ল—নতুন আদর্শ স্থাপিত হলে পূর্বের আদর্শ জীবনের বিচ্যুতি ধরা পড়ে।

অমৃত চ্যাটার্জী (শঙ্খ), ইলামবাজার, বীরভূম

সমীকরণ

● দেখছি (২৫.৭.১৭)— বায়োলজির স্যার সোমেশ্বর বাবু আমাকে বললেন, এই সমীকরণটা মনে করে রাখবি, কাজে লাগবে। এই বলে একটা সমীকরণ (equation) লিখে দিলেন।

$$\frac{1^2}{100}+\frac{2^2}{200}+\frac{3^2}{300}+....=\frac{\infty^5}{\infty}$$

খুব অবাক হলাম।...ঘুম ভাঙল।

সাগর ব্যানার্জী, বোলপুর, বীরভূম

ব্যাখ্যাঃ- বায়োলজির স্যার অংক দেখাচ্ছেন— এই অংক প্রাণের বিকাশ সম্পর্কিত। সোমেশ্বর—শিব—পরম এক।

বস্তুতত্ত্বে সাধন যার তার সাধন একেবারে গোড়া থেকে, সচ্চিদানন্দগুরু লাভ (১ unit) থেকে শুরু—ধারাবাহিক সাধন হয়ে তিনি ভগবান দর্শন করেন (100 unit) ও পরে নির্গুণের সাথে এক হয়ে যান—অনন্ত (∞) হয়ে যান। পরে আরও বিকাশ হয়, সেই বিকাশের পাঁচটি ধাপ আছে (∞^5)।

২য় স্তরের সাধন যাদের অর্থাৎ সাধারণ মানুষ প্রথমেই একজন সর্বজনীন মানবের রূপে ভগবান দর্শন করে। সেই ভগবানই শিক্ষা দেন গুরুর মতো। পরে নির্গুণের ঘনমূর্তি দর্শন হলে ও তার সাথে একত্ব লাভ হলে নির্গুণের দ্বার খুলে যায়, মানুষটা অনন্ত (∞) হয়। তখন তিনি পরম অনন্তের তথা নির্গুনের ঘনমূর্তির (∞) রসাস্বাদনে সমর্থ হন।

● গত ২৬শে সেপ্টেম্বর রাত্রে স্বপ্নে দেখছি —পথ দিয়ে হাঁটছি। মনে হচ্ছে বহু মানুষ সাপের মতো খোলস ছাড়ছে। এক জায়গায় চোখে পড়ল দু'জন মানুষের সম্পূর্ণ খোলস পড়ে রয়েছে। অবাক হয়ে ভাবছি এ কী করে সম্ভব ?

কৃষ্ণা ব্যানার্জী, বোলপুর, বীরভূম

ব্যাখ্যা ঃ--মানুষের নবজন্ম ঘটছে— প্রকৃত স্বরূপের (real self) -এর প্রকাশ ঘটছে।

নতুন রাস্তা

● দেখছি (১৫.৬.১৭)- একটা বিয়ে বাড়ি। একজন আমাকে কোলে করে নিয়ে কনের কাছে গিফট হিসাবে নামিয়ে দিল, যেন আমিই একটা গিফট্ (উপহার)। কনের পাশে

বসে অন্যদিকে তাকিয়ে দেখি ৭ই জ্যৈষ্ঠের অনুষ্ঠান চলছে। অনুষ্ঠানের জায়গা থেকে বাইরে যাবার রাস্তাটা দেখছি পায়েস দিয়ে তৈরী। কী মিষ্টি গন্ধ আসছে সেখান থেকে। বাবা ও শ্রীধর জেঠু কিছু চাল দেখিয়ে বলল, এই ভাল চাল দিয়ে ঐ পায়েস রান্না হয়েছে। খুব আনন্দ হচ্ছে।...

পায়েল রুজ, বোলপুর, বীরভূম

ব্যাখ্যাঃ- যিনি ঈশ্বরের উপহার হিসাবে ঈশ্বর প্রেম লাভ করেছেন তিনি নিজে আবার ভক্তের জগতের কাছে উপহারস্বরূপ হয়ে যান। এদের দর্শনের মাধ্যমে জগৎ জানতে পারে আধ্যাত্মিক জগতে মানুষের ব্রেন কোয়ালিটি উন্নত হয়েছে ও সমষ্টির ধর্মের পথ খুলে গেছে।

● দেখছি (১৬.৬.১৭)—বাসে করে পাঠের সব লোক কোথাও যাচ্ছি। এক জায়গায় নেমেছি। গাড়িতে ওঠার আগেই গাড়ী আমাকে ছেড়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর দেখি গাড়ীটা ফিরে আসছে। আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। আমি উঠলাম। গাড়ী সামনে এগোতে লাগল। দেখি স্নেহময়দার কোলে একজনের মৃতদেহ। মনে হচ্ছে এই একজন মারা গেছে বলেই গাড়ী ফিরে এসে আমাকে তুলে নিল। মৃতদেহ থাকা সত্ত্বেও সকলে খুব আনন্দ করে যাচ্ছে। একটু অবাক হলাম।

করবী রুজ, বোলপুর, বীরভূম

ব্যাখ্যাঃ- একজন মারা গেছে—একজনের ধর্ম অর্থাৎ ব্যষ্টির ধর্ম শেষ হয়ে গেছে। শুরু হয়েছে সমষ্টির ধর্ম। এখন ধর্মজগতে সকলে মিলে এগিয়ে যাওয়ার যুগ।

আনন্দঘন

● দেখছি (১৫.৯.১৭)—আমি যে ঘরে রয়েছি সেই গোটা ঘরটা জুড়ে রয়েছেন এক মহামানব। তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরতে চাইছি। ঘরের মধ্যে বহু মানুষ রয়েছে। তাদের গায়ে গা ঠেকছে। কিন্তু তাদেরও কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। প্রচণ্ড আনন্দ হচ্ছে। মুখেও বলছি "আনন্দ! আনন্দ!..." আর একে ওকে ঠেলে এগোচ্ছি মহাপুরুষটিকে জড়িয়ে ধরব বলে।...ঘুম ভাঙল।

বিশাখা চ্যাটার্জী, জামবুনি, বোলপুর

ব্যাখ্যাঃ- সাধারণ মানুষের ব্রহ্মময়ী হ'ল নির্গুণ ব্রহ্ম। তাকে দেখা যায় না। শুধু অনুভব করা যায় জগৎ ব্যাপ্ত এক মানুষ রূপে, যার মধ্যে আছে সকল মানুষ।

● দেখছি (২৫.৮.১৭)—একটা বড় ছাঁকনীর উপর শ্রীজীবনকৃষ্ণ শুয়ে আছেন। আমি ওনার পাশে বসে ওনার পেটে হাত দিয়ে আছি। বোধ হল উনি মারা যাচ্ছেন। চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম। তখন এক ভদ্রলোক এলেন—জীবনকৃষ্ণের মতোই দেখতে। উনি হাত দিয়ে জীবনকৃষ্ণের মাথাটা টেনে ধড় থেকে ছাড়িয়ে নিলেন। ধড়টা যেন আমাদের জন্য,

সাধারণ মানুষের জন্য রেখে দিলেন।.....চরম বিস্ময় নিয়ে ঘুম ভাঙল।

সবিতা ঘোষ, চারুপল্লী, বোলপুর

ব্যাখ্যাঃ- শ্রীজীবনকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক জীবনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করার (ছাঁকার) সময় উপস্থিত। তাঁর চিরগতিশীল আত্মিকচৈতন্যকে (মাথা) পূর্ণভাবে ধারণা করতে পারবেন একজন যার আধার তাঁর মতোই বিরাট (দেখতে একই রকম)। তখন বাকীরা তাঁর স্থূলদেহ থাকতে যে লীলা হয়েছে (ধড়), চৈতন্যের যে বিকাশ হয়েছে তা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।

অখণ্ড

● দেখছি (২৬.৬.১৭) দুটি কাঁচের গ্লাস নামানো—ফাঁকা। একটু পর দেখছি--একটা গ্লাসের ভিতর বহু মানুষজন। অপরটির ভিতর পাঠের লোকদের স্বপ্ন পুড়িয়ে কালো ছাই রাখা হয়েছে। স্বপ্ন যেন বস্তু। স্বপ্নগুলোর কিনারা লাল হয়ে রয়েছে, এখনও পুড়ছে তবে আগুনের কোন শিখা দেখা যাচ্ছে না।....

অর্পিতা সাহা, সখেরবাজার, কোলকাতা

ব্যাখ্যাঃ- শ্রীজীবনকৃষ্ণ ১৯৬২ তে এক দর্শনে দেখেছিলেন—ওনার সামনে দুটি বড় সাদা কলাইকরা গ্লাস নামানো। দুটিই খালি। উনি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, যারা ওনাকে দেখবে তারাই ধর্মজগতে থাকবে বাকীরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

এই স্বপ্নে ঐ ব্যাখ্যাটা সহজ হয়ে ধরা পড়ল। শুধু দেখা নয়, যারা জীবনকৃষ্ণকে ভিতরে দেখে তার সাথে তথা মনুষ্যজাতির সাথে একত্ব লাভ করবে তাদের জীবনে প্রতীকতত্ত্বের অবসান হবে (স্বপ্ন পুড়ে যাবে। নির্যাসটা পাওয়া যাবে)। ধর্মজগতে তারাই থাকবে, অন্যেরা নয়।

এ সত্য নয়

● দেখছি (১০.৬.১৭)— একজন ছেলে একটা গাছে একটা পাইপে মুখ ঠেকাচ্ছে, অমনি পাইপের অপর প্রান্ত দিয়ে দুধ পড়ছে। আমার মনে হ'ল, এ হচ্ছে যোগাঙ্গের কথা। যোগাঙ্গের সাহায্যে অনুভূতির মর্মার্থ বা সারাংশ পাওয়া যায় তা দেখাচ্ছে। পাশে স্নেহময়দা ছিল। দাদা বলে উঠল, এ সত্য নয়। আমি অবাক হলাম। ঘুম ভাঙল।

বরুণ ব্যানার্জী, বোলপুর, বীরভূম

ব্যাখ্যাঃ- গাছ— দেহেতে জেগে ওঠা দর্শন অনুভূতি। পাইপ —একটি দেহেতে প্রকাশিত সাধনতত্ত্ব। এর দ্বারা ব্যষ্টির সত্য জানা যায়। কিন্তু দুধ নয়, আমাদের কাম্য মধু--বহুত্বে একত্বের চৈতন্য। ব্যষ্টির সত্য প্রকৃত সত্য নয়, একমাত্র সমষ্টিতেই তার পরিচয় মেলে।

● দেখছি (৩.৬.১৭)—গণেশ ঠাকুর একটি শিবলিঙ্গ জড়িয়ে ধরে আছে। শিবলিঙ্গটা বাড়ছে, গণেশও বাড়ছে। একসময় গণেশকে আর দেখা গেল না। শিবলিঙ্গটা জীবন্ত শিবঠাকুর হয়ে বাড়তে লাগলেন। পাশে আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমিও বাড়ছি। এক সময় শিবঠাকুরের বৃদ্ধি থেমে গেল। আমি তখনও বেড়ে চলেছি। নীচের দিকে মুখ করে দেখছি আমি ওর থেকে অনেক বড়।....

অভিজিৎ রায়, ইলামবাজার, বীরভূম

ব্যাখ্যাঃ- গণেশ—সমাজে স্বীকৃত ধর্মাচার্য। প্রতীকি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের স্রষ্টা। প্রতীক দর্শন হলে ধর্মাচার্যরা উৎফুল্ল হয় কিন্তু প্রতীকদর্শন পূর্ণাঙ্গ রূপ পেলে তা ধর্মাচার্যদের ব্যাখ্যাতীত হয়। পরে প্রতীকতত্ত্বের অবসান হলে মানুষ বোঝে সে নিজে ঈশ্বর—"অহং ব্রহ্মাস্মি।'

নতুন বই

● দেখছি (৫.৬.১৭)—কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শিশিরদা একটা বই লিখেছেন-—সেটা ছাপানো হয়েছে। তার কপি দিলেন গোপালদা ও মৃণালকান্তিদাকে। ওনারাও আমার কলেজের অধ্যাপক। আমি ছাত্র বলে আমাকে ঐ বই দিলেন না। আমার আফশোষ হ'ল। দৃশ্য বদলে গেল।

দেখছি— একটা বিরাট আমগাছের বিশাল গুঁড়ির উপর দুটি ডালের মাঝে একটা বই ঠেসানো রয়েছে। বইটির দাম দু'টাকা, লেখক শিশির মুখোপাধ্যায়। পাশেই ওনার ঘর। আমি ঐ বইটা নেবার জন্য শিশিরদার ঘর গেলাম। ওখানে গোপালদা ও মৃণালদা রয়েছেন। আমি মানিব্যাগ বের করে ও টুপী খুলে রাখলাম। গোপালদা টুপীটা নিয়ে তার সাথে শিশিরদার টুপী যোগ করে মজবুত একটা টুপী বানিয়ে আমায় পরিয়ে দিলেন। ওটা খুলে দেখি চারটে টুপী যোগ করে ওটা তৈরী। শিশিরদাকে বললাম, গাছে আপনার যে বইটা রয়েছে ওটা নেব। উনি বললেন, ভাল কথা, তার সাথে ফ্রি-তে দেব আমার হাতে লেখা কিছু notes-এর খাতা। এখন চল, বইটা দেখাও। বাইরে এসে আমি আগের দেখা গাছটি বা বইটি দেখতে পেলাম না। তবু একটা গাছের ডালের দিকে আঙুল দেখাতেই সমর্পন ছুটে গিয়ে একটা বই ঐ গাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে এল দু'চারটে পাতা সমেত। যেন গাছে ফল ধরার মতো করে ধরেছিল বইটি। শিশিরদা বললেন, বইটির দাম ৫০ টাকা। এটি কিন্তু দিতে হবে। তবে এটি (বইটি) দেওয়ার সময় উৎসব উপলক্ষ্যে তুমি যতজনকে আমন্ত্রণ জানাবে তাদের সকলকে খাইয়ে দেবার সব খরচ আমার। আমি অবাক হ'লাম ওনার কথা শুনে। তারপর টাকা দিতে গিয়ে মনে পড়ল মানিব্যাগ তো ওনার ঘরে রেখে এসেছি। ছুটলাম ওনার বাড়ী। সেখানে মানিব্যাগ খুঁজতে খুঁজতে ঘুম ভেঙে গেল।

স্নেহময় গাঙ্গুলী, চারুপল্লী, বীরভূম

ব্যাখ্যাঃ- প্রিন্সিপ্যাল শিশিরদা—সমষ্টি চৈতন্য, নির্গুনের ঘনমূর্তি। গোপালদা—বিশ্বব্যাপী চৈতন্য সত্তা, শ্রীজীবনকৃষ্ণ। মৃণালকান্তিদা—ব্যষ্টি চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ।
শিশিরদার টুপী যোগ করায় ৪টে টুপীর সমান হ'ল—নির্গুণের যোগে একসের ঘটি চারসের ঘটি হ'ল—অখণ্ড চৈতন্যকে যাতে ধারণা করতে পারে, তার সাথে একত্বের রস আস্বাদন করতে পারে। ২ টাকা দামের বই— ৩২ আনা তথা বিশ্বব্যাপিত্বের উপর লেখা বই, ধর্ম ও অনুভূতির ৩য় ভাগ। সমর্পন গাছ থেকে বইটা পেড়ে আনল—সমর্পিত প্রাণ হয়ে জগৎবৃক্ষে ফুটে ওঠা সাধারণ মানুষের অনুভূতি সম্বলিত সমষ্টির ধর্মের বই সংগ্রহ করা, যার উদাহরণ হ'ল সাম্প্রতিক মানিক পত্রিকা (৬৭ নং সংখ্যা)। সঙ্গে দু'চারটে পাতা—এই দর্শন অনুভূতি থেকে বোঝা যায়—"গাছের পাতাটি নড়ে ঈশ্বরের ইচ্ছায়"। জীবনকৃষ্ণ বললেন, গাছের পাতা নড়ে না ঈশ্বরই নড়েন। মানুষের জীবন আন্দোলিত ও পরিচালিত হয় নির্গুণের ইঙ্গিতে। মানিব্যাগ শিশিরদার ঘরে—নির্গুণের সাথে যুক্ত হয়ে থাকলে এই পত্রিকার যথাযথ মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। ৫০ টাকা দাম—এই পত্রিকায় স্বপ্ন লিখে স্বপ্নের তাৎপর্য ৫০ শতাংশ প্রকাশ করা যায়, বাকী ৫০ শতাংশ প্রকাশ পাবে তা পাঠ ও অনুশীলনের সময়। বই দেওয়া উপলক্ষ্যে যে উৎসব হবে তাতে আমন্ত্রিত সকলকে খাওয়ানোর দায়িত্ব নেবেন-—মানিক পত্রিকা প্রকাশ উৎসবে যারা হাজির হবেন তাদের ঈশ্বরীয় অনুভূতি দান করবেন ও ব্রহ্মানন্দ দান করবেন।।

শিশিরদা তাঁর লেখা বই গোপালদা ও মৃণালদাকে দিলেন কিন্তু দ্রষ্টাকে দিলেন না-—এযাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীজীবনকৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ নির্গুণের তত্ত্ব জানতে পারে নি। বর্তমান যুগে সাধারণ মানুষও নির্গুণের পরিচয় পাবে।

চুম্বক পাথর

● স্বপ্নে দেখছি (sept, 2017)— আমি সন্ধ্যাবেলা মাঠের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি। দেখলাম দূরে একটা কী চকচক করছে। যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে, কাছে গিয়ে দেখলাম একটা পাথর। সেটা কুড়িয়ে নিলাম। আরও একটু দূরে আর একটা ছোট পাথর দেখলাম। তার উজ্জ্বলতা একটু কম। ওটা হাতে তুলে নিতেই চুম্বকের মতো দুটো পাথর জুড়ে গিয়ে এক হয়ে গেল। এটা ঘটার সাথে সাথে আমার সামনে একটা দৃশ্য ফুটে উঠল। আমার মা রেগে গিয়ে আমায় মারতে আসছে। কিন্তু পাথরটা থেকে এত জ্যোতি বেরোচ্ছে যে তার তেজে মা ছিট্‌কে পড়ল দূরে।

আমি vision -এ এটা দেখে তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে মা-কে বললাম, মা আমাকে মারো। মা বলল, তোকে শুধু শুধু মারব কেন ? আমি বললাম, মারোই না। তখন মা আমাকে বেশ জোরে জোরেই মারতে লাগল। তাতে আমার লাগছে না দেখে একটা সাঁড়াশি দিয়ে আঙুলগুলো মুচড়ে দিতে লাগলো। কিন্তু অত মারেও আমার ব্যাথা হ'ল না। যেটুকু লাগছিল তা উপেক্ষা করা যায়।.... ঘুম ভাঙল।

অঙ্কনা মাইতি, কাঠডাঙ্গা, কোলকাতা

ব্যাখ্যাঃ- বড় চুম্বক পাথর—ঈশ্বর। ছোট পাথর—দ্রষ্টার নিজের আত্মিক সত্তা। এক হয়ে গেল-একত্ব লাভ হ'ল। মা—জগৎ। সাঁড়াশি দিয়ে আঘাত— ব্যবহারিক জগৎ সাঁড়াশি আক্রমন করবে। চারিদিক থেকে আঘাত করে দিশাহারা করার চেষ্টা করবে। কিন্তু আত্মিক একত্ব লাভ হলে সে এই সমস্ত বাহ্য দুঃখে নির্লিপ্ত থাকবে।।

বিবেক

● গতরাত্রে (২৩.৯.১৭) দেখছি—আমি একটা স্টেশনে আছি। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করছি, তোমার কী ঈশ্বর দর্শন হয়েছে? হঠাৎ দেখি একটা ট্রেন আসছে। ট্রেনটির ড্রাইভার শ্রীজীবনকৃষ্ণ। ট্রেন আমাকে সজোরে ধাক্কা মারল। আমি অনেক দূরে গিয়ে পড়লাম। দেখি আমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা কেটে আলাদা হয়ে গেছে, রক্ত পড়ছে। স্নেহময় জেঠু এলেন আর ঐ কাটা আঙুলটা তুলে বললেন, তোর কিছু প্রশ্ন আছে ? তারপর নিজেই বললেন, জানি তোর কী প্রশ্ন আছে। আমার কাটা আঙুলটা তুলে দেখালেন, সেখানে লেখা রয়েছে, "বিবেক উপলব্ধি"—এই কথাটা। আমি বললাম, উত্তর পেয়ে গেছি। জেঠু হেসে কাটা আঙুলটা হাতে লাগিয়ে জুড়ে দিয়ে ঐ ট্রেনে চেপে গেলেন।...

অর্ণব চ্যাটার্জী, গড়গড়িয়া, বীরভূম

ব্যাখ্যাঃ- নিজেকে নিজে প্রশ্ন করলেই বুঝতে পারা যাবে যে ব্যষ্টির সাধনের ঈশ্বর দর্শন (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মা) ও বিবেক লাভ আমাদের হয় না। অখণ্ডচৈতন্যের (জীবনকৃষ্ণের) সাথে একত্ব লাভের মাধ্যমে (ট্রেনে উঠে) ধর্মজগতে আমাদের গতি লাভ হয়, ঈশ্বরীয় জ্ঞানলাভ হয়।

● দেখছি (১০.১০.১৭)—মাথায় একটা টিউমার হয়েছে। ওটা পেকে গিয়ে ফেটে রস গড়াতে লাগল। আমি একটা তোয়ালে দিয়ে তা মুছতে গেলাম। মুছে দেখি তোয়ালের মধ্যে রক্তরস লেগে নেই, রয়েছে একটা বাচ্চা ছেলে। সে চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছে। আমি তো অবাক। মাকে ডেকে দেখালাম।

সুব্রত সাহা, জামবুনি, বোলপুর

ব্যাখ্যাঃ- শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলেছিলেন, তোদের ব্যষ্টির সাধন হবে না, তোদের ব্রেন পাওয়ার আশ্রয় করে এই আত্মবিদ্যা প্রকাশ পাবে।

পাঠ প্রসঙ্গে

১. "জ্ঞানদীপ জেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখো না।"

ব্যষ্টিঃ- জ্ঞানদীপ— সচ্চিদানন্দগুরু। ঘরে— দেহে। ব্রহ্মময়ী—আত্মা। আত্মার মধ্যে জগৎ দেখলে বোঝা যায় আত্মা জগৎপ্রসবিনী, ব্রহ্মময়ী। আত্মার মহিমা ধারনা হতে থাকে সাধকের কাছে।

বিশ্বব্যাপিত্বঃ- জ্ঞানদীপ—নিজের চিন্ময়রূপ যা অপর বহু মানুষ অন্তরে দেখে ও তা জানায়। ঘরে— তিনি তখন ব্যষ্টি অর্থাৎ নিজের দেহ ঘর ছেড়ে সত্য দেখছেন, বহু মানুষের দেহে। ব্রহ্মময়ী—জগৎচৈতন্য। মনুষ্যজাতির প্রাণচৈতন্যের নির্যাসের সমষ্টি হ'ল জগৎচৈতন্য। সাধক বোঝেন তাঁরই রূপে জগৎচৈতন্যের প্রকাশ। তাই মানুষ তাঁকে স্বপ্নে সূর্যের ভিতর দ্যাখে। অপর বহু মানুষের বিচিত্র স্বপ্নে ব্রহ্মময়ীর পরিচয় পান।

সমষ্টিঃ- জ্ঞানদীপ—বিশ্বমানবের (Cosmic man-এর) চিন্ময় রূপ যেখানে অসীম ধরা পড়েছে সীমায়। এ যেন জ্ঞানদীপ নয়, জ্ঞান সূর্য। ঘরে— নিজের ও অন্যের দেহ ঘরে। ব্রহ্মময়ী— সমষ্টি চৈতন্য। এই চৈতন্যকে জানা, তাঁর সাথে একত্ব লাভ করে। এই ব্রহ্মময়ীর রূপ, নির্গুনের ঘনীভূত রূপ, ক্রমে অরূপে হারায়। সীমা বিলীন হয় অসীমে। শুধু ঈশ্বরীয় আনন্দ অনুভূত হয় আর উপলব্ধি হয় একজনই আছেন, তাঁর মধ্যেই আছে সকল মানুষ, আনন্দ সাগরে আনন্দ লহরী রূপে।

২. "পাত্র দেখে উপদেশ দিতে হয়।"

ব্যষ্টিঃ- শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কেউ এলে তিনি তার রূপ ভিতরে দেখতে পেতেন, বুঝতে পারতেন তার ভাব, বৈষ্ণব না শাক্ত না নাস্তিক ইত্যাদি। সেইমতো তার সাথে ঈশ্বরীয় কথা বলতেন।

বিশ্বব্যাপিত্বঃ- শ্রীজীবনকৃষ্ণ সকলকে ভিতরে দেখেছেন, আবার সকলে তাঁকে ভিতরে দেখছে বলে জানাতো। তাই তিনি পাত্র বাছাবাছি করতেন না। তাঁকে দর্শন করে তাঁর কাছে যারা আসত তিনি তার ভাবে সকলকে টেনে নিতেন। অন্যের ভাব অনুযায়ী তিনি কথা বলতেন না। তিনি জানতেন সত্য এক এবং তা সকলের জন্য।

সমষ্টিঃ- যাদের দর্শন অনুভূতি হয় ও যারা ঈশ্বরের কথা শুনতে চায়, তাদের সঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা চলে, তাদের সঙ্গে ঈশ্বরীয় অনুশীলন ফলপ্রসূ হয়, নতুন জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়।

৩. "চাষারা হাটে গরু কিনতে যায়। যে গরুর ল্যাজে হাত দিলে তিড়িং মিড়িং করে ওঠে সেই গরুকেই পছন্দ করে।"

চাষা— নির্গুণব্রহ্ম। হাট—জগৎ। কিনতে যায়—ঈশ্বর মানুষের মধ্যে অবতীর্ন হন। যে মানুষের মধ্যে অবতীর্ন হন তিনি সংস্কারবান পুরুষ এবং তার জীবন আর পাঁচজনের মতো হয় না, দৈবচালিত হয়, কেনা হয়ে যায়। যেমন—শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীজীবনকৃষ্ণ।

লেজে হাত দিলে তিড়িং মিড়িং করে ওঠে—সচ্চিদানন্দগুরু রূপে ঈশ্বর দেহমধ্যে প্রকাশ পেলে অর্থাৎ কৃপাকরস্পর্শ লাভ করলে মূলাধার থেকে প্রবল বেগে কুণ্ডলিনী জাগরণ হয়, দেহ আলোড়িত হয়। তাহলে, গরু—অবতার পুরুষ, যার মধ্যে ঈশ্বর অবতীর্ন হন। জমি—অবতারের দেহ। ফসল— তাঁর জীবনে জেগে ওঠা নতুন ধর্মীয় কৃষ্টি। ফসলের গোলা—অবতারের মুখ নিঃসৃত বাণীর সংকলন। যেমন, কথামৃত, ধর্ম ও অনুভূতি ইত্যাদি। ঠাকুর বলছেন, তুমি পূর্ণ আমি অংশ, তুমি প্রভু আমি দাস, আবার কখনো দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি। আবার বলছেন, তার অবতারকে দেখাও যা, তাকে দেখাও তা। এই অবস্থায় অবতার ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যান। তখন, চাষা—অবতার। হাট—মনুষ্যজগৎ। কিনতে যায়—কোন কোন সংস্কারবান পুরুষের মধ্যে তার চৈতন্য তাঁর চিন্ময় রূপে অবতীর্ন হয় ও তারা অবতারের ভাবে আবিষ্ট হন। তাদের নিয়ে অবতার পুরুষ গড়ে তোলেন, নতুন ধর্মীয় কৃষ্টি। ঐ মানুষগুলি যেন তাঁর বলদ।

শ্রীরামকৃষ্ণের **৩১জন** অন্তরঙ্গ পার্ষদ তথা বলদ ছিল, অর্থাৎ তাঁর **১৫**টি হালের চাষ ছিল—পনের আনা ব্যষ্টির সাধন। পরবর্তীকালে আর একজন চাষীকে পাওয়া গেল---শ্রীজীবনকৃষ্ণকে। তাঁর দেহে জাগল নতুন কৃষ্টি। শ্রীজীবনকৃষ্ণের চিন্ময়রূপ দর্শন করেছেন হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু নিত্য তার সঙ্গ করেছেন ৬৪/৬৫ জন। [তাঁর দেহ যাবার পর যে ছবি তোলা হয় **সঙ্গকারীদের**, তাতে ৬০ জনের ছবি আছে।] তাই বলা যায় তাঁর যেন ৩২টি হালের চাষ ছিল। অর্থাৎ ৩২ আনা সাধন, বৃহৎ ব্যষ্টি বা বিশ্বব্যাপিত্বের সাধন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীজীবনকৃষ্ণের জীবনে জেগে ওঠা কৃষ্টির প্রতিফলন তার অনুরাগীজনদের মধ্যে কিছুটা ঘটলেও তারা ঐ কৃষ্টির ধারক বাহক হয়ে ওঠেনি। তারা দুর্বল বলদ হয়ে ঝাড়াই মাড়াইয়ের কাজে সাহায্য করেছিল মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীজীবনকৃষ্ণের সাধন ব্যষ্টি ও বৃহৎ ব্যষ্টি তথা বিশ্বব্যাপিত্বের সাধন। বস্তুতত্ত্বে সমষ্টির সাধন যদি কারও হয়, তাহলে তার সাথে একত্ব লাভ কারী কিছু মানুষ ২য় স্তরের চাষী হয়ে আত্মিক একত্বের অনুভূতির মনন ও অনুচিন্তনে একত্বের কৃষ্টির ধারক বাহক হয়ে উঠবে। সেই শুভ সময়ের সূচনা হয়েছে বর্তমান বর্ষ ২০১৭ হতে। প্রথমে রামকৃষ্ণ-কৃষ্টি, পরে জীবনকৃষ্ণ-কৃষ্টি যা কিনা রামকৃষ্ণ-কৃষ্টির further development, আর এ যুগে একত্বের কৃষ্টি জেগে উঠছে—বহু সাধারণ মানুষ যার ধারক বাহক হয়ে তাকে বাস্তব রূপদান করবে।

৪. **"সংসারে থাকবে পাঁকাল মাছের মত।"**

ব্যষ্টির সাধনেঃ- দেহ আত্মা পৃথক হয়ে থাকা। দেহ—পাঁক। আত্মা— পাঁকাল মাছ। দেহের ভিতর আত্মা রয়েছে অথচ দেহাত্মবোধ জাগছে না—পাঁক লাগছে না। আত্মা দর্শন করে আমি দেহ নই, আমি আত্মা—এই বোধে থাকা। দেহ আত্মা কি পৃথক?— এই প্রশ্ন শোনামাত্র তার দেহ থেকে আত্মা পৃথক হবে, মাথা ডাইনে বাঁয়ে ঘট ঘট করে নড়বে। শুকনো সুপারী বা ঝুনো নারকেল নাড়ালে যেমন ঘটঘট শব্দ হয় তেমনি শব্দ হবে, শেষে সমাধি হয়ে যাবে।

ব্রহ্মবিদ্যার কথা শোনা মাত্র মুহুর্মুহু সহজিয়া সমাধি হয় তার। দেহ অতি পবিত্র থাকে, দেহজ্ঞান জাগে না তাই পাঁক লাগে না।

বিশ্বব্যাপিত্বেঃ- পাঁক— অসংখ্য মানুষের দেহ ও তাদের দেহজ্ঞানজনিত দোষক্রটি। পাঁকাল মাছ—বিশ্বমানব— যিনি চিন্ময় রূপ ধরে ফুটে ওঠেন জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের অন্তরে।

পাঁক লাগে না—বহুর অন্তরে বিকশিত তাঁর আত্মিক সত্তা তাদের বাহ্যজীবনের দোষক্রটিতে লিপ্ত হয় না। দ্রষ্টাদের ক্রটি তাঁর আত্মিক গতি ব্যাহত করে না।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ এক স্বপ্নে দেখলেন, গলা পর্যন্ত পাঁকে ডুবে আছেন। এক মহিলা একটি বড় পাকা পেঁপে ছাড়িয়ে তাঁর মুখের কাছে ধরছে আর উনি আনন্দ সহকারে খেয়ে যাচ্ছেন।...ঘুম ভাঙলে মনে হ'ল "কলঙ্ক সাগরে ডুবিবি কলঙ্ক না লাগিবে গায়"—এ সেই অবস্থা।

বিশ্বমানবকে অন্তরে দেখে তার পবিত্রতা (একের একত্ব) ও তার ঈশ্বরীয় চেতনা লাভ করে সাধারণ মানুষ। সংসার রূপ পাঁকে থাকলেও তারা তখন ২য় স্তরের পাঁকাল মাছের মত থাকতে পারে। সংসার ও সংসারে প্রচলিত নানা কুসংস্কার তাদের বিশেষ আঘাত করতে পারে না। তারা স্লিপ কেটে পালিয়ে বাঁচতে পারে যুগাবতার ও বিশ্বমানবের বাণীকে ঢাল করে। একটি উদাহরণ—ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলছেন, ঈশ্বর দর্শনের পর শ্রাদ্ধ তর্পনাদি থাকে না। আবার ঈশ্বর দর্শন প্রসঙ্গে বলেছেন, তার অবতারকে দেখাও যা তাকে দেখাও তা। আমি ঠাকুরকে স্বপ্নে দেখেছি তাই আমার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, আমারও শ্রাদ্ধ তর্পন করার প্রয়োজন নেই একথা বলে মিথ্যা সংস্কার এড়ানো যায়। তবে নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন চাই। ঠাকুর বলেছেন, কাজলের ঘরে থাকলে একটু কালি তো লাগবেই। তাই সবসময় ভয়ে ভয়ে (সাবধানে) থাকতে হয়। ভাবতে হয়, আমি যোগবিচ্যুত হয়ে যাচ্ছি না তো ?

সমষ্টির ধর্মে তথা একত্বেঃ- পাঁক— দেহজ্ঞান, সংসার ও সংসারে প্রচলিত নানা কু-সংস্কার। পাঁকাল মাছ—সমষ্টি চৈতন্যে পরিবর্তিত মানুষটির সাথে একত্ব লাভকারী মানুষজন।

পাঁক লাগে না— দেবত্ব স্থায়ী হয়, সংসার অনুকূল হয় এবং সংস্কারমুক্ত জীবন যাপন সম্ভব হয়। ঈশ্বরীয় অনুশীলনের জন্য চেষ্টা করতে হয় না, জগৎ অনুশীলন করিয়ে নেয়।

হরেন বাবু এক স্বপ্নে জীবনকৃষ্ণকে বলছেন, আমার ব্যষ্টির সাধন ? উনি বললেন, ঠাকুরকে জিজ্ঞেস কর। তারপর ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে তিনি হরেনবাবুকে নিয়ে গেলেন। ঠাকুরকে হরেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আমার ব্যষ্টির সাধন ? ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, পাঁকাল মাছের মতো থাকবি। (অমৃত জীবন; ডিসেম্বর ১৯৬০ সাল)।

স্বপ্নে শুনে জীবনকৃষ্ণ বললেন, ঠাকুরকে আমি চ্যালেঞ্জ করেছি। তোদের কারও আর ব্যষ্টির সাধন হবে না। তোদের হবে একত্ব।

এই একত্ব জীবনকৃষ্ণ যুগের উপহার মনুষ্যজাতিকে। এখানে একত্ব মানে পরম একের গুণ। যেমন সূর্য আর তার আলো, ব্রহ্ম আর তার ব্রহ্মত্বের কিরণ। একত্ব মানে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব।

এযুগে একত্ব মানে পরম একের সাথে এক হয়ে যাওয়া, একীভূত হওয়া। এই পর্বের একত্ব লাভ হলে সাধারণ মানুষের ব্রহ্মত্ব স্থায়ী হয়। সংসারে থেকেও সর্বসংস্কারমুক্তির পথে অনেকখানি অগ্রসর হওয়া—পাঁকাল মাছ হওয়া সম্ভব হয়। যার আভাস ফুটছে ২০১৭ সাল থেকে।

৫. "একজন একটা চিঠি পেয়েছিল কুটুম বাড়ি তত্ত্ব পাঠাতে হবে—কী কী জিনিস লেখা ছিল। জিনিস কিনতে দেবার সময় চিঠিখানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কর্তাটি তখন খুব ব্যস্ত হয়ে চিঠির খোঁজ আরম্ভ করলেন। অনেকক্ষণ ধরে অনেকজন মিলে খুঁজলে। শেষে চিঠিখানা পাওয়া গেল। তখন আর আনন্দের সীমা নাই। কর্তা ব্যস্ত হয়ে অতি যত্নে চিঠিখানা হাতে নিলেন আর দেখতে লাগলেন কী লেখা আছে। লেখা এই — পাঁচসের সন্দেশ পাঠাইবে ও একখানা কাপড় পাঠাইবে, আরও কত কী ! তখন আর চিঠির দরকার নাই। চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ, কাপড় ও অন্যান্য জিনিসের চেষ্টায় বেরোলেন।" —কথামৃত।

এযুগে গল্পটিকে আর একটু বাড়ানো যায়। কর্তা বাজারে গিয়ে সন্দেশ ও কাপড়ের সন্ধান পেলেন বটে কিন্তু তা কুটুম বাড়ীর জন্য কেনা হ'ল না। টাকার অভাব পড়ল। পরে তাঁর ছেলে বড় হলে সেও চিঠি খুঁজে পেল। তখন চিঠি ফেলে দিয়ে বৃদ্ধ বাবাকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে গেল। পরে ঐ কাপড় ও পাঁচসের সন্দেশ কিনে কুটুম বাড়িতে পাঠালো।

কিন্তু ঐ কাপড় না পরলে ঐ সন্দেশ খাওয়া যায় না। মানুষ এতদিন ঐ দামী কাপড় পরে নি। শুধু দেখে আনন্দ পেয়েছিল। কর্তার নাতি বড় হয়ে মানুষকে এই সত্য জানালো--মানুষকে কাপড়টি পড়তে শেখালো ও ঐ সন্দেশ খাওয়ালো।

শ্রীরামকৃষ্ণকে যে কুটুমবাড়িতে তত্ত্ব পাঠাতে হবে সে কথা জানা গিয়েছিল তার বাবার এক স্বপ্নে। গয়াধামে ক্ষুদিরাম বাবু স্বপ্নে দেখেছিলেন, ভগবান বিষ্ণু বলছেন, "আমি তোর ছেলে হয়ে জন্মাব।"

কি কি জিনিস সব লেখা ছিল—ভবিষ্যতে কী হবে তা আগে থাকতে ঠিক হয়েছিল। জিনিস কেনার আগে কর্তাটি চিঠি খোঁজা শুরু করল—১১ বছর বয়সে আনুড় গ্রাম যাবার পথে জ্যোতিদর্শন করে সমাধি হয়ে গেল। উনি বলছেন, তখন থেকে অন্য মানুষ হয়ে গেলাম, নিজের ভিতর আর একজনকে দেখতে পেতাম। নিজের ভিতর আত্মাকে খোঁজা শুরু হ'ল। অনেকক্ষণ ধরে অনেকজন মিলে খুঁজল—১২ বছর ধরে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ)এবং মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার নিয়ে চতুর্বিংশতিতত্ত্বের সহযোগিতায় দেহী দেহের মধ্যে আত্মাকে খুঁজল। শেষে

চিঠি পাওয়া গেল—আত্মা বা ভগবান দর্শন হ'ল ২২-২৩ বছর বয়সে। তখন আনন্দের সীমা নাই— ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। জৈবী আনন্দের সীমা আছে। কুটুমবাড়ীতে পাঠাতে হবে—বসুধৈব কুটুম্বকম অর্থাৎ মনুষ্যজাতিকে দিতে হবে। একটা কাপড় ও পাঁচসের সন্দেশ পাঠাইবে, আরও কত কী— একটি জৈবী দেহের চিন্ময়রূপ সবার দেহঘরে ফুটে উঠতে হবে এবং অফুরন্ত ঈশ্বরীয় দর্শন অনুভূতি লাভ করবে যা মানুষকে যোগের অনুকূল জীবন যাপনে দিশা দেখাবে, যোগযুক্ত থাকতে সাহায্য করবে। চিঠি ফেলে দিল—বেদান্তের সাধন শেষে নির্গুণে বোধাতীত অবস্থায় প্রাণচৈতন্য লয় হ'ল।

কাপড়, সন্দেশ ও অন্যান্য জিনিস কিনতে বাজারে যাওয়া হলেও তা কিনে কুটুম বাড়ীতে পাঠানো শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে হ'ল না, তাই তিনি বলছেন, তাকে কেউ চিনল না। বাউলের দল এল, নাচলে, গাইলে, চলে গেল, কেউ চিনল না।

পরবর্তীকালে কর্তার ছেলে নতুন করে চিঠিটা খুঁজল——শ্রীজীবনকৃষ্ণ ১২ বছর ৪ মাস বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দগুরু রূপে লাভ করলেন, সাধন শুরু হ'ল। চিঠি পাওয়া গেল——২৪ বছর ৮ মাসে ভগবান দর্শন হ'ল। চিঠিতে লেখা ছিল কী কী তত্ত্ব পাঠাতে হবে——আত্মা সাক্ষাৎকারে ইঙ্গিত পাওয়া যায়— "স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে" হতে হবে। তাঁর চিন্ময়রূপ বহুর অন্তরে ফুটে উঠে রাসলীলা হবে, জগৎ একরস আস্বাদন করবে। চিঠি ফেলে দিল—বেদান্ত সাধন শেষে নির্গুণে প্রাণচৈতন্য লয় হল, সগুণ আত্মা নির্গুণে লীন হ'ল। ছেলে বড় হওয়ায় বৃদ্ধ বাবাকে হাতে ধরে বাজারে নিয়ে গেল—অবতারতত্ত্বের সাধন শেষে শ্রীজীবনকৃষ্ণ রামকৃষ্ণময় হলেন ও নিজের অনুভূতির আলোকে ব্যষ্টির সাধনতত্ত্ব নিয়ে বই লিখে জগতের মানুষের কাছে রামকৃষ্ণের প্রকৃত আত্মিক পরিচয় তুলে ধরলেন। কাপড় ও সন্দেশ কিনে পাঠালেন— অবতারত্ব অতিক্রম করে আরও আত্মিক তেজ লাভ করে সর্বজনীন হলেন, তাঁর জৈবী দেহের চিন্ময়রূপ ফুটে উঠতে লাগল জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বহু মানুষের অন্তরে। তারা একটি কাপড় (চিন্ময় দেহ) পেল, সঙ্গে পাঁচসের সন্দেশ অর্থাৎ অফুরন্ত ঈশ্বরীয় লীলার সংবাদ তথা অনুভূতি।

কিন্তু ঐ বিশেষ কাপড় না পরলে ঐ সন্দেশ খাওয়া যায় না। কাপড় পরা মানে স্বপ্নদৃষ্ট শ্রীজীবনকৃষ্ণ আসলে আমারই চৈতন্যসত্তা ঐ রূপ ধারণ করেছে এটি উপলব্ধি। জীবনকৃষ্ণের তথা সর্বজনীন মানুষটির ব্রহ্মত্ব তখন দেহেতে বর্তায়। দেহ প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। মানুষ কাপড়টি নেড়েচেড়ে দেখলেও সেটি পরে সন্দেশ খাওয়া এতদিন হয় নি, অখণ্ড চৈতন্যের সাথে এক হয়ে নানাভাবে একত্বের রসমাধুর্য আস্বাদন করা হয় নি। জীবনকৃষ্ণের দেহ যাবার পর তার চৈতন্যের নবপর্যায়ের বিকাশে অর্থাৎ কর্তার নাতির ইচ্ছায় এই ২০১৭ থেকে সাধারণ মানুষও ঐ কাপড় পরে (নির্গুন ব্রহ্মরূপে জীবনকৃষ্ণকে দেখে) ঐ সন্দেশ আস্বাদন করতে শুরু করেছে। হোক তা কণা কণা আস্বাদন।

৬. এক চাষা খাল কেটে খানার সঙ্গে নদীকে যোগ করার চেষ্টা করল। প্রথমে তার মেয়ে পরে বৌ ডাকতে এলে কোদাল হাতে তাড়া করল। শেষে যখন কুলকুল করে

নিজের জমিতে জল ঢুকতে লাগল তখন বাড়ি গিয়ে নেয়ে খেয়ে ভুর ভুর করে তামাক খেতে লাগল।

এটি বিবিদিষাপন্থীদের মত। কৃচ্ছ্রসাধন করে দেহজমি চাষ করে ফসল ফলানো এবং মেয়ে ও বৌ অর্থাৎ বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়াকে পুরুষকার সহায়ে বিতাড়ন করা সম্ভব নয়।

গল্পটি হওয়া উচিত এই রকম যে এক চাষা দেখল নদীর সঙ্গে খানার যোগ সাধন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়—ভগবানের কৃপায় বৃষ্টি হয়ে যদি জমিতে জল আসে তবে চাষ সম্ভব। সত্যি সত্যিই বৃষ্টি হ'ল প্রচণ্ড—নদীতে হড়পা বান এল, নদীর জল খানা বেয়ে জমিতে এসে পড়ল।

এবার চাষা বীজ খুঁজতে বেরোল। নির্ভর যোগ্য বীজ পাওয়া গেল না। শুধু বিজ্ঞাপনের চাকচিক্য ও ঢক্কানিনাদ। পরে নিজের জমিতে বসে থেকে হঠাৎ আবিষ্কার করল একটা আমের চারা বেরিয়েছে। বুঝল, জমিতেই ছিল বীজ। যাইহোক নাওয়া খাওয়া ভুলে সে জমিতেই বসে থাকে আর ঐ আম গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে। বৌ ও মেয়ে ডেকে সাড়া না পেয়ে ফিরে গেল। গাছটা বড় হ'ল, আম ধরল। আম পাকলো। নিজে খেয়ে দেখল অপূর্ব আস্বাদন। পথচারীদের ডেকেও দু'চার জনকে সেই আম খাওয়াতে লাগলো। ক্রমে চাষীর বয়স হয়ে গেল। এক সময় দেহ চলে গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণের পরবর্তী যুগে শ্রীজীবনকৃষ্ণের লীলা ধরে গল্পটি বাড়ালে নিম্নরূপ হবে।

এরপর চাষীর ছেলে এসে বসে থাকে পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত তার বড় মাপের জমিতে। নিজেও জমির পরিমাণ বাড়ালো। সেও সেখানে একই কাণ্ড প্রত্যক্ষ করল। নিয়মিত বৃষ্টিপাত হতে লাগলো। সেখানে নতুন একটা আমগাছ হল। তাতে আম ধরল, আগের চেয়ে বড় আকারের। সেই আম নিজে খেল আর পথচারীদের অনেককে একটু একটু খাওয়ালো। কিছুকাল পরে দেখল, ঐ জমিতে নতুন একটি গাছ হয়েছে। জানা গেল এটি বহুবীজী ফল পেঁপে।

চাষা পাকা পেঁপের আস্বাদন করে অবাক হ'ল। আর যেসব পথচারীদের একটু একটু খাওয়ালো তারা বলল ভিতরের বীজগুলো যেন তারই (চাষীর) মুখের আকৃতির ন্যায়। এদিকে আম গাছটা ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেল। তবে চাষী ঐ আমের প্রচুর আমসত্ত্ব করে রেখে দিল ভবিষ্যতে অন্যদের খাওয়ার জন্য।

এরপর চাষীর ছেলেরও বয়স হল ও একসময় দেহ চলে গেল। এবার চাষীর নাতি এসে বসে থাকে সেই বিশাল জমিতে। দেখে পেঁপে গাছটার একটা নতুন চারা বেরিয়েছে। এবার আরও বৃষ্টি হতে লাগল। মাটি বসে গিয়ে অনেক খাল হয়ে গেল। এবার মাটির নীচ থেকে ফোয়ারা বেরিয়ে পড়ল। প্রচুর জল জমে গেল। ক্রমে আশে পাশের ছোট ছোট জমিতেও সেই জল ঢুকে গিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন করে দিল। লোকেরা নিজেদের ছোট

ছোট জমি আর আলাদা করে চিনতে পারে না। কিন্তু চাষীর নাতি তাঁর জমিটা চিনতে পারে নতুন পেঁপে গাছটা দেখে। নাতি কিছু পেঁপের ক্যান্ডি বানিয়ে রেখে দিল। পরে সেই পেঁপে গাছটাও একটু একটু করে জলে ডুবে যেতে লাগল।

তখন আশেপাশের উঁচু নীচু সব জমি ধীরে ধীরে ডুবে গিয়ে এক হয়ে গেল। লোকেরা নিজের জমি খুঁজতে এসে অবাক হয়, জমির জল খেয়ে দেখে অদ্ভুত মিষ্টি আর প্রাণশক্তি বর্ধক (Elixir)। চাষীর নাতি তার জমির জলে সাঁতার কাটলে সব জমির জলে ঢেউ ওঠে, সেই সময় বাকী ক্ষুদ্র চাষীরাও চান করে আনন্দ পায়।

গল্পটির যোগাঙ্গঃ গল্পটির প্রথম অংশে কৃপাবৃষ্টি হওয়ায় আপনা হতে বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়ার বাধা অতিক্রম ও দেহস্থ ব্রহ্মবীজের বিকাশে ব্যষ্টির সাধন কথা বিবৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপে পেঁপে অর্থাৎ বিশ্বব্যাপিত্বের সাধন, বহুজনের মধ্যে চিন্ময়রূপে ফুটে ওঠা ও তৃতীয় ধাপে সমষ্টির সাধন বা একত্বের কৃষ্টি জেগে ওঠার কথা রূপকে বলা হয়েছে।

৭. যতই বেদান্ত বিচার কর, জগৎ স্বপ্নবৎ বল। ঠিক ভক্তের ভক্তি যাবার নয়। মুষলম্ কুলনাশনম্।

বেদান্ত সাধনের একটি পর্যায়ে জড়সমাধি হয়। একটি বিন্দুতে চেতনা থাকে, বাকী দেহে চেতনা থাকে না। সাধকের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু স্থিত সমাধি না হলে পরে আবার ভক্তি ক্রমে বেড়ে উঠতে থাকে। আমি অমৃতের পুত্র, আমি ব্রহ্ম অর্থাৎ যদুবংশের লোক, সাধক একথা ভুলে যায়। ঐ সত্তা লোপ পায়।

এক জায়গায় কিছু যদুবংশীয় যুবক আড্ডা দিচ্ছিল। পাশের রাস্তা ধরে যাচ্ছিলেন দুর্বাসা মুনি। যুবকদের মাথায় দুষ্টবুদ্ধি জাগল। তখন কৃষ্ণপুত্র শাম্ব পেটে মুষল বেঁধে গর্ভবতী নারী সাজেন। তার বন্ধু দুর্বাসা মুনিকে নিয়ে রসিকতা করার উদ্দেশ্যে মুনিকে জিজ্ঞাসা করেন ঐ নারীর পুত্র সন্তান হবে না কন্যা সন্তান হবে। মুনি সব বুঝে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন ঐ মুষলই তোদের ধ্বংসের কারণ হবে। পরে ঋষি শান্ত হলে তাঁর কথা মতো ঐ মুষল ঘষে ঘষে ক্ষয় করে তা জলে ফেলে দেওয়া হলো- কিন্তু এককণা থেকে গিয়েছিল। তা থেকে নল খাগ্ড়ার সৃষ্টি হলো। একদিন যাদবরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করে। ঐ নল খাগড়া তখন মুষলে পরিবর্তিত হয় এবং তাই দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করে ও সকলেই মৃত্যু বরণ করে।

ঠাকুরের জড়সমাধি হয়ে "সোহং" ভাব জেগেছিল। কিন্তু পরে তিনি তত্ত্বজ্ঞানে নেমে এলেন ও "দাসোহং" ভাব নিয়ে ছিলেন। ভক্তিভক্ত নিয়ে ছিলেন। তিনি বলছেন, আমি চিনি খেতে ভালোবাসি, চিনি হতে ভালোবাসি না।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বেদান্ত সাধনকালে বুঝলেন, আমি দেহ নই, আমি আত্মা বা ব্রহ্ম। পরে স্থিত সমাধি হ'ল। মুষলের অর্থাৎ দেহবোধের এক কণাও থাকল না। সবটা গুলে গেল--বোধাতীত অবস্থা। ফলে পরে তত্ত্বজ্ঞানে নেমে এলেও, অবতারতত্ত্ব ও রসতত্ত্বের সাধনের

পর আবার "অহমস্মি" বোধ জেগে উঠল। জগতের সংখ্যাতীত নরনারী তাকে ভিতরে দেখে তার ঈশ্বরত্ব লাভের প্রমান দিল। তিনি হলেন যদুকুলমনি। আর তাঁকে অন্তরে দেখে তার সাথে একত্ব লাভ করে বহু মানুষ নিজেদের "অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলে অনুভব করল, জগতে যদুবংশ নতুন করে দেখা গেল।

দুর্বাসা মুনিকে ঠাট্টা করায় তার অভিশাপে যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল। বৈদিক কৃষ্টির ঈশ্বরীয় ভাবনাকে অগ্রাহ্য করে পুরাণের ধর্ম গ্রহণ করায় ভারতে ধর্মজগতের অধঃপতন ঘটেছিল। এতদিনে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বৈদিক কৃষ্টির পুনরুত্থান হল। এ যেন অভিশাপ মুক্তি ঘটল।

৮. পূর্বজন্মের পাপের ফলে একজন কানা হয়েছিল। গঙ্গাচান করায় তার সব পাপ ধুয়ে গেল কিন্তু কানাচোখ আর ঘুচল না।

ব্যষ্টির ব্যাখ্যাঃ- জ্ঞানগঙ্গায় চান করলে অর্থাৎ অনুভূতিমূলক ধর্মের কথা শুনলে মানুষ পবিত্র হয়। দেহমন শুদ্ধ হয়। অবতার প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু ঠাকুর লক্ষ্য করছেন ভক্তদের অন্তরে তার অবতারত্বের প্রমাণ ফুটছে না, কোন দর্শন হচ্ছে না। অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষু ফুটছে না। তারা শুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁকে অবতার বলে অনুমান করছে মাত্র। দু-একজনের যদিওবা কিছু দর্শন হচ্ছে, পূর্বপুরুষাগত সংস্কার বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় দর্শনের সঠিক অর্থ ধরতে পারছে না।

সমষ্টির ব্যাখ্যাঃ- নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পাঠে গিয়ে ঈশ্বরীয় কথার দেহতত্ত্বে ব্যাখ্যা শুনলে ও বহু মানুষের দর্শন অনুভূতি শুনলে নিজেরও দর্শন অনুভূতি হয়, কিছু কিছু দর্শনের ব্যাখ্যাও বুঝতে পারে। কিন্তু জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনে একজন মানুষের রূপে সমষ্টি চৈতন্যের প্রকাশকে প্রত্যক্ষ করলেও বোধে বোধ করা যায় না। এ যেন, ডাক্তারবাবু ছানি অপারেশন করে দিলেন কিন্তু চশমা না দেওয়ায় স্পষ্ট করে সব দেখা যাচ্ছে না। একমাত্র সমষ্টি চৈতন্যের সাথে একত্ব লাভ হলে কয়েক পুরুষের সংস্কার কেটে যায়। কানাচোখ ঘুচে যায়, তূরীয় অবস্থার অনুভূতিতে সবার মধ্যে সেই এক-কে দর্শন ও বোধে বোধ হয়।

৯. ছেলে কোনমতে শুনছে না দেখে মা কড়াৎ কড়াৎ শব্দ করে বাক্স খুলে এক পয়সা ফেলে দেয়।

ব্যষ্টিঃ- মা—আদ্যাশক্তি। কড়াৎ কড়াৎ শব্দ— ষষ্ঠভূমির নাদ। বাক্স খোলা ও ১ পয়সা পাওয়া—সপ্তম ভূমিতে মন গিয়ে আত্মিক ঐশ্বর্য্যলাভ ও ব্রহ্মজ্ঞান তথা একজ্ঞান লাভ।

সমষ্টিঃ- মা—জগত, নির্গুণ। কড়াৎ কড়াৎ শব্দ—অন্যের দর্শন অনুভূতি শোনা—নাদ শোনা। বাক্স খোলা—ব্রেনসেল ক্রিয়াশীল হওয়া ও সংস্কারের আবরণ ভাঙা। ১ পয়সা ফেলে দিল-—একত্ব লাভের জন্য প্রয়োজনীয় আত্মিক শক্তি দিল।

১০. তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারলেই হ'ল।

ব্যষ্টির সাধনের ক্ষেত্রে ইষ্টমূর্তি দর্শন ও পরে আত্মসাক্ষাৎকার- তারপর আরও অনেক দর্শন।

বিশ্বব্যাপিত্বের ক্ষেত্রে —আত্মা বা ভগবান দর্শন করে ভগবান হয়ে যাওয়া, অন্য বহুমানুষ তাঁর চিন্ময় রূপ অন্তরে প্রত্যক্ষ করে ঘোষণা করে যে উনি ভগবান হয়ে গেছেন।

সমষ্টির সাধনের ক্ষেত্রে সর্বজনীন মানবকে প্রত্যক্ষ করলেই তাঁকে পাওয়া হয় না, জানা হয় না। তার ঈশ্বরত্ব লাভের প্রমাণ পাওয়া হয়। কিন্তু তার সাথে একত্ব লাভ হলে, তার কোলে বসতে পেলে তিনি নিজেই তার পরিচয় দান করেন, দ্রষ্টা যে একত্বলাভ করেছেন ঐ মানব ব্রহ্মের সাথে তথা নির্গুনের সাথে তারও প্রমাণ ফোটে অন্যের মধ্যে। তখন হয় ব্যক্ত লীলা।

এই প্রসঙ্গে বরুণ ব্যানার্জীর স্বপ্নটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি দেখছেন, স্কুলবাগানে নিত্যদার ঘরে আলো জলছে, নিত্যদাও রয়েছে। পিঠটা দেখা যাচ্ছে। নিত্যদা তো মারা গেছেন, তবে কি ভুত ? পরক্ষণে ভাবলেন, ভয় কী, জীবনকৃষ্ণকে পেয়েছি তো। "জয় জীবনকৃষ্ণ" বলে চিৎকার করলেন। তারপর নিত্যদাকে ডাকলেন। উনি উঠে দরজার দিকে আসছেন। দরজা খুলে দেবেন। ......দ্রষ্টার ঘুম ভাঙল।

এতদিন জীবনকৃষ্ণকে দেখে নিত্যের আলো দেখেছি, তাই বিভ্রান্ত হইনি। কিন্তু এবার নিত্য ক্রিয়াশীল হচ্ছেন—একত্ব দান করবেন, হাত ধরে তার ঘরে অর্থাৎ নির্গুণের ঘরে ঢুকিয়ে নেবেন।

১১. "অনুলোম আর বিলোম"—শ্রীরামকৃষ্ণ।

ব্যষ্টিঃ- ১ শ্রীরামকৃষ্ণেঃ- অনুলোম—জড়সমাধি লাভ। অনু মানে বিন্দুবৎ। বিলোম—মানুষরতন দর্শন।

২. জীবনকৃষ্ণেঃ- অনুলোম—স্থিত সমাধি। এখানে অনু মানে শূন্য। বিলোম—ষোলআনা মানুষরতন দর্শন। তিনিই যে অবতার তা জানিয়ে দেন। এক স্বপ্নে দেখছেন, তার জামায় হাত দিয়ে অন্য অবতাররা বলছে এমন জামা আর হয় না।

বিশ্বব্যাপিত্বঃ- অনুলোম—বহুমানুষের অন্তরে নিজের চিন্ময় রূপ ধরে প্রকাশ। এ যেন নিজেকে কণা কণা রূপে ছড়িয়ে দেওয়া। বিলোম— সাধক সকলকে নিজের ভিতর দেখেন। তিনি নিজেকে অখণ্ডচৈতন্য বলে উপলব্ধি করেন।

সমষ্টিঃ- অনুলোম—সাধকের প্রানচৈতন্য সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত হওয়া, তাদের অজ্ঞাতসারে তাদেরকে নিজের সত্তা দান। দ্রষ্টারা তাঁর অনু পরিমান চৈতন্যসত্তা লাভ করে। বিশ্বব্যাপিত্বে যেন এক বালতি জলে একটা নীলবড়ি পড়ল, কনা কনা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল জলে কিন্তু পুরো

গলল না। এখানে গুলে গিয়ে জলটা নীল হয়ে গেল। তাই ইলামবাজারের নন্দদুলাল বর এক স্বপ্নে দেখলেন, অনু বসুধায় নতুন ঘর করে চলে গেছে। বিলোম—সকলকে নিজের সাথে একীভূত করে নিয়ে আত্মিকে তাঁর মাথায় উদ্ভূত চিন্তা দ্বারা মনুষ্য জাতিকে নিয়ন্ত্রণ।

১২.অভিমন্যু চক্রব্যূহে ঢুকতে জানত কিন্তু বের হতে হয় কিভাবে তা জানত না। এর প্রকৃত অর্থ কি?

সুভদ্রা ও অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু। সুভদ্রা রোহিনীর গর্ভজাত। রোহিনীর অপর সন্তান হ'ল বলরাম। দেবকীর পুত্র কৃষ্ণ আর্যকৃষ্টিবাহী, তাই কারাগারে অর্থাৎ দেহেতে আত্মার জন্ম ও সমষ্টিতে, ব্যক্তির জীবন নদীর ওপারে তার বিকাশের কথা বলা হয়েছে। বলরাম ও সুভদ্রা অনার্য কৃষ্টির প্রতিনিধি। বলরাম বিচারাত্মক অবতার। অবতার প্রত্যক্ষ সিদ্ধ—বলরাম সেই অবতার নয়। দেহের ভিতর চৈতন্যের অবতরণ দেখে নাই। তার কাঁধে লাঙ্গল অর্থাৎ যারা চাষবাস জানত ও ভগবান লাভের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করত সেই অনার্য কৃষ্টিক ধারক। সুভদ্রাও তাই।

এই সুভদ্রাকে অর্জুন যখন চক্রব্যূহে ঢোকার পদ্ধতি বর্ণনা করে শোনাচ্ছিল তখন তার গর্ভস্থ পুত্র অভিমন্যুও তা শুনেছিল ও শিখে ফেলেছিল। কিন্তু চক্রব্যূহ থেকে বেরোবার কথা যখন অর্জুন বললেন তখন সুভদ্রা ঘুমিয়ে যাওয়ায় গর্ভস্থ শিশুও ঘুমিয়ে পড়ে। ফলে সেই বিদ্যা শেখা হয়নি।

এর আসল অর্থ কুসংস্কারের চক্রে ঢুকে সেগুলির দেহতত্ত্বে অর্থ শুনে সুভদ্রা অর্জুনের পাণ্ডিত্যের তারিফ করল। কিন্তু অর্জুন বলল এই সব বৈধীধর্ম প্রতীকি, এগুলির প্রতীকার্থ ভেঙে মূল বক্তব্য বুঝে আচরণগুলি বর্জন করতে হয়। মূর্তিপূজা, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ত্যাগ করতে হবে। সুভদ্রা তাতে সেভাবে সাড়া দিল না, response করল না, ঘুমিয়ে গেল। অর্থাৎ যেন বলতে চাইল, সবই তো শুনলাম, ব্যাখ্যা বেশ ভাল কিন্তু এতকালের অভ্যাস, শিবের মাথায় জল ঢালা, কি শ্রাদ্ধ করা ইত্যাদি বর্জন করতে পারব না। এর effect হ'ল, ঐ কুসংস্কার অভিমন্যুর মধ্যেও থেকে গেল। তাই সে চক্রব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারল না। নানা কুসংস্কারের বেড়াজালে আটকে পড়ল—তার মধ্যে চেতনার অপমৃত্যু হ'ল।

দ্রৌপদীর গর্ভজাত অর্জুনের ছেলে আর্যকৃষ্টির ধারক। কিন্তু অশ্বত্থামা অনার্য দেবতা শিবের কাছে খড়্গ পেয়ে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকেই বধ করে আর্য কৃষ্টির প্রবাহকে থামিয়ে দিল। ভারতবর্ষে অনার্যকৃষ্টির নিরঙ্কুশ আধিপত্য লাভের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে কাহিনীর এই অংশে।

স্মৃতিচারণ

শ্রীজীবনকৃষ্ণের পুতঃসঙ্গ লাভে ধন্য কিছু মানুষের টুকরো কিছু স্মৃতিকথা এখানে তুলে ধরা হলো।

অনাথনাথ মণ্ডল

ক) ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাস, জীবনকৃষ্ণ ক্যানসার অপারেশনের পর কিছু দিন হলো ব্যাতাইতলার বাড়ীতে এসেছেন। দেহ যাবার একমাস আগে এক দুপুরের অভিজ্ঞতা। সেই সময়েও তাঁর যে রসবোধের পরিচয় পেয়েছি তা কখনো ভোলার নয়।

দুপুর একটার সময় ওঁর ঘরে এসে দেখলুম, উনি চেয়ারে বসে আছেন। ভাস্কর নামে ওনার একজন অ্যাটেন্ড্যান্ট দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলো। আমি ওঁর ঘরে ঢুকতেই উনি আমাকে ভাস্করের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন—'এ্যাটেন্ড্যান্ট'! ভাস্কর তখন ঘরের মেঝেতে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। তারপর বললেন—'তুই যখন এসেছিস, তুই চেয়ারটাতে বোস, আমি একটু শুই'। আমি চেয়ারটা টেনে নিয়ে খাটের কাছে বসলুম। উনি বললেন, —'বড্ড মাছির উৎপাত। তুই আমার পায়ের দিকটায় বোস। বুকের দিকটা আমার, পায়ের দিকটা তোর'। তারপর আমি ওর বিছানায় বসলে পর কেমন বিষ্ঠার গন্ধ নাকে আসতে লাগলো। কিন্তু আমি যেই মাছি তাড়াতে লাগলুম, দেখি আর কোনো গন্ধ নেই। কি অদ্ভুত ! তার পরক্ষনেই অনুভব করলুম যেন এক মিষ্টি সুগন্ধ বয়ে যাচ্ছে আমার নাকের কাছ দিয়ে। এই সময় ওঁর দিকে চোখ পরতে দেখি উনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। উনি যতবারই হাত দিয়ে মাছি তাড়াতে যান ততবারই মাছি পালিয়ে যাচ্ছে। তখন উনি বললেন—'দ্যাখ, মাছি গুলো বড্ড চালাক, কিছুতেই একটাকেও মারতে পারছি না। মশা কিন্তু বোকা, গায়ে বসলে মারতে পারা যায়।' প্রতিটি কথায় হাস্যরস যেন ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছিল।

(খ) ১১ই অক্টোবর, ১৯৬৭, দুর্গানবমীর দিন। সকাল প্রায় সাড়ে ছ'টা নাগাদ জীবনকৃষ্ণের ঘরে গিয়ে দেখলুম, তিনি খাটে বসে চা পান করছেন। সুশীল বাবু কিছু দিন ধরে অসুস্থ। জীবনকৃষ্ণ নিজে অসুস্থ হলেও সুশীল বাবুর জন্য বিশেষ ভাবে চিন্তিত। মাঝে মাঝেই তার জন্য খবর নেন। ঐ দিন আমি তাঁর কাছে যাওয়ার ঘন্টাখানেক পরেই আমাকে সুশীল বাবুর বাড়ীতে ফোন করে কেমন আছে জানতে বললেন। এই অবস্থাতেও আমাদের বিষয়ে তিনি কত সজাগ আর কি গভীর ভালবাসা একথা ভাবতে ভাবতেই বাইরে গেলাম ফোন করতে। ফোনে যা শুনলাম সে কথা ওনাকে জানানোর মত নয়। সুশীল বাবুকে ফোনে পাওয়া গেল না। ওনার বাড়ীর একটি মেয়ে ফোনটা ধরল। সে জানালো যে সুশীল বাবু আজ সম্পূর্ন সুস্থ। কিন্তু খুব ব্যস্ত। সকাল সকাল স্নান করে দুর্গা দালানে গেছেন ছাগ বলি দেবার জন্য, কারণ প্রতি বছর উনিই বলি দেন। খুব অবাক লাগল কথাটা শুনে। যাইহোক, ফিরে এসে আমি বিষয়টা জীবনকৃষ্ণকে জানালাম। উনি চুপচাপ আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, কোনো মন্তব্য করলেন না।

গ) শ্রীকান্তবাবু পায়ের বাতের জন্য বেশ কিছু দিন ধরে ভুগছেন. একথা শুনে জীবনকৃষ্ণ এক মজার গল্প শুনিয়েছিলেন। গল্পটা এই রকম—এক ভদ্রলোকের সাথে যমরাজের খুব বন্ধুত্ব হয়। লোকটির স্বর্গরাজ্য দেখবার ভারি ইচ্ছা। একথা যমরাজকে বলায় তিনি বললেন, আচ্ছা দেখাব। লোকটি তখন বলল—ভাই আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবার আগে তিনটি চিঠি দিও। যমরাজ বললেন—তাই হবে। কিছু দিন পর লোকটা কানে কম শুনতে লাগলো, তার মাস দুয়েক পরে চোখে কম দেখতে লাগলো, আরও মাস দুয়েক পর সে খুব অথর্ব হয়ে পড়ল। তার কিছুদিন পরেই তার মৃত্যু হল। মরার পর স্বর্গে গিয়ে যমের সাথে দেখা। তখন সে যমকে জিজ্ঞাসা করছে, কই ভাই আমাকে এখানে আনবার আগে চিঠি দিলে না ? যমরাজ বললেন- কেন, আমি তো তোমার কথামত তিনটে চিঠি দিয়েছি। যেমন কানে কম শোনা, চোখে কম দেখা আর অথর্ব হয়ে যাওয়া। শ্রীকান্ত বাবু, ওসব কিছু নয়; চিঠি আসছে। তাঁর কথা শুনে ঘরের সকলে হো হো করে হেসে উঠলো। শ্রীকান্তবাবু নিজেও হাসতে লাগলেন।

বঙ্কিম চক্রবর্তী

১৯৫৪ সালের এক রবিবার। বিকালে জীবনকৃষ্ণের ঘরে বসে আছি। কেষ্টদা ঘরে প্রবেশ করলে তিনি কেষ্টদার জীবনের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা আমাদের শোনালেন। ‘সবই তো ভগবানের হাত।’ কেষ্টদা হরিদ্বার যাবার প্ল্যান করেছেন। হরিদ্বার এক্সপ্রেসের রিজার্ভেশন টিকিট কাটা আছে। সব তোড়জোড় চলছে। ওমা, বিকালে কালী ব্যানার্জী লেনের ঘরে এসে হাজির। ভাবলাম যাবার আগে বিদায় নিতে এসেছে। তারপর সন্ধ্যা হয়ে গেল, ওঠবার নামটি নাই। বললুম, কি গো কেষ্টদা, হরিদ্বার যাবে না ? কেষ্টদা বলল, আজ্ঞে না, এই তো হরিদ্বার, বৃন্দাবন। আমি তো শুনে অবাক। মত বদলের কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। কেষ্টদা বলল, “খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করছি, বেডিং টেডিং সব ঠিকঠাক। আপনি সবই তো জানেন। তক্তপোষে পা ঝুলিয়ে বসে আছি। খানিকটা এই ভাবে বসে থেকে তারপর শোব, দেখছি—একটা পিঁড়ির উপর দুটো পা রেখে, দুটো হাতে দুটো শেকল ধরে দাঁড়ানো অবস্থায় ‘সম্ভবামি যুগে যুগে’ বলতে বলতে একেবারে মুখের কাছে এসে হাজির স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপী আপনি।” বলতে বলতে তার গলা ধরে এল, চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।” জীবনকৃষ্ণের মুখে একথা শুনতে শুনতে আমরা সকলে নির্বাক হয়ে ভাবছিলাম এ কোন মহাপুরুষের কাছে আমরা বসে আছি।

বিমলাকান্ত ঘোষ

(ক) রামানুজের কথা প্রসঙ্গে জীবনকৃষ্ণ আমাদের এক অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়েছিলেন যা আজও খুব স্পষ্ট মনে আছে। মনে পড়লেই বৈধী ধর্মের এক কদর্য রূপ চোখের সামনে ভাসতে থাকে। সেদিন জীবনকৃষ্ণ যা বলেছিলেন তা ছিলো এইরূপঃ শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের পাশে তিন চারটে কবর আছে। তার মধ্যে একটি একজন আলভারের। এই আলভার

একদিন শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের বাইরে কাবেরী নদীর ধারে শ্রীরঙ্গমের ধ্যানে মগ্ন। আলভারদের মন্দিরে ঢোকার নিয়ম নেই, তাই সে বাইরেই ধ্যান করছিলো। ঐ সময় মন্দিরের পূজারী শ্রীরঙ্গমের পুজোর জন্য নদী থেকে জল নিতে গিয়ে দেখে যে আলভারের ছায়া নদীতে পড়েছে। অতএব নদীর জল তো ঠাকুর পুজোর জন্য নেওয়া চলে না যতক্ষণ ছায়া রয়েছে। তখন তাকে সেখান থেকে সরাবার জন্য ডাকাডাকি করতে লাগলো। তাতে সাড়া না পেয়ে একটা পাথর ছুঁড়ে তাকে মারল। পাথরের আঘাতে আলভারের মাথা দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো। ধ্যান ভাঙতেই সে বুঝতে পারল কী ঘটেছে। কিছু না বলে সে সেখান থেকে চলে গেল। পূজারী তো পুজোর জন্য জল নিয়ে চলে গেল। সেই রাতেই পূজারী স্বপ্নে দেখল–- শ্রীরঙ্গম এসে তাকে ভর্ৎসনা করে বলছেন, ‘তোরা কি? আমার একজন পরম ভক্তকে এরকম ভাবে আঘাত করলি ! তোরা আমাকে যে রকম ভাবে ঢাক ঢোল বাজিয়ে রোজ নদীতে নিয়ে যাস আবার নিয়ে আসিস, সেই রকম করে এখনি ঐ আলভারকে অভ্যর্থনা করে এই মন্দিরে নিয়ে আয়, তা না হলে বৈষ্ণব অপরাধে অপরাধী হয়ে যাবি।’ তখন সেই পুরোহিত পরদিন সেই আলভারকে খুঁজে একই রকম জাঁকজমকের সঙ্গে মন্দিরে নিয়ে এল। সেই থেকে আলভার ঐ মন্দিরে বাস করতে লাগল। দেহ যাবার পর তার কবর মন্দিরের পাশেই দেওয়া হয়। কাহিনীটিতে বৈধী ধর্মের কদর্যতার সাথে সাথে ভক্তের মহিমাও জানা গিয়েছিল।

(খ) জীবনকৃষ্ণ একদিন তুলসীদাস প্রসঙ্গে তাঁর সন্ন্যাসের বারো বছর পর দেশে ফেরার কথা বললেন। তুলসীদাস তাঁর পূর্ব সংস্কার মত ভুল করে ঠিক তাঁর শ্বশুর বাড়ীতেই বিশ্রামের জন্য অতিথি হলেন। তাঁকে খাবার জিনিসের প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করা হল। তখন তিনি বললেন, “আমার ঝোলার মধ্যেই সব আছে। আমি এখনই নিজে রান্না করে খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে চলে যাবো।” আর কেউ চিনতে না পারলেও তুলসীদাসের স্ত্রী তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। তিনি তো ঐ সব শুনে তুলসীদাসের কাছে গিয়ে বললেন, ‘ঠাকুর তোমার ঐ ঝুলির মধ্যে সবই আছে বুঝতে পারছি, শুধু একজন বানানোর লোকের অভাব। তা এক কাজ করুন ঠাকুর, আমাকে ঐ ঝুলির মধ্যে নেন না, তাহলে আর কোনো অভাবই থাকবে না’। এই কথা শোনামাত্র তুলসী দাসের চৈতন্যোদয় হল। বুঝতে পারলেন যে এ তো তাঁর শ্বশুর বাড়ী। আর সেখানে থাকেন ? কাহিনীটি শেষ করে তিনিও হাসতে লাগলেন আর আমরাও তাঁর সাথে যোগ দিলাম। ঘরে অদ্ভুত এক হাস্যরসের পরিবেশ সৃষ্টি হলো।

নিতাই পাত্র

ব্যবহারিক জীবনের ছোটখাটো অনৈতিক কাজকে আমরা তেমন গুরুত্ব দিই না। বিশেষ করে সে কাজটির পিছনে যদি অন্য কোনো মহৎ উদ্দেশ্য থাকে তাহলে তো আর কথাই নেই। কিন্তু জীবনকৃষ্ণ এসব ব্যাপারে কিরূপ সজাগ ছিলেন একদিনের ঘটনার কথা বললেই বোঝা যাবে। সেদিন অসীমের জাঠতুতো ভাই এসেছিলো কদমতলায়, জীবনকৃষ্ণের

ঘরে। সে স্বপ্নে দেখেছে যে সে ঘুমিয়ে আছে আর জীবনকৃষ্ণ ডেকে তার ঘুম ভাঙাচ্ছেন। জীবনকৃষ্ণ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বললেন—একেই বলে হরির যোগনিদ্রা ভঙ্গ। অসীমের দাদা কাছেই বসেছিল। সে ভাইয়ের ব্যাকুলতার কথা জানাতে গিয়ে বলল, ভাই এখানে আসার জন্য সকাল থেকেই একজনের মান্থলি টিকিট নিয়ে রেখেছিল; তাই নিয়ে এখানে চলে এসেছে। জীবনকৃষ্ণ শুনে ভীষণ বিরক্ত হলেন। বললেন—"কারোর টিকিট নিয়ে আসিসনি। ওতে জোচ্চুরি করা হয়। না এলি, তাও ভালো।" কথা টা শুনতে শুনতে ভাবতে লাগলাম যিনি রূপ ধারণ করে ভিতর থেকে জাগরণের ডাক দিয়ে ঘুম ভাঙাতে পারেন, বাইরে সজাগ হওয়ার ডাক তো তিনি দেবেনই।

অমরনাথ বসু

জ্যাঠামশাই 'কুড়িয়ে পাওয়া মানিক' নামে 'ধর্ম ও অনুভূতি' বই লিখে প্রকাশ করলেন। সেদিন কেন জানিনা আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। মা বললেন—'তোর জ্যাঠার বই বেরিয়েছে, দ্যাখরে'! একটু থেমে আবার মা বললেন—'তোর জ্যাঠা এক সময় অনেক লিখতেন, একবার লেখার ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের সাথে দেখাও করেছিলেন, তাছাড়া তোর জ্যাঠার লেখা নাটক 'যুগধর্ম' একবার রেডিওতে অভিনয় হয়েছিল। তখন আমরা হালদার পাড়া লেনের বাসায় থাকি, তুই তখনো জন্মাসনি'। আমি অবাক হয়ে মা'র কথা শুনি। পরে জানলুম 'ধর্ম ও অনুভূতি' খুব ভালো ধর্মের বই হয়েছে। পরে বইটির আরও দু'খণ্ড প্রকাশ হ'ল।

পাঠ পরিক্রমা - ১

১লা জুন, ২০২০, সখেরবাজার (মোবাইল কনফারেন্স)

পাঠকঃ হাতে লেখা মানিক পত্রিকার ৭৩ সংখ্যা থেকে ভূমিকাটা পড়ছি।

জীবনকৃষ্ণ বলছেন, কেউ একটা কথা বললেই আমি তার নাড়ি-নক্ষত্র সব বুঝতে পারি। I read a man through his brain অর্থাৎ মানুষটার প্রকৃতি তিনি বুঝতে পারতেন। কি ভেবে ওই কথাটা সে বলছে, এটা জীবনকৃষ্ণ বুঝতে পারতেন। উনি নিজেই বলছেন যে আমার psycho-analysis করার অসাধারণ ক্ষমতা আছে। psycho-analysis মানে কি ? বক্তার মনের কথাটা অর্থাৎ মাথার মধ্যে তার যে চিন্তা-ভাবনা খেলা করছে, যার প্রভাবে ওই কথাটা বেরিয়ে আসছে সেটা উনি ধরতে পারতেন। কি ভাবছে আসলে মানুষটা ? কখনও সে নিজেকে সচেতন ভাবে লুকিয়ে রাখছে, কখনো আবার প্রকাশ করছে। যখন মনের ভাব লুকোবার চেষ্টা করে কেউ, সে পালিশ করে কথা বলে, তখন কথাটা একটু change হয়ে যায়। কিন্তু সেই পরিবর্তিত কথাটা যদি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে ধরতে পারা যাবে আসল সত্যটা কি। কি ভাবছে সে। কোন ভাবনা থেকে এই কথাটা উৎসারিত হলো। আমরা 'ধর্ম ও অনুভূতি'তে দেখেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ কি ভেবে কোন কথাটা বলেছেন, এটা জীবনকৃষ্ণ অদ্ভুত ভাবে তুলে ধরেছেন। যেমন একটা উদাহরণ বলা যেতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'জানি কিনা আবার আসতে হবে, তাই সব কথা খুলে বলে গেলাম না।' জীবনকৃষ্ণ কি বলছেন ? বলছেন, ঠাকুরের একথায় বেশ বোঝা যাচ্ছে যে ঠাকুর ধরতে পেরেছেন তার জীবনে কিছু একটা অপূর্ণতা আছে। তার আত্মিক বিকাশ যেন সম্পূর্ণতা পেল না।

জীবনকৃষ্ণের ঘরে যে সব ভক্ত আসত, তাদের কথা শুনে তাদের মনোভাব তিনি বুঝতে পারতেন। আর সেই মতো তাদের সঙ্গে কথা বলতেন। একবার জীবনকৃষ্ণ বলছেন এই যে এত মানুষ আমাকে দেখে, কেন দেখে ? মায়েরা তো আমার ঘরে আসে না, তারা ঘরে বসেই আমাকে স্বপ্নে দেখছে। কেন ? না, আমিই যে এতগুলি মানুষ হয়েছি, আত্মিকে এক আমিই আছি। আমিই এতগুলি হয়েছি। এখন সেই দিন কদমতলার ঘরে নতুন এক ভদ্রলোক এসেছেন তার বন্ধুর সাথে। তিনি হঠাৎ করে বললেন, আচ্ছা এর অন্য কোন মানেও তো হতে পারে। অন্য কোন কারণও তো থাকতে পারে যে কেন লোকে আপনাকে স্বপ্নে দেখছে । জীবনকৃষ্ণ বুঝে ফেললেন টক করে যে এর মনোভাবটা কি। এ কি ভাবছে। তখন তিনি বললেন যে দেখুন আপনার মনে হবে, আমি অহংকার প্রকাশ করছি। "আমি, আমি" করছি। কিন্তু সত্য বলতে গেলে তো একথা আমাকে বলতেই হবে। যেমন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন, "অহং ব্রহ্মাস্মি"। তখন তিনি কী অহংকার প্রকাশ করছেন ? তিনি সত্য বলছেন। ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। বললেন আচ্ছা, আপনি কি করে বুঝলেন যে আমি

আপনাকে অহংকারী ভাবছি ? জীবনকৃষ্ণ বললেন, আমি কি ভুল ভেবেছি ? ভদ্রলোক বললেন, না। সত্যিই আমার মনে হচ্ছিল যে, আপনি একজন সাধক পুরুষ কিন্তু এত ‘আমি’, ‘আমি’ করছেন কেন ? আপনি নিশ্চয়ই খুব অংহকারী ! তা আপনি আমায় মাফ করুন, কিছু মনে করবেন না। ওই যে, “অন্য ব্যাখ্যাও হতে পারে, অন্য কারণও থাকতে পারে” — এই কথাটা শুনে জীবনকৃষ্ণ psycho-analysis করে বুঝলেন যে, কোন ভাবনা থেকে ভদ্রলোক এই কথাটা বললেন। জীবনকৃষ্ণ এই কথাটাকেই বলছেন যে, I read a man through his brain.

এখন আমাদের তো সেই ক্ষমতা নেই। কারও কারও একটু আছে, কিন্তু বেশিরভাগ মানুষেরই সেই ক্ষমতা নেই বলে কি হয় ? আমরা ঠকে যাই। মানুষের গোপন মনোভাবটা বুঝতে পারিনা। তার পালিশ করা কথাকে সোজা-সাপ্টা আমরা গ্রহণ করি। উনি বলতেন, দেখ কেউ নিজেকে চেপে রাখতে পারে না। নিজেকে ঠিক সে প্রকাশ করে ফেলবেই। কিন্তু attentively তার কথাটা শুনলে, বিশ্লেষণ করলে ধরতে পারা যাবে। স্বামীজীর সঙ্গে তর্কে কেউ পেরে উঠত না। একদিন একজন তাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আচ্ছা আপনার সাথে তর্কে কেউ পেরে ওঠে না কেন ? স্বামীজী বললেন, আমার মাথার পর্দা গুটিয়ে গেছে সেই জন্যে রে ! অর্থাৎ উনি বুঝেছিলেন যে ওনার একটা বিশেষ দর্শনের পর এই অবস্থাটা হয়েছে। তার উপস্থিত বুদ্ধি বহুগুণে বেড়ে গেছে। তীক্ষ্মধার বুদ্ধির সাহায্যে অন্যের যুক্তি তিনি কচ্ কচ্ করে কেটে দিতেন। সেই ব্যক্তি চুপ করে যেত। উত্তর দিতে পারত না। জীবনকৃষ্ণ বললেন, আসলে কি হয় জানিস ? সহস্রারের ঢাকনা খুলে যায় আর সহস্রার দর্শন হয়। একে বলে বস্তুতত্ত্বে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার। বেদান্তের সাধন শেষে নির্গুনের দ্বার খুলে গেল, পর্যাপ্ত আত্মিক শক্তির যোগান সুনিশ্চিত হ’ল। যোলআনা সগুন ব্রহ্মের প্রকাশের সূচনা কখন হয়েছিল জীবনকৃষ্ণের দেহেতে ? অতনু ? হ্যালো! রাজীব ?

রাজীবঃ যখন আত্মা সাক্ষাৎকার হল তখন থেকেই তো ?

পাঠকঃ হ্যাঁ। সচ্চিদানন্দ গুরু লাভের সময় থেকেই নয় কেন ? সচ্চিদানন্দ গুরুও তো সগুন ব্রহ্ম। আত্মাও সগুণ ব্রহ্ম। তফাতটা হচ্ছে, আত্মা হলো অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। ঠিক আছে ?

রাজীবঃ হ্যাঁ।

পাঠকঃ আত্মা সাক্ষাৎকার হলো মানে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের প্রকাশ হলো। তার আগে তো খণ্ড, আংশিক। এই আত্মা, ভগবান, ব্রহ্ম—তিনই এক। এই আত্মার মধ্যে জগৎ দর্শন হয়। অর্থাৎ আত্মার বা ব্রহ্মের বিরাটত্বের প্রকাশ হতে থাকে। তারপর তা বীজ হয়ে যায় অর্থাৎ বিশ্ব বীজবৎ অনুভূতি হয়। এই জগৎ গুটিয়ে এল, ছড়ানো জিনিস গুটিয়ে এল। এরপর জড়সমাধি ও স্থিত সমাধি হয়, নির্গুণের অনুভূতি হয়। তারপর এই সহস্রার দর্শন হয়। যেন সব আবরণটা সরে গেল, brain power জেগে উঠলো, কোন কিছু চাপা থাকলো না, তখন বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি হয়, জ্ঞান খড়্গ লাভ হয়। সহস্রার-এর ঢাকনা খুলে যায় ও তার ভিতর বিদ্যুৎরেখা দর্শন হয়।

সমীরণঃ আচ্ছা, এইটাকেই কি দাদা আবরণ ও বিক্ষেপ বলা হয়েছে,... এই ব্যাপারটাকেই কি ?

পাঠকঃ হ্যাঁ ঠিক। এখানে বিক্ষেপ হলো মানে আবরণ সরে গেল। যেমন ধরো মাঠে ঘাস আছে, সব সবুজ ঘাস। সেখানে তুমি একটা কিছু দিয়ে ঢাকা দিয়ে দাও। কদিন পরে দেখবে যে ঘাসগুলো সবুজ থেকে হলুদ হয়ে গেছে। সূর্যের আলো পায়নি এবং তাদের বৃদ্ধি হচ্ছে না, যেই ঢাকনাটা আবার খুলে দিলে তারপরে দেখবে দ্রুত সেই ঘাসগুলো আবার সবুজ হতে শুরু করেছে, ক্রিয়াশীল হয়ে গেছে, তাদের growth শুরু হয়ে গেছে। তেমনি আমাদের brain-এর একটা পার্ট—বেশ কিছু—মানে কয়েক কোটি brain cell সেখানে, তারা active হয় না। আমাদের brain এর যে potentiality ten percent-ও active নয়। বোঝো ! তাতেই মানুষের এত বুদ্ধি, এত কাণ্ড করছে, চাঁদে চলে যাচ্ছে। তাহলে hundred percent potentiality কার্যকর হলে কি কাণ্ড হবে ! এই যে বেশিরভাগ ব্রেন সেল ক্রিয়াশীল নয়, যেন চাপা পড়ে আছে—এই ঢাকনাটা যদি খুলে যায়, তাহলে আত্মিকে মানুষের মেধা শক্তি ভীষণ বেড়ে যায়, অতি মানস স্তরে পৌঁছে যায়। তীক্ষ্মধার বুদ্ধি হয়। প্রথম আবরণ কোথায় দেখা যায় ? ষষ্ঠভূমি থেকে সপ্তম ভূমি যাওয়ার পথে সাধক দেখেন একটা আবরণ, আবরণের ওপাশে সূর্য। এটা অহং-এর আবরণ। এই আবরণটা যখন সরে গেল, তখন সূর্য দেখা গেল। আত্মা সাক্ষাৎকার হলো। নিজের স্বরূপ দর্শন হল। সচ্চিদানন্দগুরু অঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মাকে দেখিয়ে বলে দেন, এই ভগবান, এই ভগবান দর্শন। সেইটা হল identify করা। চিনলাম। এই রাজীবকে চিনলাম, সঞ্জয়কে চিনলাম—কিন্তু সঞ্জয়কে জানা হয়নি, রাজীবকে জানা হয়নি তখনো। দিনের পর দিন মিশতে মিশতে ভিতরের পরিচয়টা পাব। সমীরণকে চিনেছি তার কত পরে জেনেছি যে সমীরণ গান করতে পারে; রাজীবকে চিনেছি তার কত পরে রাজীবের অনেক গুণের কথা আমি জানতে পেরেছি। সময় লেগেছে। কিন্তু বাহ্যিক যে পরিচয় সেটা যে কেউ দেখিয়ে দিলেই হবে। যেমন এর নাম হচ্ছে রাজীব, ও এই করে ইত্যাদি ইত্যাদি। তোমাকে আমি চিনলাম। চেনাটা হল, কিন্তু জানতে গেলে কি করতে হবে? এইবার কিন্তু আমার বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে, বিচারবোধটা তো প্রয়োগ করতে হবে । তুমি ভালো না মন্দ এসব বুঝতে গেলে আমার বিচারবোধটা প্রয়োগ করতে হবে। তাহলে প্রথমে চেনা হল আত্মাকে। এরপরে আত্মাকে জানা। এই জানতে গেলে আত্মা নিজেকে যে প্রকাশ করছেন, এই প্রকাশের একটা stage-এ গিয়ে ওই আবরণটাকে বিক্ষেপ করে নির্গুণের প্রকাশ হবে। তখন, তোমার মধ্যে যে কয়েক কোটি brain cell রয়েছে যেটা তোমার অধীনে নয়, তোমার আয়ত্তের বাইরে, সেইটা এবার আয়ত্তে আসবে, ক্রিয়াশীল হবে। আবরণ সরে গেল। এবার ওখানে সূর্যের আলো পড়ছে, ঘাসগুলো যেন active হচ্ছে। এই রকম ভাবে অনৈচ্ছিক পেশী যেমন, তেমনি আয়ত্তের বাইরের brain cell গুলো active হবে। তখন তোমার তীক্ষ্মধার বুদ্ধি হবে, বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি হবে। আধার বেড়ে যাবে। তোমার যে বিশ্লেষণী ক্ষমতা, সেটা অনেক গুণ বেড়ে যাবে। এই বিশ্লেষণী ক্ষমতা দিয়ে তুমি কি করবে ? না, আত্মার পরিচয়, ব্রহ্মের পরিচয়টা তুমি বোঝবার চেষ্টা করবে। এই জ্ঞান খড়্গ

হাতে পেলে, তবে তুমি তোমার দর্শন অনুভূতিগুলোর মর্মভেদ করতে পারবে। না হলে কিন্তু পারবে না।

রাজীবঃ দাদা, এটাতে কি মেধা নাড়ীর কথাটা বলছে ? এইটাই হয়েছিল কি জীবনকৃষ্ণের ক্ষেত্রে যে উনি বুঝে যাচ্ছেন কে কি বলতে চাইছে?

পাঠকঃ না। এটা মেধা নাড়ী নয়। জীবনকৃষ্ণ উর্ধ্বরেতা পুরুষ। ঠাকুর ধৈর্য্যরেতা সম্বন্ধে বলেছেন, বারো বছর বীর্য ধারন করলে মেধা নাড়ী হয়। সুতরাং কথাটা সাধারন মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওনাদের বস্তুতত্বে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা রাসফুল খাওয়ার তাৎপর্য অনেক বেশি—পূর্ণমাত্রায় মেধার প্রকাশ, golden brain হওয়া।

রাজীব ঃ আচ্ছা।

পাঠকঃ আমরা এখন যে রাসফুল খাওয়ার কথা বলছি তা এই প্রসঙ্গটা কেন উঠলো ? এই যে কেশব সেন স্বামীজীর খুব প্রশংসা করায় ঠাকুর তাকে বলেছিলেন যে, এক্ষুনি নরেনের এত প্রশংসা কোরোনি কারণ ওর রাসফুল খেতে দেরি আছে। এই রাসফুল খাওয়াটা কি এই প্রসঙ্গেই জীবনকৃষ্ণ বলছেন যে স্বামীজীর এইরকম দর্শন হয়েছিল, মাথার চামড়া গুড়িয়ে যাওয়ার অনুভূতি হয়েছিল। তাই তার বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি হয়েছিল। তীক্ষ্ণধার বুদ্ধি। তার সাথে তর্কে কেউ পেরে উঠত না। কচ কচ করে যুক্তি দিয়ে কেটে দিত। তা এই বিষয়টা আমরা এখন জানবো।

রাজীবঃ আচ্ছা।

পাঠকঃ মেধা নাড়ী লাভ বা রাসফুল খাওয়া সাধারণের হতে পারে। এই রাসফুল খাওয়া বা জ্ঞান খড়্গ লাভ স্বামীজীর হয়েছিল। তিনি জ্ঞান খড়্গ পেয়েছিলেন। স্বামীজি কিভাবে কাজে লাগালেন তা পরে আলোচনা করছি। এখন আমরা জেনে নিই ঠাকুর কি করে কাজে লাগালেন ? তার যখন বেদান্তের সাধন চলছে তোতাপুরীর কাছে, সেই ঘটনা মনে আছে ? উনি বারবার বসছেন ধ্যানে আর আনন্দময়ী মাকে দেখছেন, মা কালীকে দেখছেন। তখন উনি জ্ঞান খড়্গ বের করে মা-কে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললেন, মন হু হু করে উপরে উঠে গেল এবং উনি বলছেন নির্বিকল্প সমাধি হল।

নির্বিকল্প সমাধি না হোক জড় সমাধি তো হয়েছিল ! তা এই যে মা কালীকে কেটে ফেললেন জ্ঞান খড়্গ দিয়ে, এই জ্ঞান খড়্গটা কি ? এই বিশ্লেষণী ক্ষমতা। উনি বুঝলেন এই যে মা কালীকে দেখছি এ তো ভগবান দর্শন নয়। কারণ তার আগে তো তার ভগবান দর্শন হয়েছিল—অজানা মানুষ দেখিয়ে বলে দিচ্ছেন, এই ভগবান, এই ভগবান দর্শন। অঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মা সাক্ষাৎকার তো তার হয়েছে কিন্তু বারবার যখন কালীকে দেখছেন, উনি বুঝছেন যে এইটা তাকে বিভ্রান্ত করছে, কেননা, এইটা সংস্কারজ রূপ দর্শন— এক নম্বর। দুই নম্বর, এটা প্রতীকী দর্শন, বস্তু দর্শন নয়। ঈশ্বর বস্তু দর্শন হচ্ছে না। কালীকে তুমি অখণ্ড চৈতন্যের প্রতীক বলতে পারো, কিন্তু অখণ্ড চৈতন্য তো নয়। তাছাড়া, কালী একটা গোষ্ঠীর দেবী অর্থাৎ সংস্কারজ একটি ঈশ্বরীয় রূপ। এই নানান দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তিনি

জ্ঞান খড়্গ দিয়ে মা কালীকে কাটলেন অর্থাৎ তিনি বুঝলেন যে এ কিন্তু অখণ্ড চৈতন্য দর্শন নয়। তখন মন হু হু করে উপরে উঠে গিয়ে তার জড় সমাধি হয়ে গেল। এবার আসি স্বামীজীর কথায়। আমরা আগেই বলেছি রাসফুল খাওয়ার জন্য তাঁর বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি হয়েছিল। এর প্রমাণ পাই যখন তিনি একত্বের কথা বলছেন, পয়েন্ট অফ ইউনিয়নের কথা বলছেন। উচ্চ মেধা দিয়ে তিনি এতবড় কথা বললেন। জীবনকৃষ্ণও এই কথাটার খুব প্রশংসা করেছেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি এই অবস্থা ধরে রাখতে পারেন নি। কারণ প্রথমত তাঁর অনুভূতি হয়নি আর দ্বিতীয়ত যথাযথ অনুশীলন হয়নি। ফলে তিনি রামকৃষ্ণকে বোঝেননি। আর বোঝেননি বলেই শ্রীরামকৃষ্ণ এবং অন্যান্য ধর্মাচার্য্যদের মধ্যে পার্থক্য টানতে পারেননি। তাদের অবস্থানটা বোঝেননি। এই পার্থক্যটা কিন্তু করতে হবে ! প্রথমে আমাদের সেই পুরুষোত্তমকে চিনতে হবে। কোথায় ঈশ্বরের বেশি প্রকাশ সেটা জানতে হবে। তাকে ধরে এইবার ঈশ্বরকে জানা। এইখানে কিন্তু স্বামীজী ফেল করে গেলেন, জ্ঞান খড়্গ পাওয়া সত্বেও। এইটি খুব দুঃখের। তিনি কি করছেন ? বেলুড়ে মঠ করলেন। সেখানে একটি কৌটাকে আত্মারামের কৌটা বলে ওরা, সেই কৌটাতে রামকৃষ্ণের চিতাভস্ম, হাড় সব রেখেছেন একটুখানি আর বেশির ভাগটাই নিয়ে গেছেন ওই যে রামবাবু— ডক্টর রাম দত্ত তার কাঁকুড়গাছির বাড়িতে। একদিন আত্মারামের কৌটা নিয়ে উনি মনে মনে বলছেন যে কলকাতায় গোয়ালিয়র-এর রাজা এসেছেন, তিনি যদি বেলুড়মঠে আসেন তাহলে বুঝবো যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সত্য এবং তিনি এইখানেই অবস্থান করছেন, এই বেলুড়মঠে। এখন কলকাতা ছিল তখনকার ভারতবর্ষের রাজধানী। তা গোয়ালিয়রের রাজা তো কলকাতা আসবেই। স্বামীজী তখন বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেছেন, স্বাভাবিকভাবে গোয়ালিয়রের রাজা ঘোড়ার গাড়ি চড়ে বেলুড়মঠে দেখা করতে এসেছেন স্বামীজীর সাথে। যদিও একটা কারণে দেখা হয়নি, সেই সময়ে স্বামীজী বেরিয়ে পড়েছিলেন। তা যাইহোক, পরে এসে যখন উনি খবর পেলেন, উনি আনন্দে নাচতে লাগলেন আর সবাইকে বললেন, জানো আমি মনে মনে আজ এইটা বলেছিলাম, ঠাকুর প্রমাণ করে দিলেন যে সত্যি সত্যিই তিনি বেলুড়মঠে থাকেন। আত্মারামের কৌটাটা মাথায় নিয়ে নাচতে লাগলেন। আর বললেন, আমি বুঝলাম ঠাকুর সত্যি এবং ঠাকুর এইখানেই আছেন। বোঝ ! ঠাকুর যে সত্য কিভাবে এটা বিচার করছেন স্বামীজীর মতন লোক ! তিনি ভাবতে পারলেন না যে ঠাকুর শ্রেষ্ঠ অবতার, ঠাকুর আছেন মানুষের অন্তরে। এই সত্য থেকে তিনি সরে এলেন। তিনি সেটা ভাবতেই পারছেন না। তা আমরা কি বলবো ? রামকৃষ্ণ যদি সত্য হয়, জীবনকৃষ্ণ যদি সত্য হয় তাহলে আমার চাকরি হবে, আমার জীবনে এই এই facility পাব—এইসব বলব ? না। আমরা কি বলবো ? আমাদের বিচারধারাটা কি হবে ? আমরা বলতেই পারি যে এই ব্যাপারটা হলে বুঝব জীবনকৃষ্ণ সত্য, জীবনকৃষ্ণ সত্যিই ভগবান, কিন্তু কোন ব্যাপারটা হলে বুঝব ? তখন আমরা কি বলবো? কি বলতে পারি ?

আমরা বলব যে জীবনকৃষ্ণ যদি ভগবান হন তাহলে আমার দোষ ত্রুটি থাকলেও

তিনি কৃপা করে আমাকে দেখা দেবেন, কৃপা করবেন। আমাকে ঠিক করে নেবেন, আমাকে সংশোধন করে নেবেন, কারণ তিনি সবার মধ্যে আছেন। আমি তো এই জগত ছাড়া নই। তিনি তো ভগবান। আমার দোষ ত্রুটি দেখে তিনি কি আমাকে ঠেলে সরিয়ে দেবেন ? মুখ ফিরিয়ে নেবেন ? তিনি যদি ভগবান হন তাহলে তিনি আমাকেও কৃপা করবেন, তাই তো? আমাকেও তার সেই মঙ্গলময় রূপ তিনি দেখাবেন। তখন আমি বুঝবো যে তিনি ভগবান- —আমরা তো এইটা বলবো, তাই না ?

অর্পিতাঃ হ্যাঁ।

পাঠকঃ আমরা সাধারণ মানুষ। অতি, অতি নগন্য মানুষ। আমরা যেটা ভাবতে পারছি স্বামীজী জ্ঞান খড়গ হাতে পেয়েও তা ভাবলেন না। বিচারবোধটা অন্য দিকে চলে গেল তার। তিনি তার intellect টা কোথায় কাজে লাগালেন ? তিনি যখন বিদেশ থেকে ফিরে এলেন এবং পাঞ্জাবে lecture দিতে গেলেন, সেখানে একটা মঞ্চে উঠে উনি agriculture -এর উপর বক্তৃতা দিলেন দু'ঘন্টা ধরে। কিভাবে চাষবাস করলে, নতুন technology ব্যবহার করলে ভারতবর্ষের সব মানুষ খেতে পাবে সে বিষয়ে এবং শেষকালে বলছেন যে ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষ যেদিন খেতে পাবে, একটা মানুষও যেদিন উপোষ যাবে না, এমনকি ভারতের একটা কুকুরও যেদিন উপোসী থাকবে না, সেই দিন আমি ধর্ম কথা বলব। তা এক বৃদ্ধ পাঞ্জাবি ভদ্রলোক প্রায় ১৫ কিলোমিটার হেঁটে এসেছেন স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনতে। তিনি তো হতাশ। এইটা ধর্মের বক্তৃতা ? হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। এটা একটা improper use of brain power হয়ে গেল।

তো যাইহোক, তাহলে রাসফুল খাওয়াটা কি হল ? যেটা বলছিলাম, আবরণ সরে গেল, তখন যে দর্শন টা হয়— ওই মাথার খুলি খুলে গেল এবং ভিতরে সহস্রার দর্শন হলো। এটিকে বলছে রাসফুল। রাসফুল হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফুল, কিন্তু এই ফুলটা বাইরে দেখতে পাওয়া যায় না। বাইরের কোন ফুল নয়, সহস্রারে যে ফুল দেখা যায় সেটা। এরকম আমরা স্বপ্নে দেখি যে একটি স্টিকের উপর জ্যোতির্ময় গোল ফুলকপির মতো একটি ফুল। ফুলকপির আকৃতি অনেকটা ব্রেনের মত। এর অর্থ সহস্রার সক্রিয় হয়েছে। সাধক দেবত্বের (Divinty) পরিচয় জানতে সমর্থ হবে। যখন একটা গাছ Flowering stage -এ যায় তারপরে আর বাড়ে না। একটা গাছ ছোট থেকে বড় হচ্ছে, বড় হতে হতে যখন ফুল আসতে শুরু করে ওইটা maximum হয়ে গেল। আর বাড়বে না। এরপরে তার reproductive stage। এরপরে ফল হবে, effect দেবে। তাহলে brain cell গুলো যখন পূর্ণ ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে তখন আধার যতটা বাড়তে পারে ততটা বেড়ে গেল। এবার ধারনা ও উপভোগ। খাওয়া মানে অধিগত হওয়া, যেটা অনৈচ্ছিক ছিল, আমার ইচ্ছাধীন ছিল না, এইবার আমি চাইলে ব্রেনের ঐ অংশ কাজে লাগাতে পারব—এই অবস্থায় আসা। যেমন তুমি দেখনা রুটি খাচ্ছ, রুটিটা বাইরে ছিল এইবার তোমার পেটের ভিতর গেল। তাই না ? কাজ করছে সে, ক্রিয়া করছে। তা এই যে ঠাকুর বলছেন নরেনের এক্ষুনি এত প্রশংসা কোরোনি,

ওর রাসফুল খেতে দেরি আছে। অর্থাৎ ঠাকুর জানেন নরেনের বিরাট সম্ভাবনা আছে। এই সময়ে এত প্রশংসা করলে হবে না। কেশববাবু নরেনের খুব প্রশংসা করছেন, তখন ঠাকুর এই কথা বলছেন। আবার পরবর্তীকালে নিজে নরেনের খুব প্রশংসা করছেন। কেন ? না, তিনি তো teacher, good teacher. তিনি জানেন যে কখন কি করতে হবে। প্রথম তার কাজ হচ্ছে কেশব সেন এর কাছ থেকে নরেনকে সরিয়ে নিয়ে আসা। তারপরে তিনি নিজে প্রশংসা করছেন, উৎসাহ দিচ্ছেন, বলছেন যে আয় আমার কাছে আয়। কোনটি চল্লিশ নম্বরের সুতো, কোনটি একচল্লিশ নম্বরের সুতো বুঝতে গেলে, সুতোর ব্যবসায়ীর কাছে যাতায়াত করতে হয়। তা আমার কাছে আসবি তো বাবা? বারবার এসো। তাহলে আমি তোমাকে জানাবো সব। রাসফুলের বিষয়টা কেশব সেন যখন জানতে চাইলেন যে রাসফুলটা কি, ঠাকুর তার স্বাভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে একটি গল্প বললেন। বলছেন জানো, একটা ছাগল তার মাকে বলল, মা, আমি রাসফুল খাব। তার মা বলল, দাঁড়া, দাঁড়া। এই আশ্বিনে দুর্গাপুজোটা যাক, তাতে যদি বাঁচিস, তারপর কালীপুজো। তাতেও যদি বাঁচিস, তারপর আসবে জগদ্ধাত্রী পুজো। তাতে যদি বাঁচিস, তাহলে রাসফুল খাবি। এই গল্প শুনে কেশব সেন কি বুঝলেন? কিছু বোঝা তো সম্ভব নয়। আমরাও কিছু বুঝিনা, কেন ? না, ঠাকুর জানেন যে এটা প্রথম ক্লাস। আমি just information দিচ্ছি। বলছেন না, জানি কি না আবার আসতে হবে, তাই সব খুলে বলে গেলাম না। তিনি সব খুলে বলছেন না। ওই জন্য পরবর্তীকালে জীবনকৃষ্ণ এসে ওই তথ্যের উপর ভিত্তি করে knowledge দিলেন। তার মর্মার্থ ধরিয়ে দিলেন, জ্ঞান দান করলেন। তিনি যোগের অর্থ করলেন। সেটি ধারণা করতে পারলে wisdom লাভ হবে।

কি বলছেন তিনি? না, প্রথমে দুর্গাপূজা। দুর্গা দুর্গতিনাশিনী। দুর্গতি নাশ হয় কখন, দুঃখ দূর হয় কখন? যখন আত্মা বা ভগবান দর্শন হয়। তাকে দর্শন হলে সাধকের অহং নাশ হয়। তিনি গ্লানিমুক্ত হন, পবিত্র হন এবং নিষ্কাম হয়ে যান। তার বোধ হয় জীবনে যা পেয়েছি জীবন তাতে পরিপূর্ণ। কারণ, দুঃখের কারণ হল অভাব। ভগবান দর্শন হলে অন্তরে কোন অভাব বোধ থাকে না। রবীন্দ্রনাথের একটা ভারী সুন্দর কথা আছে। উনি বলছেন, অমৃত জিনিসটা রসের মধ্যে নাই, রসবোধের মধ্যে আছে। আমরা ছোটবেলায় গল্প শুনেছি কত যে দেবাসুরের লড়াই হচ্ছে সেই অমৃত খাবার জন্য ! কলসিতে করে অমৃত নিয়ে এসে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে, দেবতারা খাচ্ছেন। কত গল্প আছে। প্রয়াগে অমৃত কুম্ভ নামানো হয়েছিল, ওই জন্য কুম্ভ স্নান হয়। অমৃত কুম্ভটা নাকি এইখানে নামিয়েছিলেন একবার। শুধু প্রয়াগে নয়, হরিদ্বার, নাসিক ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় নামানো হয়েছে। তাহলে অমৃত যেন একটা তরল বস্তু, একটা কলসিতে করে রাখা আছে। সেখান থেকে ঢেলে ঢেলে দেওয়া হবে আর আমরা চেটে চেটে খাবো। দেবতারা খায়। কিন্তু অমৃত জিনিসটা সেই রকম কোন রস নয়, একটি উপলব্ধি যা আধ্যাত্মিক রসবোধের মধ্যে আছে। আমার যদি সৌন্দর্যবোধ জাগে তবেই তো আমি সব কিছুর মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজে নেব, তাইনা ? আবার পার্থিব বিষয়ের অভাব বোধ যদি মনে থাকে তাহলে তো আমার পার্থিব উপকরণের অভাবটা কোনদিনই মিটবে না। কারও

কোন একটা বস্তুর অভাব আছে সে অভাবটা মেটানো যায়, কিন্তু যার মনের মধ্যে অভাব বোধ ক্রিয়া করছে তার তো অভাব কখনোই মিটবে না।যতই তাকে দাও, যা চাইছে তাই দাও, আবার তার অন্য চাহিদা জাগবে। কেন ? অভাব বোধটা তার মজ্জাগত। মানুষের মজ্জাগত হচ্ছে ওই অভাববোধ। এই বোধটা সরে যাবে যদি ভগবান দর্শন হয়। মানুষটা নিষ্কাম হয়ে যাবে। মানুষটা পূর্ণতা লাভ করবে—অমৃতায়িত হবে। তখন তার দুঃখ দূরে যাবে। তাই ভগবান দর্শন হলো মানে দুর্গাপূজা হলো। এইটা যদি দেহ সহ্য করতে পারে, যদি brain crack না করে তাহলে কি হবে ?

না, এর পরে আসছে কালীপূজা। এই দুর্গাই হল কালী। দুর্গার দেহ থেকেই তো কালী বেরোলো। পুরাণের গল্পে সেই রকমই বলছে। এই কালী কি করলেন ? তিনি রক্তবীজকে বধ করলেন। রক্তবীজকে বধ করে তার সমস্ত রক্ত একেবারে নিঃশেষে পান করলেন। জিভ দিয়ে চেটে খেয়ে নিলেন, এক ফোঁটা রক্ত যাতে মাটিতে না পড়ে। কারণ মাটিতে এক ফোঁটা রক্ত পড়লেই কিন্তু নতুন রক্তবীজের জন্ম হবে। ব্রহ্মার এই রকমই বর ছিল। এটি প্রকারান্তরে অমরত্ব লাভেরই বর। তা এই আপাত অমর রক্তবীজ বধ হয় কালীপুজো করলে। তাহলে কালীপুজোটা কি? বেদান্তের সাধনে স্থান ও কালের লয় সম্পর্কিত অনুভূতি হয় অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-এর ফুট কেটে ভবিষ্যতে হবে নয়, হয়েই আছে এই বোধ জাগে। আর স্থানের নাশ হয়ে এই যে বিরাট জগত—তিন কাল নিয়ে যে জগত সেই বৃহৎ জগত বাইরেও যেমন, তেমনি এই জগত আমার ভেতরেও আছে উপলব্ধি হয়। তার মানে? বাইরে জগত নাই। এই ভিতরের জগতই বাইরে বিক্ষেপ করে তাতে বাস করি। এই বোধ যখন হয়ে যায় তখন সাধকের মাথা থেকে রজোগুণ সম্পূর্ণ নাশ হয়। এই অবস্থায় পৌঁছাতে আত্মা সাক্ষাৎকারের পর ১২ বছর সময় লাগে। এই হলো কালীপূজা। সে তখন বাইরের অনাবশ্যক কাজকর্মে নিজেকে জড়াচ্ছে না। নানান কাজে জড়িয়ে পড়া রজোগুণের যে ধর্ম সেইটা আর থাকে না। সে তখন কি করবে ? সে তখন আপন ভুবন সৃষ্টি করবে, জগত সৃষ্টি করবে। দেখো এই অবস্থায়, জীবনকৃষ্ণের cultural কোনো activity আমরা আর দেখতে পাচ্ছি না। তার আগে কিছু নাটক, গান, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি লেখালেখি করেছেন, পড়াশুনা করেছেন, সেইগুলো নিয়ে ভেবেছেন। কিন্তু বেদান্তের সাধনের পরে অর্থাৎ ১৯৩০ এর পর তিনি আধ্যাত্ম চর্চা ছাড়া আর কোন বিষয়ে মন দেননি। কেন ? ওই রজোগুণ সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল মাথা থেকে। আমি এইসব কাজ আরো সুন্দর করে করতে পারি, এই ভাবনা আর মাথায় থাকলো না। এইটাকেই পুরানে গল্প করে বলছে যে পরশুরাম ২১ বার নিঃক্ষত্রিয় করেছিল পৃথিবীকে। এই যে ক্ষাত্রতেজ, এইটা হল রজোগুণ। এ জিনিস লোপ পেল স্থান কালের লয় সম্পর্কিত অনুভূতি বারবার হয়ে। রজোগুণের পূর্ণ নাশ হয়ে কালী পুজো হয়ে গেল।

এরপর আসে জগদ্ধাত্রী পুজো। জগদ্ধাত্রী মানে জগতকে যে ধরে আছে। দর্শন হয় আত্মার মধ্যে জগৎ, বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপ দর্শন ও তার মননে তাকে ধারণা করাই হল জগদ্ধাত্রী

পূজা। এই দর্শন যদি দেহ সহ্য করতে পারে, যদি সাধক বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত হন তাহলে তাঁর দেহ চলে যাবে না, তিনি এই রাসফুল খাবেন। এই যে বিরাট বিশ্ব, আত্মার মধ্যে যে জগত দেখলেন, সেই জগৎ গুটিয়ে বীজে পরিণত হবে। বিশ্ববীজবৎ অনুভূতি হবে। অর্থাৎ অনু রূপে বিরাট বিশ্ব তার মধ্যেই রয়েছে ধারণা হবে। এর পর সাধকের মাথার চামড়া গুটিয়ে গেছে এরকম অনুভূতি হয়। দরজার পর্দাটাকে তুমি যদি গুটিয়ে নাও তাহলে কি হবে ? একদম উপরে যেখানে গুটিয়ে রাখলে সেখানে একটুখানি দেখা গেল। আর বাকি পর্দাটা দেখাই যাচ্ছে না। সেই রকম বিশ্বটা ছোট হতে হতে, গুটাতে, গুটাতে একটা বিন্দুতে চলে এলো-–যেন পর্দা গুটিয়ে গেল। বিশ্ব বীজবৎ অনুভূতির পরে প্রাণচৈতন্য নির্গুণে লয় হয়। বিশ্বরূপ দর্শন থেকে এই অবস্থা হতে চারমাস সময় লাগে। তারপর ওইটা দেখানো হয় যে সহস্রার open হয়ে গেল। সহস্রার দর্শন হচ্ছে। এই হচ্ছে রাসফুল খাওয়া। এই যে বিশ্ব বীজবৎ অনুভূতি হোলো, বীজ হাতে এলো, এইবার তার নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা করা সম্ভব হবে নির্গুণের অফুরন্ত তেজ লাভ করে, ভিতরে রামের প্রকাশে।

এই যে জ্ঞান খড়গ, বা বিশ্লেষণী শক্তি হাতে এসে গেল, এইবার আমি ওই বীজরূপে পাওয়া আত্মিক জগতকে অর্থাৎ আত্মাকে বিশ্লেষণ করবো, পর্যালোচনা করবো, জানতে পারবো। তখন brain cell পুরো active হচ্ছে। সাধক তখন রাসফুল খাচ্ছেন মানে রাসফুল দর্শন করে উপভোগ করছেন। অনৈচ্ছিক brain cell গুলো তখন সাধকের ইচ্ছাধীন হয়, অধিগত হয়। সে কাজে লাগাতে পারে। আগে কিন্তু ঐ brain cell ছিল অথচ কাজে লাগানো যাচ্ছিল না। তাই ব্যষ্টির সাধনের এইসকল অনুভূতি সুদূর পরাহত। যেকোনো মানুষের হচ্ছে না। এ যুগে কিন্তু আমরা সহজেই ভগবানের কৃপা পাচ্ছি। কেন ? না, একজন মানুষ ভগবান দর্শন করে, ভগবান হয়ে গিয়ে হাজার হাজার মানুষের অন্তরে চিন্ময়রূপ ধরে প্রকাশ পাচ্ছেন। ব্যষ্টির সাধন এক যুগে একজনেরই হবে। বাকী এই যে কোটি কোটি মানুষ রয়েছে এরা কি করবে ? এরা কি ভগবানের কৃপা পাবে না ? নিশ্চয়ই পাবে। কি করে হবে? না, ওই মানুষটি যিনি ভগবান হয়ে গেছেন তাকে ভিতরে দেখে নির্গুণের দ্বার খুলে গেলে, তার সাথে আত্মিক একত্ব লাভ করবে। তখন দেহস্থ দেবত্বের বিশেষ জাগরন ঘটবে এবং মেধা শক্তি বৃদ্ধি পাবে। ঠাকুরের কথায় সাধারণ মানুষও তখন রাসফুল খেতে পারবে। এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে আমাদেরও সেই মেধাশক্তি জাগবে বলছেন, ঠিক আছে। কিন্তু ওই যে বললেন যে, আগে দুর্গাপূজা যাক, কালীপূজা যাক, জগদ্ধাত্রী পূজা যাক; তারপরে রাসফুল খাবি, যদি দেহ টেকে অর্থাৎ তোকে ধরে যদি বলিদান না দেয়। তা আমাদের কি দেহ চলে যাবার সম্ভাবনা আছে? প্রশ্ন উঠতে পারে! উত্তর হল–না, আমাদের কিন্তু দেহ চলে যাবার প্রশ্ন নেই। সে ভয়টা নেই। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কি হতে পারে ? না, আমাদের reaction হতে পারে ব্রেনে, যদি নিরন্তর অনুশীলনের মধ্যে কেউ না থাকে। নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলনের মধ্যে না থাকলে কি হবে? যদি নিত্য ঘটি মাজা না হয় তাহলে কি হবে? ঘটিতে একটু যদি নোংরা থেকে যায়, একটু যদি সংস্কার থেকে যায়, একটু যদি গোঁড়ামি থেকে যায়

তা হলে সেই ঘটিতে দুধ ফোটালে ছানা কেটে যাবে। অর্থাৎ, তোমার মধ্যে যদি সংস্কার থাকে, একটুখানি হলেও যদি থেকে যায়, তাহলে নতুন কথা পাঠে এসে শুনলে তোমার reaction হতে পারে। তুমি বলবে, ও, এরা আবার পাঠে কি সব আলোচনা করছে! এরা বেশি পাকা হয়ে গেছে। এরা রামকৃষ্ণ ছাড়িয়ে জীবনকৃষ্ণ; এখন আবার জীবনকৃষ্ণ ছাড়িয়ে বলছে যে সমষ্টি চৈতন্যের নতুন বিকাশ হচ্ছে। জীবনকৃষ্ণেরই নতুন বিকাশ হচ্ছে, নব জীবনকৃষ্ণ বলছে। এরা সব অন্য line-এ চলে যাচ্ছে। এ পাঠ ঠিক নয়। সে পাঠে আসা বন্ধ করে দেবে। এই reaction হয়ে গেল। এই ক্ষতিটা হতে পারে। আমাদের ক্ষেত্রে দেহ যাবে না। কিন্তু এই সম্ভাবনাটা আছে। একজন মানুষ কিছু দিন এলো, তারপর অনেকদিন পাঠে আসেনি। আবার হঠাৎ করে পাঠে এল, তার reaction হয়ে যাবে। এমনই reaction হবে যে সে বলবে এরা লাইনচ্যুত হয়ে গেছে। সেরকম অভিজ্ঞতাও হয়েছে। এক ভদ্রলোক বহুদিন বাদে সখেরবাজারে পাঠে এলেন। তা তিনি পাঠটা শুনে খুব রেগে গেলেন পাঠকের উপর। পাঠ শেষে বললেন যে তুমি এইসব কি বলছো? জীবনকৃষ্ণকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলছো? এতদিন আমরা সগুন ব্রহ্ম বলেই জানি। পাঠক তো অবাক! তা এখন আমাদের যে আলোচনা হচ্ছে সেই আলোচনার সঙ্গে উনি পরিচিত নন। হঠাৎ করে অনেক বছর পরে এসেছেন পাঠে। উনি জিনিসটা নিতে পারলেন না এবং এমনই reaction হলো যে উনি আর পাঠে আসেন না। তা আমাদের ক্ষেত্রে এইটা হতে পারে অর্থাৎ brain নিল না, সহ্য করল না জিনিসটা।

তাহলে যে দুর্গাপূজা যাক, কালীপূজা যাক, জগদ্ধাত্রীপূজা যাক, তারপরে রাসফুল খাবে, এটা আমাদের ক্ষেত্রে কি বলবো ? দুর্গাপূজা যাক মানে কি ? না, ওই ভগবান দর্শনকারী মানুষটিকে আত্মা বা ভগবান রূপে প্রথমে দেখবে। তারপরে কালীপূজা যাক, মানে, নিজের ও অন্য অনেকের বহু দর্শন অনুভূতি শুনে শুনে ধারণা করা যে আত্মিক জগতের বিকাশের একমাত্র কর্তা তিনি। আমরা দ্রষ্টা মাত্র। পরে জগদ্ধাত্রীপূজা হ'ল— তারই মধ্যে সমগ্র আত্মিক জগৎ তা ধারণা করা। দর্শন হবে বিরাট পুরুষ জীবনকৃষ্ণের ভিতর সমগ্র মনুষ্যজাতি এমনকি দ্রষ্টা নিজেও। আর শেষে তিনিই জগৎ চৈতন্যের ঘনীভূত রূপ হয়ে বীজরূপে ধরা দেবেন–তাঁকে স্বপ্নে সূর্যের মধ্যে দেখা যাবে। এই তিনটে stage, উপলব্ধির তিনটি স্তর অতিক্রম করলে তাকে নির্গুণব্রহ্ম বলে উপলব্ধি হবে, পরিণতিতে অনুচৈতন্য জাগ্রত হবে ও সহস্রারের পর্দা গুটিয়ে যাওয়ার ফল (effect) পাবো আমরা। আমাদের সকলের ওই দর্শন হতে হবে তার কোন মানে নেই। অন্যভাবেও রাসফুল দর্শন হতে পারে। কেউ দেখবেন পাতাবিহীন গাছের চূড়ায় জ্যোর্তিময় একটি ফুল, কেউ দেখবেন জীবনকৃষ্ণ পিঠ চাপড়ে বলছেন, তোর বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি, কাউকে রাসফুল লেখাটা দেখিয়ে বলে দেবেন —এই রাসফুল, এই রাসফুল খাওয়া, কেউ দেখবেন জীবনকৃষ্ণ তাকে খড়গ দিলেন, কাউকে আর্শীবাদ করে বলবেন, তোর gold brain হবে ইত্যাদি। ওই সব দর্শন যদি নাও হয়, নির্গুণের ঘনমূর্তি রূপে বা সমষ্টি চৈতন্য রূপে জীবনকৃষ্ণকে দেখে তুমি তার effect পাবে

অর্থাৎ নির্গুণের সেই তেজ জাগবে, তোমার ভেতরে brain cell গুলো active হবে এবং তুমি অনেক স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পারবে, at least— ধরিয়ে দিলেই , ইঙ্গিত দিলেই বুঝে নিতে পারবে। তাহলে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা শেষে মেধা শক্তির জাগরণ ঘটবে-– সেই বিরাটকে অনু রূপে, চৈতন্যের সাগরকে দেহস্থ অনুচৈতন্যের মধ্যে উপলব্ধি করে। আর এটা হলে কি হবে ? না, মানুষের অনুভূতি মূলক ধর্মচর্চায় আগ্রহ বাড়বে, স্মৃতিশক্তি বাড়বে ও মনন শক্তি বাড়বে। ফলে প্রাসঙ্গিক তথ্য ও দর্শন স্মরণ করে আলোচনাকে গভীরতা দান করতে সক্ষম হবে। যেটা এখন আমরা দেখছি। আগে মানুষ স্বপ্নের স্থূল অর্থ করতে আগ্রহী ছিল। এখন কিন্তু সবকিছুই যোগে নিচ্ছে, অন্যভাবে ভাবতে পারছে। এখন স্বপ্নে কেউ দেখছে দীপকে, ব্যাখ্যা করছে দীপ মানে চৈতন্য। চট করেই ব্যাখ্যা করতে পারছে যে সে প্রকারান্তরে জীবনকৃষ্ণকেই দেখেছে। এইটা সাধারণ মানুষের মধ্যেও কিন্তু চট করে হয়ে যাচ্ছে, ধরে নিতে পারছে অর্থাৎ তাদের যোগদৃষ্টি লাভ হচ্ছে এবং মেধা শক্তি বাড়ছে। এটা হচ্ছে essential criteria, সাধারণ মানুষের পক্ষে এই রাসফুল খাওয়াটা হলে যোগযুক্ত অবস্থাটা স্থায়ীত্ব লাভ করে। আর তবেই আধ্যাত্মিক জগতে নতুন কৃষ্টির উদ্ভব হবে। আমরা সেই পথে এগোচ্ছি।

এই বিষয়টা বোঝানোর জন্যে এর সাথে একটা স্বপ্ন বলতে চাই। তারপর তোমাদের স্বপ্ন শুনবো। এটা শুভাশিসের দেখা একটা স্বপ্ন। বোলপুরের শুভাশীষ দাশ—এর স্বপ্ন। ও দেখছে, মনে হচ্ছে স্নেহময়দা কোন পুরনো স্থাপত্য দেখাতে নিয়ে গেছে। উদয়গিরি বা তক্ষশীলা হবে জায়গাটা। সেখানে practical পাঠ হবে, মানে পাঠে যে ঈশ্বরীয় কথা হয়, সেটা theoretical অর্থাৎ তত্ত্বটা বোঝার চেষ্টা হতো এতদিন। এবার practical class হবে অর্থাৎ ঈশ্বরীয় তত্ত্বের প্রায়োগিক দিকটি, ব্যবহারিক দিকটি দেখানো হবে। ঘুরে ঘুরে উনি দেখাবেন ও বোঝাবেন। সঙ্গে বরুণদাও রয়েছে, আর একজন রয়েছে। তিনি খুব প্রাচীন ঐতিহাসিক সৈনিক। তাঁর পরনে বর্ম, সৈনিকের বেশ এবং হাতে বর্শা। তাঁর দেহ যেন নিরেট, জলীয় অংশ নেই, শুষ্ক ওজন টুকু আছে। স্নেহময়দা ব্রহ্মময়ীর মুখ প্রসঙ্গে কথা বলছেন এবং ওই কথা বলতে গিয়ে অখণ্ড চৈতন্যের প্রবাহ কথাটি বললেন। বললেন যে চৈতন্যপ্রবাহটা বুঝতে হবে। যেহেতু practical ক্লাস তাই ওই সৈনিকটি সামনে এসে একটি পাথরের উপর হাত দুটি রেখে দাঁড়ালো। গোল পিলারের মত একটা পাথর। সেখানে হাত দুটি রেখে দাঁড়াল এবং এক বিরাট আলোর স্রোত যেন তাঁর দেহের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। আবার পরে দেখছি তার দেহ থেকেই আলোর স্রোত বেরোচ্ছে! তার বাইরে আর কোথাও আলো নেই। ওই সৈনিকটির দেহ থেকে যে আলো বেরোচ্ছে ওই আলোতে চারিদিক আলোকিত। বেশ কিছুক্ষণ এটা দেখার পর দেখছি যে ওই সৈনিকের দেহ অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু সৈনিকটির পোশাক ও বর্শাটি পড়ে রইল। মনে হলো ওই সৈনিকসহ আলোর স্রোতটি প্রতিটি বস্তুকণার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তখন প্রতিটি বস্তুকণায় তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছি। প্রত্যেকটা বস্তুকণা যেন এবার বিন্দু বিন্দু লাল উজ্জ্বল কণা হয়ে গেল। এক্ষেত্রেও বাইরের কোনো

আলো নেই, ওই জ্যোতির বিন্দুগুলি থেকে যা আলো বের হচ্ছে তাতেই সব দেখা যাচ্ছে। মোহময় এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। স্নেহময়দা বললেন, ওই দেখ অনুচৈতন্য। অসংখ্য অনুচৈতন্যের সৃষ্টি হয়েছে। এরপর ওই অনুচৈতন্যগুলো, যেন ফটোর অসংখ্য pixel, পুনরায় একত্রিত হতে থাকলো এবং কী আশ্চর্য ! একটি মানুষের রূপ নিল। সে একটি young ছেলে, তার সারা গায়ে সাদা কাপড় জড়ানো। তার দেহ থেকে স্নিগ্ধ কিন্তু তীব্র সাদা আলো বেরিয়ে চারিদিক ভরে গেল। ওই মানুষটিকে ছাড়া ওই আলোয় আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সে ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগল ওই স্থাপত্যের এক গুহার সামনে থেকে। স্নেহময়দা তাকে দেখিয়ে বলছেন, ইনি এক নতুন মানুষ, ভরা যৌবনের এক নতুন মানুষ। মুখটা পরিষ্কার বোঝা গেল না। খুব ফর্সা, কালো চুল। দেখে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। তিনি এবার আমাদের সাথে পথ চলা এবং কথা বলা শুরু করলেন। ওই জায়গাটিকে তখন মনে হচ্ছে school of thought. এটাও যেন কেউ আমার ভিতর থেকে বলছে, এটা হচ্ছে school of thought. অর্থাৎ একটা বিশিষ্ট চিন্তাধারা। হঠাৎ স্নেহময়দা ঘুরে দাঁড়ালেন, বেশ জোর গলায় বললেন, এর পরও যদি বেঁচে যাস...। তখন আমার মনে হচ্ছে তাহলে রাসফুল খেতে পাবো।... বোঝো ! কি অদ্ভুত না স্বপ্নটা ? হ্যালো ?

সমীরণঃ হ্যাঁ, এটার সাথে link আছে পুরো।

পাঠকঃ কি অপূর্ব স্বপ্ন! দেখো, প্রথম অংশে ওই ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখা প্রসঙ্গে বলছে যে, অখণ্ড চৈতন্যের প্রবাহ। ব্রহ্মময়ীকে যে তুমি দেখবে, একটা মানুষকে দেখলেই ব্রহ্মময়ীকে দেখা হয়ে গেল এরকম কিন্তু নয়। এই চৈতন্যের প্রবাহটা বুঝতে হবে। তাই না ? রামকৃষ্ণের ভিতর প্রথম আত্মার সঙ্কলন হল, ব্যক্তিগতভাবে অখণ্ড চৈতন্যকে তিনি ভিতরে পেলেন, পরবর্তী যুগে সেই আত্মা দর্শন করে আত্মিক জগৎ বাইরে বিক্ষেপ করলেন জীবনকৃষ্ণ। অর্থাৎ ওই আলোর প্রবাহ বেরোতে শুরু করলো জীবনকৃষ্ণের দেহ থেকে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের এই ইচ্ছা হয়েছিল। বলছেন না যে, এখান থেকে যদি একটা স্রোত বয় তাহলে ভালো হয়, সেতো আর একঘেয়ে হবে না। সেই স্রোত বইলো তবে সেটা জীবনকৃষ্ণের জীবনে। তাঁর দেহ থেকে সেই স্রোত বেরোলো। সম্পূর্ণ নতুন কথা তিনি বলতে থাকলেন। নতুন জ্ঞানের আলো তিনি জগতকে দিলেন অসংখ্য মানুষের মধ্যে চিন্ময় রূপে ফুটে উঠে। তারপরে শেষের দিকে কী বলছেন? বলেছেন, আমি জাল গুটিয়ে নিলাম। আবার সেই আলোর স্রোত তার মধ্যেই যেন ঢুকে গেল, সংহত হলো। মনুষ্যজাতিকে নিজের ভিতর দেখলেন, তার একটা পরিবর্তন হলো। জগৎচৈতন্য ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হলেন সমষ্টিচৈতন্যে।

শুরু হল নতুন লীলা। দেখা গেল সৈনিকটা আর নেই অর্থাৎ সকল ঐশ্বর্য ও উপাধি ত্যাগ করে এই মহাসাধক নিজেকে সম্পূর্ণরূপে দান করে দিলেন। কিভাবে ? না, অসংখ্য অনুচৈতন্যের সৃষ্টি হয়ে গেল তারই সত্তা লাভে। জীবনকৃষ্ণের জীবদ্দশায় তার ব্রহ্মত্বের কিরণ তার থেকে বেরিয়েছিল। আর এখানে সত্তা দান করে বহু মানুষের মধ্যে অনুচৈতন্যের সৃষ্টি করছেন, জাগ্রত করছেন। এই অনুচৈতন্যগুলি যখন আবার সংহত হচ্ছে,

তখন নতুন একটি মানুষের রূপেই তাকে দেখা গেল। বুঝিয়ে দিলেন তিনি সমষ্টিচৈতন্য। তাকে দেখে তার সাথে একত্ব অনুভব করলে আমরা পূর্ণতার পথে এগোবো, তখনই রাসফুল খাওয়া হবে। তখনই মেধাশক্তি আমরা লাভ করব, সেই জ্ঞান খড়গ পেয়ে বহুত্বে একত্বের রসাস্বাদনের পথে এগোতে শুরু করব। এই রসাস্বাদনের একটা criteria হল জ্ঞানখড়গ পাওয়া, সাথে সাথে আরেকটা criteria-র কথা আমাদের মানিক পত্রিকায় একটা স্বপ্নে বলা হয়েছে। কি বলা হয়েছিল বলতো? সেখানে কি বলা হয়েছিল? এই চৈতন্যের রসাস্বাদন করতে গেলে সমস্ত জীবনকৃষ্ণপ্রেমীকে ভালবাসতে হবে। ও হ্যাঁ। এখানে আরেকটা কথা বলি। আজকেই এই স্বপ্ন শুনলাম। অভীপ্সার স্বপ্ন। এই একত্ব লাভ হলে কি হবে? মেধা শক্তি যে জাগবে তাতে করে তোমাদের মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসা জাগবে। এই যে বিবেকানন্দের জ্ঞান খড়গ লাভ হয়েছিল সেই বিবেকানন্দকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি বলছেন? বলছেন সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক ঋষি। কেননা তার মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসা জেগেছিল। সেই জন্য বলছেন তুই সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক ঋষি। তা তিনি আমাদের মধ্যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই আত্মজিজ্ঞাসা "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" জাগিয়ে তুলবেন। আবার সাধারণ মানুষের মধ্যে মেধা শক্তি জাগিয়ে তার উত্তরও দেবেন। সাধারন মানুষ ওই বুদ্ধদেবের ভাষায়--"আত্মদীপ"–হবে, নিজেই নিজের ভেতরের সেই জ্ঞানালোক লাভ করবে এবং উত্তর খুঁজে পাবে। এই প্রসঙ্গে অভীপ্সার স্বপ্নটা শোনা যাক। অভীপ্সা তোমার আজকের স্বপ্নটা বলতো? হ্যালো?

অভীপ্সাঃ হ্যাঁ, দেখছি যে এক জায়গায় অনেক লোক। যেন স্নেহময় মামা আমাকে একটা question দিয়েছে, আমি তার answer-টা বারো পাতা জুড়ে লিখেছি। এবার এক জায়গায় অনেক মানুষ আছে, একটা প্রেসে, ওখানে আমার ওই লেখাটা ছাপবে। তারপরে দেখছি যে আমার কাকাই এসে বলছে যে ওই লেখাটার যে শিরোনাম হবে মানে answer টার ওপরে যেটা লেখা হবে সেটা "মানিক" আর "প্রবাহ" মিলিয়ে একটা নাম। কিন্তু ওইটার exact যে নাম, শিরোনামটা, ওটা মনে নেই। কিন্তু ওই দুটো নাম মিলিয়েই একটা নাম। তারপরে আমি শিরোনামটা লেখার জন্য পেন্সিল নিয়ে আসছি। press-এ যেখানে ছাপা হয়েছে ওইখানে গেছি। একটা copy নিয়ে check করে নিচ্ছি লেখাটা। এরপর check করতে গিয়ে দেখছি last-এর দুটো page -এ ভুল আছে। এবার একটা ভুল আমি কেটে লিখলাম, 'অবদান'। আরেকটা কী লিখেছি সেটা মনে নেই। এবার ওইটা ছাপা হবে বলে সবাই খুব আনন্দ করছে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে না যে আমিই লেখাটা লিখেছি। আমি লিখেছি বলে আমার কোন অহংকার হচ্ছে না। সবাই আনন্দ করছে। তার পরে ফোনে পিসিমণিও বলছে, আর পাঠের সাথে যুক্ত নয় সেই কাকাইও বলছে যে লেখাটা দিস পড়বো। মানে তাদের খুব আগ্রহ, পাঠের লোকরাও আছে, অনেক বাইরের লোকও আছে। সবাই যেন ওইটা নেওয়ার, মানে জিনিসটাকে গ্রহণ করার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করছে। এটাই দেখলাম।

পাঠকঃ দারুন স্বপ্নটা। এই কথাটাই আমি বলতে চাইছিলাম। তোমার স্বপ্নটা একদম এই প্রসঙ্গেই। মানুষের মধ্যেই তিনি প্রশ্ন জাগাবেন আর সাধারণ মানুষের মধ্যেই তিনি উত্তরটা

জানাবেন। কি করে সম্ভব ? না, যদি সাধারণ মানুষের মধ্যে তিনি ওই মেধাশক্তি জাগিয়ে তোলেন, জ্ঞান খড়গ দান করেন তবেই সম্ভব। সেটাই দেখাচ্ছে। এখানে স্নেহময় মামাও সাধারণ মানুষ, তুমিও সাধারণ মানুষ। তা আমাদের ভেতর থেকেই এই আত্মজিজ্ঞাসা জাগবে এবং তিনি উত্তরটা দেবেন। আমাদের ভেতর থেকেই জাগবে উত্তরটা। এখন উত্তরটা বারো পাতা কেন ? ১২ সংখ্যাটাকে দু দিক থেকে দেখা যায়। যদি তুমি google এ search করো দেখবে ১২ কথাটা symbol of completion, সম্পূর্ণতার প্রতীক মানে উত্তরটা তোমার সম্পূর্ণ হয়েছে। এ যাবৎ কি হয়েছিল, ওই যে একত্বের বার্তাবাহী বেদান্ত incomplete ছিল। সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা কোথায় ? আত্মিক একত্ব লাভে সব প্রশ্নের মীমাংসা, জীবনকৃষ্ণ বলছেন "ধর্ম ও অনুভূতিতে"। তাহলে সব প্রশ্নের মীমাংসা হবে এই আত্মিক একত্বের অনুভূতিতে। সেই মীমাংসাটা এইবার হচ্ছে। উত্তরটা ঠিক ঠিক পাবে সাধারন মানুষ। এই ১২ পাতাজুড়ে উত্তর অর্থাৎ সম্পূর্ণ উত্তর পাওয়া যাবে। একত্বের কথাই বলছে। আবার দেখো যীশুর ১২ জন শিষ্য, বৈষ্ণবরা বলে দ্বাদশ গোপাল, ভরদ্বাজাদি দ্বাদশজন ঋষি ছিলেন যারা রামকে পূর্ণ ব্রহ্ম বলে চিনেছিলেন বলা হয়। এসব নানা কাহিনীতে এই একত্ব লাভের কথাই বলছে। এখন এখানে দুটো বিশেষত্ব আছে। একটা হচ্ছে যে উত্তরের শিরোনাম দিচ্ছে, আর দুটি শব্দ সংশোধন করল। শিরোনামটা 'মানিক' বা 'প্রবাহ' নয়, কিন্তু এই দুটো শব্দ মিলিয়ে মিশিয়ে কি একটা শব্দ সেটা ওর মনে নেই। এখন মানিক, কুড়িয়ে পাওয়া মানিক জীবনকৃষ্ণের কথা, অর্থাৎ জগতচৈতন্যের কথা। আর 'প্রবাহ' সাধারণ মানুষের অনুভূতির উপর ভিত্তি করে লেখা বই অর্থাৎ সমষ্টিচৈতন্যের কথা আছে এখানে। তাহলে জগৎচৈতন্যের বিকাশ এবং তার থেকে সমষ্টিচৈতন্যে উত্তরণ। এই বিষয় নিয়ে এই উত্তরটা। একত্ব বিষয়টা বুঝতে গেলে প্রথমে জগতচৈতন্যকে বুঝতে হবে, সেই বিশ্বব্যাপী অখণ্ড চৈতন্যকে বুঝতে হবে। তারপর তার উত্তরণ, সমষ্টি চৈতন্যে রূপান্তর ঘটেছে তা বুঝতে হবে। তিনি নিজের সত্তা দান করে অসংখ্য মানুষের মধ্যে অনুচৈতন্য জাগ্রত করবেন এবং সেই অনু চৈতন্যগুলিকে একীভূত করবেন, একত্ববোধ দান করবেন এই বিষয়টা বুঝতে হবে। তাহলে যখন আমরা কোনো শিরোনাম দিই কোন article-এর, article এর যে বিষয়বস্তু তার সারসংক্ষেপ নিয়ে শিরোনামটা হয়। তাহলে একত্বের মূল জিনিস হচ্ছে এইটা জানা, জগৎ চৈতন্য কিভাবে সমষ্টিচৈতন্য হচ্ছেন এবং সমষ্টিচৈতন্যের যে বিকাশ, নিজেকে বহু করে আবার বহুকে এক করছেন, এই বিষয়টা নিয়েই এটা লেখা অর্থাৎ একত্ব সম্পর্কে যা কিছু লেখা লিখতে গেলে, উত্তর দিতে গেলে তোমাকে এটা জানতে হবে। এইটা তারই শিরোনাম। সেখানে যা লেখা হয়েছে সেখানে দুটি সংশোধনী। এটা খুব ইম্পরট্যান্ট। সংশোধন কি করছে? না একটা শব্দ কেটে ও লিখল 'অবদান' অর্থাৎ contribution, সাধারণ মানুষেরও অবদান থাকবে। এতদিন অবদান ছিল না কেন ? জীবনকৃষ্ণ বলছেন, আত্মিকে এক আমিই আছি, তোরা নেই। ঠিকই তো, আমাদের তো অবদান ছিল না। ধরো একটা তাকে একটা আয়না ছিল সেখান থেকে তুমি সেটা নিয়ে এলে এবং চুল আঁচড়ালে। আবার আয়নাটা

রেখে এলে। তাহলে আয়নাটা তুমি নিয়ে এলে, তুমিই ইচ্ছামতো ব্যবহার করলে। আয়নাটা নিজে তো কিছু করেনি। তাহলে এক অর্থে তার কিছু contribution নেই। জীবনকৃষ্ণ নিজের প্রয়োজনে মানুষকে আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে এসেছেন তার কাছে, তার ঘরে। তাদের দর্শন অনুভূতি হয়েছে তাঁরই কৃপায়। সেখান থেকে তিনি নিজেকে জেনেছেন। তার কাজ হয়ে গেছে। মানুষগুলো কিন্তু আবার আগের জায়গায় ফিরে গেছে। তাঁদের দর্শন হয়তো হচ্ছে বটে কিন্তু জ্ঞানের দিক থেকে আর এগোতে পারেনি। তাদের চৈতন্য সেভাবে জাগ্রত হয়নি। সাময়িক ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। জীবনকৃষ্ণ বলছেন, এত বড় কাণ্ডটা হলো শুধু আমাকে বোঝানোর জন্য। কিন্তু এযুগে সমষ্টির সাধনে, আমাদেরও চৈতন্য জাগ্রত করবেন তিনি। তখন আমাদেরও, সাধারণ মানুষেরও কিছু contribution থাকবে। তবেই তো বোঝা যাবে যে সব মিলিয়ে এক সমষ্টি চৈতন্য, তবেই তো আমরা একত্বের রস আস্বাদন করব। সেইটাই তো তার কাজ—মানুষকে বহুত্বে একত্বের রস আস্বাদন করানো। আত্মার ক্রমবিকাশ, ব্রহ্মময়ীর চূড়ান্ত বিকাশটা কি হবে ? এই সকলকে এক করা। সাধারণ মানুষকে সেই একত্বের মাধুর্য্য রস তিনি আস্বাদন করাবেন। সেখানে আমার যে নিজস্ব অভিজ্ঞতা সেটা আমি বলব, তুমি তোমার অভিজ্ঞতা অর্থাৎ অনুভূতি বলবে। প্রত্যেকেই নিজস্ব অভিজ্ঞতাগুলো বলবে ও তার মর্মার্থ উদঘাটনে বহুত্বে একত্বের বোধ লাভে সাহায্য করবে, সেটাই হচ্ছে contribution। পরস্পর পরস্পরকে এইভাবে আত্মিক জগতে help করছি।ধরো তুমি আমাকে ফোন করে অনুভূতিটা বলছ, তখন হয়তো আমার মন অন্যদিকে ছিল। সেটা আমাকে help করলো মনটাকে অন্তর্মুখী করতে। তুমি কিছুটা ব্যাখ্যা করলে, আমিও কোন অংশের ব্যাখ্যায় সাহায্য করলাম। তাহলে পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে আমরা এগোবো। সমষ্টির সাধন মানে তাই—একসাথে চলা। "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্"--একসাথে চলবো, একসুরে বলবো, এক মন হব। সেই জন্য দ্বিতীয় যে সংশোধন টা ওর মনে থাকল না সেটা জানতে হবে। একটা তো 'অবদান' আর একটা কি সেটা মনে নেই। তাই তো অভীপ্সা ? দ্বিতীয়টা মনে নেই ?

অভীপ্সাঃ না, দ্বিতীয়টা মনে নেই।

পাঠকঃ হ্যাঁ, কেন মনে নেই জানো ? দেখো জীবনকৃষ্ণ লিখছেন যে ১২ বছর ৪ মাস বয়সে যখন আমি ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দেখলাম তখনকার যে আনন্দ অনুভূতি সেটা লিখে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। রামকৃষ্ণের কথার মধ্যে যে কি জ্ঞান লুকিয়ে আছে সেটা আমি বোঝাতে পারবো। যোগাঙ্গ দিতে পারব কিন্তু রামকৃষ্ণকে দেখামাত্রই রামকৃষ্ণের প্রতি আমার যে প্রেম জাগল, যে আনন্দ জাগল সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাহলে আমাদের দুটি correction করতে হবে। একটা হচ্ছে আমাদের অবদান আছে এইটা বুঝতে হবে, আরেকটা হচ্ছে প্রেম। জীবনকৃষ্ণকে দেখে, এই সমষ্টির চৈতন্য জাগ্রত হবে ও আমাদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম জাগবে, এই প্রেমটা কিন্তু দরকার। এটা মনে রাখতে হবে। তাকে ভালোবাসতে গেলে তার প্রকাশ যাদের মধ্যে তাদেরকেও ভালবাসতে হবে। আমরা

জীবনকৃষ্ণকে ভালবাসবো আর জীবনকৃষ্ণের প্রকাশ যাদের মধ্যে হচ্ছে তাদের নিন্দা চর্চার মধ্যে যদি আমরা থাকি, তাদেরকে যদি আঘাত করি, তাহলে জীবনকৃষ্ণকে কি ভালোবাসা হবে ? কিছুতেই হবে না। আর ওইটা মনে নেই এই কারণেই যে, এই ভালোবাসাটা, এই প্রেমটা লিখে বোঝানো যায় না। কোন ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না। ওই যে আমার স্বপ্ন হয়েছিল যে শান্তিশ্রীতে অনুষ্ঠান হচ্ছে। ৭ই জ্যৈষ্ঠ সবাই এসেছ তোমরা কলকাতা থেকে– আমি জয়কে ডাকতে গেলাম। জয় চিৎকার করে বলল, আগে সকলকে বলে দাও যে কোনো জীবনকৃষ্ণপ্রেমী যেন কোনো জীবনকৃষ্ণপ্রেমীর নিন্দা না করে। কাউকে আঘাত দিয়ে কথা না বলে। এইটা আগে বলে দাও । অর্থাৎ এইটা আগে। এইটা first criteria, তারপরে জীবনকৃষ্ণ কি তুমি জানতে পারবে। তাহলে প্রথম হচ্ছে প্রেম। একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের দায়িত্ব আছে। আমাদের অবদান থাকতে হবে ধর্ম জগতে। আমাদের নিজেদের একটু চিন্তা ভাবনা করতে হবে আর ভালবাসতে হবে। তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসবো। ভালোবাসতে গেলে তার প্রকাশ যাদের মধ্যে তাদেরকেও ভালবাসতে হবে। তাদের নিন্দা চর্চা, তাদেরকে আঘাত দিয়ে কথা বলা যাবে না। এইটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। এইটা যেন ভেতরে ভেতরে আমাদের প্রার্থনা থাকে, কেউ যেন আমার কথায় আঘাত না পায়। যদি কখনো ভুল হয় আমাদের, আমরা তো সাধারন মানুষ, ভুল হতে পারে, যদি রেগেও কোন কথা বলে ফেলি পরেও আবার কথা বলে বোঝাতে হবে যে আমার ওইটা ভুল হয়েছিল। সকলের ভালোবাসার ভিখারী আমরা। সকলের ভালোবাসা কামনা করে আজকের মত এখানেই শেষ করছি। যদি কারো কিছু প্রশ্ন থাকে বলতে পার।

অর্পিতাঃ হ্যালো, হ্যাঁ আছে, বলছি আমার একটা জায়গায় একটু doubt হচ্ছে।

পাঠকঃ কোন জায়গাটা বল।

অর্পিতাঃ আগে আলোচনা করলে না যে জ্ঞান খড়গ দিয়ে মাকে কেটে ফেললেন রামকৃষ্ণ। ওখানে বললে যে এটা বিশ্লেষণী ক্ষমতা। ওনার তো বেদান্তের সাধনের সময়েই এই দর্শনটা হয়েছিল ? এটা তো অনেক পরের দিকে হচ্ছে। বিশ্লেষণী শক্তি মানে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা তো ওনার আগে থেকেই ছিল। তাহলে এটা...

পাঠকঃ না না, ছিল না। এতখানি ছিল না। তাহলে উনি মা কালীকে জড়িয়ে ধরে কেন বলছেন, মা দেখা দে, মা দেখা দে ? বলবেন কেন ? বিশ্লেষণী ক্ষমতা যেটা আগে থেকে ছিল সেটা general, মানে ধরো কিছু কিছু মানুষ থাকে, খুব বুদ্ধিমান। সেটা আলাদা। উনিও বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন। তার intellect ছিল, সেখানে কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু এই আত্মিক জগতে যে মেধা, আত্মিক দর্শন-অনুভূতি বিশ্লেষণের যে ক্ষমতা যেটা জীবনকৃষ্ণ বলছেন যে দেখ, তোর এই স্বপ্নের যে মানে করলাম এটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন gold medalist কে নিয়ে আয়, ও এই স্বপ্নটার মানে করুক তো দেখি! পারবেনা। সে বিজ্ঞানী। সে একটা কিছু আবিষ্কার করতে পারবে। কিন্তু এর জন্য যে আলাদা মেধা লাগে। Brain এ কতকগুলো আলাদা আলাদা zone আছে। যেমন ধরো আমরা যখন কোন কিছু দেখি

তার জন্য একটা অঞ্চলের brain cell active হলে আমরা দেখতে পাই। ঠিক আছে ? চোখ তো ক্যামেরার কাজ করে কিন্তু সেটা বিশ্লেষণ করে তো brain, তেমনি যখন আমরা কিছু শুনছি– সেটা কি শুনলাম, তার কি তাৎপর্য, ওটা বিশ্লেষণ করে brain –এর একটা অঞ্চলের কিছু brain cell. তেমনি এই আধ্যাত্মিক জগতে আমি যখন একটা স্বপ্ন ব্যাখ্যা করছি সেইখানে যে মেধাটা দরকার সেটা brain–এর একটা বিশেষ অঞ্চলের brain cell ক্রিয়াশীল হলে তবে সম্ভব। সেইটা জাগল। এমনি general intellect ছিলই ওনার। এই জ্ঞান খড়্গটা ছিল না। এইটা বেদান্তের সাধন না হলে লাভ হয় না। তবে ঠাকুরের জড়সমাধির আগেই যে জ্ঞান খড়গ দেখছি তা ভগবান দর্শনের ফলশ্রুতি। বেদান্ত সাধন শেষে ওনার রাসফুল খাওয়ার বা মাথার চামড়া গুড়িয়ে যাওয়ার অনুভূতি টা তো জানিস। ঐ যে রে ভাবে হালদার পুকুর দর্শন। একজন ছোটলোক পানা সরিয়ে দিলে আর জল দেখা গেল। সচ্চিদানন্দ বারি। তাঁর এতদিনকার নানান ঈশ্বরীয় দর্শন অনুভূতি বিশ্লেষণ করে সচ্চিদানন্দকে জানার নতুন অধ্যায় শুরু হল। বোঝা গেল ?

অর্পিতাঃ হ্যাঁ।

পাঠকঃ সেই সময় আরো অনেক intellectual লোক ছিল। কেশব সেন তো বেশ intellectual লোক। কিন্তু রামকৃষ্ণের কাছে এসে হাঁ হয়ে যেতেন, ভাবতেন কি করে উনি বলেন এসব কথা ? বুঝতে পেরেছো ? এই intellect টা আলাদা। এই জ্ঞান খড়গটা আলাদা। তাহলে তো বিজ্ঞানীদের এই জ্ঞান খড়গ আছে তুমি বলবে ? তা কিন্তু নেই। কোন বিজ্ঞানী, সে যত বড়ই বিজ্ঞানী হোক, সে কিছুতেই ভাবতে পারবে না যে, মানুষ বাইরে আলাদা আলাদা কিন্তু প্রত্যেকের ভিতরে এক সত্তা। কিছুতেই ভাবতে পারবে না। এত সূক্ষ্মে কিছুতেই যেতে পারবে না বিজ্ঞানীরা। তুমি দেখনা বিজ্ঞানী সত্যেন বোস, উনি তো জীবনকৃষ্ণের কাছে গিয়েছিলেন। খগেন ঘোষের বন্ধু ছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন বোস। খগেন ঘোসও তো কুড়ি বছর আমেরিকায় research করেছিলেন। উনি জীবনকৃষ্ণের ঘরে গিয়েছিলেন। উনিই নিয়ে এসেছিলেন সত্যেন বাবুকে। তা সত্যেন বোস জীবনকৃষ্ণের কথা সবই শুনলেন। এক ঘন্টা ধরে জীবনকৃষ্ণ কথা বললেন। তারপরে সত্যেন বাবু বলছেন, দেখুন আপনি যাই বলুন, আমি কিন্তু জানি ঈশ্বর ওই আকাশে। সত্যেন বোসের মত লোক, অত বড় বিজ্ঞানী ! ভাবা যায় না। তা সেই বিজ্ঞানী কিন্তু নিতে পারছে না। কেন ? এই মেধা শক্তিটা নাই। বোঝা গেল কি?

অর্পিতাঃ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।

পাঠকঃ Thank you ! বেশ তাহলে আজকের মত এখানেই রাখি ? জয় জীবনকৃষ্ণ !

সকলেঃ জয় জীবনকৃষ্ণ।

২৬শে কার্ত্তিক, ১৪২৬-এর পাঠের (বোলপুর) অংশ বিশেষ।

প্রথমে গান (প্রার্থিতা ঘোষের কণ্ঠে)-

'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে
বসিয়া আছ কেন আপন-মনে
স্বার্থ নিমগন কি কারণে
চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি
প্রেম ভরিয়া লহ অঞ্জলি ভরি...'

আলোচনা ঃ ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন করে আমরা আনন্দের ঘনমূর্তি সেই অখণ্ড চৈতন্যে বিলীন হতে চাই। সেই অখণ্ড চৈতন্যের বিকাশের একটি ধারা আছে। কোন একটি মানুষের দেহেতে প্রাণশক্তির বিবর্তনে চৈতন্যের যে নির্যাস সংকলিত হয় পরে তা বিকশিত হয়, পরিব্যাপ্ত হয় জগতের মধ্যে। এই বিকাশের ধারাটি বিশেষভাবে আমাদের চোখে পড়ল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে। তিনি নিজের কথা বলছেন একটি উপমার ভিতর দিয়ে। বলছেন, ভরত রাজা হরিণ হরিণ করে হরিণ জন্ম লাভ করলেন। পরজন্মে আবার তিনি জড়ভরত হলেন। পুরাণের কাহিনীটির উল্লেখে তিনি নিজের আত্মিক অবস্থার কথা বলতে চেয়েছেন। তিনি বলছেন ভরত রাজা হরিণ হরিণ করেছিলেন। তিনি হরিণের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন তাই তিনি হরিণ হয়েছেন। হরিণ হওয়া মানে কি ? পশুর জীবন ? না, হরিণ কথার অর্থ হচ্ছে রশ্মিমান। পরম জ্যোতি স্বরূপ আত্মাসাক্ষাৎকার যিনি করেন, তিনি পরম জ্যোতি প্রাপ্ত হয়ে প্রকৃত ভক্ত হয়ে যান। ভগবান দর্শন করলে মানুষটা ভক্ত হয়ে যায়। তাহলে হরিণ হওয়া মানে ভক্ত হওয়া। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলছেন, আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যে আমি ভক্তের রাজা হবো। অর্থাৎ সাধারণ ভক্ত নয় উনি ভক্তশ্রেষ্ঠ হতে চান। হরিণের আর একটি নাম হচ্ছে মৃগ। এই মৃগ থেকে 'মার্গ' শব্দটি এসেছে। মার্গ মানে পথ। তিনি মৃগ হয়ে পথ দেখাবেন, সমস্ত ভক্তকুলকে মার্গ দর্শন করাবেন, ভক্তকুলের কাছে দৃষ্টান্ত হবেন। ভক্তরা কিভাবে জীবনযাপন করবে, তার আদর্শ হয়ে উঠতে চান, এই হচ্ছে তার প্রার্থনা। এবং আমরা দেখলাম যে তিনিই প্রথম জগতে ভগবান দর্শন করলেন ও আদর্শ ভক্তের জীবন যাপন করলেন, ভক্তদের রাজা হলেন। প্রথমে সূক্ষ্মভাবে হরিণ জন্ম হলো। তারপর স্থূল হরিণ জন্ম হলো। সূক্ষ্মভাবে হরিণ জন্ম হলো যখন তাঁর দেহেতে ব্যষ্টির সাধন পরপর হতে থাকলো—তন্ত্র, বেদ, বেদান্ত, তত্ত্বজ্ঞান ও অবতারতত্ত্ব যখন সম্পূর্ণ হলো, তিনি অবতার হয়ে গেলেন, পাকা ভক্তি লাভ হল। তখন সূক্ষভাবে হরিণ জন্ম হল। সূক্ষ্মভাবে, কারণ বাইরের মানুষ তখনও বুঝতে পারেনি যে ইনি ভক্তশ্রেষ্ঠ; ইনি অবতার। চৈতন্য অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর

দেহে, জগতে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য। কিভাবে মানুষ ভগবান ভগবান করে জীবন কাটাবে, কিভাবে ভগবানকে ডাকতে হয় তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য জগৎচৈতন্য তার মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন মানুষরতন রূপে। তিনি অবতার হলেন, তখন উনি সূক্ষ্মভাবে হরিণ জন্মলাভ করলেন। এরপরে স্থূলে হরিণ জন্ম লাভ হলো যখন সাধন শেষে তিনি আকুল হয়ে সন্ধ্যেবেলায় কুঠির ছাদ থেকে চিৎকার করে-ডাকছেন—"ওরে তোরা কে কোথায় আছিস ছুটে আয়, আমি যে আর থাকতে পারছিনা।" অন্তরঙ্গ ভক্তেরা এল প্রায় কুড়ি বছর পর। তাদের বয়সও কুড়ি-একুশ। তাদের মধ্যে তিনি ভক্তিরস সিঞ্চন করেছেন। জানা গেল তারা জন্মলগ্ন থেকে ঠাকুরের নির্বাচিত ভক্ত, ঠাকুরের সন্তান। তখনই ঠাকুরের ভক্তির বীজ পড়েছে সূক্ষ্মভাবে তাদের জীবনে। তারা ঘোষণা করল যে ঠাকুর ভক্তশ্রেষ্ঠ, অবতার পুরুষ। তিনি ঈশ্বর অনুরাগীদের কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে তার উদাহরণ।

তখন স্থূলে হরিণ জন্ম লাভ হল ঠাকুরের। তিনি সেই হরিণদের তথা ভক্তদের ভক্তিরস আস্বাদন করাতে লাগলেন। এর পরবর্তী জন্মে তিনি হবেন জড়ভরত। তার আভাস ফুটলো বটে কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে জড়ভরত অবস্থা ফুটতে দেখা গেল না তাঁর জীবনে। যখন তিনি বলছেন—"তুমি জানো আর না জানো তুমিই রাম", তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলছেন। এই ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠা হয়নি তাঁর জীবনকে কেন্দ্র করে। তাঁর জীবনে যেটা সুপ্রতিষ্ঠিত হল, সেটা হচ্ছে তার স্থূল হরিণ জন্ম অর্থাৎ স্থূলেতে মানুষ প্রত্যক্ষ করল যে ইনি ভক্ত শ্রেষ্ঠ। তাঁর মধ্যে ভক্তির যে প্রকাশ তার কোন তুলনা মেলে না জগতে। সমস্ত রকম সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে তিনি সকলেরই প্রাণের মানুষ হলেন। সকল ভক্তদের কাছে গ্রহণীয় হলেন।

এর পরের ধাপ হলো জড় ভরত হওয়া। এই জিনিস আমরা দেখলাম জীবনকৃষ্ণের জীবনে। জড়ভরতের মনে আছে আগের জন্মে তিনি মানুষ না হয়ে হরিণ হয়েছিলেন। এই জড়ভরত কারোর সঙ্গে কথা বলছে না, কারণ তাহলে যে সে মায়ায় জড়িয়ে যাবে। জীবনকৃষ্ণের জীবনে দেখলাম যে উনি বলছেন—"পাদমেকং ন গচ্ছামি"। আমি এক পাও বেরোবো না এই ঘর থেকে ঈশ্বরীয় কথা প্রচারের জন্য। এই প্রচারবিমুখ জীবনকৃষ্ণকে আমরা দেখতে পেলাম। তাঁকে অন্তরে দর্শন করে, যারা তাঁর ঘরে এসেছেন তাদেরকে তিনি ব্রহ্মবিদ্যার কথা বলছেন, তাদেরকে তিনি ঈশ্বরীয় কথা বলছেন এবং তারা তার প্রমাণ পেতে শুরু করল। তাদের দর্শন হতে শুরু করল। এই ব্রহ্মজ্ঞানের সূচনা হলো। ব্রহ্মবিদ্যা যে কি তার প্রমান ফুটতে লাগল জীবনকৃষ্ণের জীবনে। তিনি জড়ভরত হলেন অর্থাৎ প্রচারবিমুখ হলেন। বাইরে কাউকে বলতে গেলেন না। যারা তাঁর কাছে এসেছে, যাদের ভিতরে দোলা লেগেছে, ঈশ্বরীয় কথা শুনে দেহ সাড়া দিচ্ছে, আনন্দ হচ্ছে। তারা ছুটে এসেছে তাঁর কাছে। যেমন জড়ভরতের কাছে এসেছিল রাজা রহুগণ। রহুগণ এসে জড়ভরতকে বলছে—আমার একজন পালকিবাহক অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তুমি আমার পালকিটা বয়ে নিয়ে চলো। জড়ভরত উঠে রাজার পালকি বইতে শুরু করলে। তখন পাছে তার পায়ের তলায় কোন পিঁপড়ে চাপা পড়ে ও তার মৃত্যু হয় সেই ভয়ে সে লাফিয়ে

লাফিয়ে যেতে লাগলো। রাজার মাথা ঠোকা যেতে লাগল পালকিতে। রাজা বললেন—তোমার একি ব্যবহার ? তুমি রাজার সঙ্গে এরকম আচরণ করছ কেন ? অমনি জড়ভরত মুখ খুললেন। বললেন, আপনি রাজা ও আমি ভৃত্য এ সম্পর্ক সাময়িক। পরজন্মে ঠিক উল্টো হতে পারে। তাই আত্মার পরিচয় জানা উচিত। বলে নিজের পূর্বজন্মের কথা বললেন। রাজা তার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন, বুঝলেন ইনি বিরাট জ্ঞানী। রাজা বললেন, আমি তো যাচ্ছিলাম দীক্ষা নিতে। আমি আর কোথাও যাবো না। আপনিই আমায় দীক্ষা দিন, ব্রহ্মোপদেশ দান করুন। যাদের জীবনে সময় হয়েছে, ব্রহ্মজ্ঞানীর কৃপা পেয়েছে, দেহে দোলা লেগেছে, তারা কোনো একটি স্বপ্নদর্শন লাভ করে মাথায় ধাক্কা খেয়ে ছুটে এসেছে জীবনকৃষ্ণের ঘরে। বলেছে—আপনি কৃপা করে পালকি করে বয়ে নিয়ে চলেছেন আমাকে, আমার আত্মিকজীবনের ভার নিয়েছেন আপনি।

যারা জীবনকৃষ্ণকে স্বপ্ন দেখেছে অথবা রামকৃষ্ণকে স্বপ্ন দেখে জীবনকৃষ্ণের কাছে এসেছে, জীবনকৃষ্ণ তাদের বলছেন—বাবা, ঠাকুরই সব, ঠাকুরই সব। যেই তাদের শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলতে শুরু করলেন, তাদের ভিতর শ্রীজীবনকৃষ্ণকে নিয়ে নানা দর্শন অনুভূতি হতে শুরু করলো। তারপর তারা ধীরে ধীরে জানল জীবনকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ। উনি বলছেন—তুই যে আমায় স্বপ্নে সূর্যের মধ্যে দেখলি এর মানে কি, তুই কি তা জানিস? তুই জানিস না। দেখ পাঁচখানা উপনিষদে কি বলছে। এই সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ হলেন পরমব্রহ্ম। তুই আমাকে পরমব্রহ্ম বললি। তুই আমাকে ভগবান বলছিস, যখন অঙ্গুষ্ঠবৎ পুরুষ হিসাবে দেখলি। এইভাবে উনি ধরিয়ে দিতে লাগলেন, নিজের স্বরূপ ক্রমে প্রকাশ করলেন। জগৎ সবিস্ময়ে দেখল এই জড়ভরতকে, তাঁর পরিচয় পেল, বুঝল যে তিনি সত্যিকারের জড়ভরত নন, মুমুক্ষু মানুষের কাছে তিনি অমৃতের বার্তা বাহক। অহেতুক আবোল তাবোল কথা বলে সময় নষ্ট করার মানুষ তিনি নন। তাই অন্য লোকের কাছে তিনি জড়ভরত। ঠাকুরের দর্শনেও এই কথা পরিস্ফুট। আমরা সবাই জানি শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বিশেষ দর্শন—তূরীয় অবস্থায় ঠাকুরের একটি দর্শনের কথা জীবনকৃষ্ণ উল্লেখ করছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ দেখছেন সিহোড় যাবার পথ, সেখানে আনন্দের কুয়াশা। সেই কুয়াশার মধ্যে থেকে একটি ছেলে বেরিয়ে এলো, তার নাম পূর্ণ। সেই পূর্ণর গায়ে কোনো কাপড় নেই, আর ঠাকুরের দেহেতেও কোনো কাপড় নেই। দুজনে ছোটাছুটি করে খেলা করলেন অনেকক্ষণ। তারপর জল তেষ্টা পেয়ে গেল পূর্ণর। পূর্ণ একটা গ্লাসে করে জল খেলো, তারপর সেই এঁটো গ্লাসেই জল এগিয়ে দিল শ্রীরামকৃষ্ণকে। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—"তোর এঁটো খেতে পারব না।" তখন পূর্ণ হাসতে হাসতে গ্লাসটা ধুয়ে আবার একগ্লাস জল এনে দিল। দর্শন মিলিয়ে গেল। এখানে কি দেখানো হলো ? ঠাকুর যাচ্ছেন সিহোড়ে, মানে তার ভাগ্নের বাড়ি। কারণ তিনি মানুষকে জানাবেন যে তিনি মামা, চাঁদামামা। চাঁদামামা হলো সকলকার মামা—তার মধ্যেই সেই জগৎচৈতন্য অবতীর্ণ হয়েছে, প্রকাশ পেয়েছে। জগত জানুক তার মধ্যে পূর্ণর প্রকাশ হয়েছে। পূর্ণর সাথে তিনি খেললেন, কিন্তু পূর্ণর এঁটো খেলেন না, মানে একাকার

বোধ হলো না। তিনি তা চাইলেনও না, কারণ ভক্ত ও ভগবান—এই দ্বৈতবোধে তিনি থাকতে চাইলেন। ভক্তি নিয়ে থাকতে চাইলেন, ভক্তের রাজা হয়ে থাকতে চাইলেন, তাই তিনি পূর্ণর এঁটো খেলেন না। আর সেই কারণেই সিহোড় যাওয়া তাঁর হলো না। ওই দিকে চলার পথে তার লীলা হলো কিন্তু বাড়ি যাওয়া হলো না। একটি মানুষের দেহে জগৎচৈতন্যের বিকাশ হল, কিন্তু সেই জগৎচৈতন্যের লীলাটা সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছালো না। সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ করতে পারলো না। পূর্ণের কাছ থেকে জল নিয়ে তিনি খেলেন। চিনি খেলেন কিন্তু চিনি হতে চাইলেন না। তাঁর দেহেতে পঞ্চরসের লীলা প্রস্ফুটিত হলো। কিন্তু সেই আস্বাদ জগতের আপামর জনসাধারণকে দেওয়া হলো না। চৈতন্যের বিকাশ তথা যাত্রা সম্পূর্ণ হলো না। তবে শুরু হয়েছে। পরবর্তী ধাপ জীবনকৃষ্ণের মধ্যে আমরা দেখছি। তিনি সেই পূর্ণর সাথে একত্বলাভ করলেন। তিনি পূর্ণ হয়ে উঠলেন। পূর্ণ হয়ে ভাগ্নের বাড়িতে পৌঁছালেন।

সম্প্রতি শিবাশীষ পাল স্বপ্নে দেখছে—ও মামার বাড়ি গেছে। মামার বাড়ি গিয়ে দেখছে একজন অজানা বয়স্ক মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ও ভাবছে আমি হয়তো চিনি না, উনি আমারই দাদু হবেন হয়ত। সেই ভদ্রলোক এসে ওকে জড়িয়ে ধরেছেন। উনি বলছেন—তুই এত দেরি করে আসিস কেন ? আমি তোর কথা কত ভাবি ! তোর কথা আমার মনে পড়ে, তুই আসিস না কেন ? এই বলে ওকে জড়িয়ে ধরেছেন। আর সেই স্নেহমাখা কথা শুনে শিবাশীষেরও কান্না পাচ্ছে ভিতর থেকে। এবং সেই ভদ্রলোকের গায়ের গন্ধ তো বটেই, স্পর্শানুভূতিটাও তীব্রভাবে অনুভব করছে। এমন জোরালো তার অনুভূতিটা হয়েছে যে ঘুম ভেঙ্গে যাবার পরে সে কাঁদতে শুরু করেছে। ঘুম ভাঙ্গার পরে ও বুঝেছে, আমি ভেবেছিলাম আমার কোন দাদু হবে, আমি হয়তো চিনি না। এই প্রথম দেখছি হয়তো। কিন্তু না। এ তো স্বয়ং জীবনকৃষ্ণ ! ফটোর জীবনকৃষ্ণের মুখের সাথে হুবহু মিল। তাহলে সিহোড়ে যাবার পথে এই যে যাত্রা শুরু হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে, জীবনকৃষ্ণের জীবনে এসে দেখছি সেই যাত্রা যেন শেষ হয়েছে। তিনি যেন ভাগ্নের ঘরে এসে পৌঁছেছেন। সিহোড়ে এসে গেছেন ও ভাগ্নেকে জড়িয়ে ধরেছেন। আমরা জগতের সাধারণ মানুষ সেই চাঁদামামার দেখা পাচ্ছি জীবনকৃষ্ণের চিন্ময়রূপে। চাঁদামামাকে পাবার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি। এর পরবর্তী ধাপ সেই মামার সাথে একত্বলাভ করা।

এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হ'ল। আলোচনাটি গুছিয়ে এনে ও মীমাংসা নির্দেশ করে সম্পূর্ণতা দান করল জয়কৃষ্ণ। সেই অংশটুকু তুলে ধরা হ'ল।

জয়ঃ— প্রথম প্রশ্ন হলো, জীবনকৃষ্ণকে কেন দেখি ? দ্বিতীয় প্রশ্নে বলা হলো, সেই দেখায় আমার অর্থাৎ দ্রষ্টার গুরুত্ব কি ? তিন, ব্রত বলল কোন চর্চা ছাড়াই কেন জীবনকৃষ্ণকে দেখি ? পাঠে না এসেও তো একা একা চর্চা করা যায় ? প্রশ্নগুলো একই ধরনের। তাহলে প্রথমে আমি বলব স্বপ্ন কেন দেখি ? বেশ কিছু কারণ আছে। এ ব্যাপারে বহুজন বহুরকম কথা বলেছেন। পেট খারাপ করলে স্বপ্ন দেখা হয়, কোন বিষয়ে চিন্তা করলে স্বপ্ন দেখা হয়,

Specific কোন বিষয় নিয়ে ভাবছি সেটা নিয়ে স্বপ্ন দেখা হয়, আবার কোন জিনিসে আমার ইচ্ছা আছে সেটা নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারি। বিভিন্ন বিষয়ের উপর আমি স্বপ্ন দেখতে পারি। ইংরেজিতে দুটো কথা আছে—knowingly আর unknowingly, একটাই কথা—un বসিয়ে দিলে আর একটা কথা হয়ে যায়। কিছু জিনিস স্বপ্নে যা দেখি বা স্বপ্ন যা হয়, এগুলো সব unknowingly হয়, কিছু জিনিস জেনে অর্থাৎ knowingly আমরা স্বপ্ন দেখি।

স্বপ্ন কিভাবে হয় সে বিষয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন কথা বলেছেন। ফ্রয়েড একরকম বলেছেন। এখানে স্বপ্ন আলোচনাটা একটু অন্যরকম। স্বপ্নের pattern-টা আমরা এখানে একটু change করেছি।

এবার প্রথম প্রশ্নে যাওয়া যাক—জীবনকৃষ্ণকে কেন দেখি ? জীবনকৃষ্ণকে কেন দেখব ? Not necessary যে জীবনকৃষ্ণকে দেখতে হবে। দরকার নেই। ....Unknowingly ঈশ্বরকে আমরা চাই—সবাই আমরা চাই। মুখে আমরা যতই বলি যে চাই না। কালী চাই বা শিব চাই বা মাদুর্গা চাই—যা হোক কিছু জিনিস একটা চাই। কেন চাই ? আমার কিছু হওয়ার জন্য। আমার কিছু হোক, এই হওয়ার জন্য চাই। অর্থাৎ আমি যেন কিছু পাই in return. এটা এক ধরনের চাওয়া। আর আরেকটা চাওয়া হল ভালোবাসি বলে চাই। এটাও একটা চাওয়া। এবার ঈশ্বরকেই যদি আমি চাই, আমি কৃষ্ণ দেখতে পারি, আমি কালী দেখতে পারি, আমি শিব দেখতে পারি—যা খুশি তাই দেখতে পারি। যে দেবদেবী আমার প্রিয়—দেখতে পারি। কিন্তু যিনি ভগবান হয়েছেন, এবার তাঁকেই তো আমি দেখব। সেই জন্য আমরা বলি স্বপ্নে অপরিচিত কোনো মানুষকে দেখা মানেও ভগবানকে দেখা। তাই সেই অপরিচিত মানুষ অনেক সময়েই equal হয়ে যায় জীবনকৃষ্ণের সাথে। তাহলে আমার চাহিদা, আমার চাওয়াটা হচ্ছে আমি একবার ভগবানকে দেখবো। এটা আমার চাওয়া। আমার ভিতরে একটা চাওয়া আছে, সেই চাওয়ার ভিত্তিতে কিন্তু জীবনকৃষ্ণকে দেখি। আমার যদি কোনরকম চাওয়া না থাকে, দেখা কিন্তু খুব কষ্ট। পাতাল ফুঁড়ে কি শিব বেরোবে ? বেরোবে বটে কিন্তু ইংরেজিতে এটাকে বলা হয় hardly. তাহলে আমার নিজের চাওয়া হলো যে তাঁকে দেখবো। ঈশ্বরকে তো কেউ চায় না, মানে না—এটা মানছি। যদি percentage -এ ভাগ করা যায় ৭০ শতাংশ লোক, তার থেকে কম হবেনা বরং বেশিই হবে, মাকে কেউ চায় না একটা certain age-এর পর। মাকে চায় না, কিন্তু মা বলি। মাকে চাই কি না চাই, মা বলি। ভিতরে আছে যে , মাকে নিয়েই কিন্তু আমার চলা। ঠিক সেইরকম ঈশ্বরকেও কিন্তু আমরা চাই--সেটা বুঝে চাই বা না বুঝে চাই। কিন্তু আমরা চাই। এই যে আমার একটা চাহিদা—আমি তাঁকে দেখবো, আমি তাঁকে পাব, চর্চার দরকার নেই—এটাও স্বপ্ন দেখার পিছনে আমার অর্থাৎ স্বপ্নদ্রষ্টার একটা গুরুত্ব। আমি যে চাই। আবার ফিরে আসছি unknowingly-র ব্যাপারে। অনেকে আছে চর্চায় থাকুক আর না থাকুক সে কিন্তু স্বপ্ন দেখে। আমাদের brain -এ অনেক কিছু part (অংশ)আছে। কিছু অংশে hammering হয় ক্রমাগত। কামারশালে হাতুড়ি দিয়ে পেটানোর মত। এই hammering -এর জন্য তাঁকে দেখা যায়। বিভিন্ন form-

এ, বিভিন্ন রকমভাবে তিনি দেখাবেন যে তাঁর অস্তিত্ব রয়েছে, বোঝাবেন আমি তোর ভিতরে আছি। আমি বুঝতে পারিনা, আমি বুঝতে চাইও না।

কিন্তু তিনি দেখাবেন, আমি দেখতে চাই না তবু দেখাবেন। মাধাই বলল, আমাদের চর্চাটা চাই, ঠিক। কিন্তু চর্চা ছাড়াও দেখা যায়। তিনি কেন hammering করেন ? আমরা মানুষরা হচ্ছি শ্রেষ্ঠ জীব। কার থেকে শ্রেষ্ঠ ? আমার পোষা কুকুরটা, তোর পোষা কুকুর থেকে better, কারণ আমি training দিয়েছি। কিন্তু মানুষ শ্রেষ্ঠ, কার থেকে শ্রেষ্ঠ ? এ কথাটা কেমন ? কিন্তু আমরা বলি। অন্য প্রাণীর সঙ্গে তুলনা চলেই না, Comparison এ আসেই না। আরেকটা ব্যাপার আছে। আমরা মানুষেরা যেন নিজেরাই বাঁচতে পারি, কাউকে প্রয়োজন নেই। মানুষ তো ? অনেক কিছু তৈরি করেছি। কিছুই দরকার নেই যেন। কিন্তু একটা জিনিসের দরকার সবসময় আছে। কিছু জিনিস এই মুখ দিয়ে ঢুকে যায় (খাবার), দরকার আছে। ওটা যদি না ঢোকে কিছুই হবে না। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বেরিয়ে যাবে। যাইহোক, সেই রকম একটা জিনিস আছে যা নিয়ে আমি বেঁচে আছি।

আমি যাকে নিয়ে বেঁচে আছি সে কিন্তু আমাকে hammering করবে। আমি তাঁকে নিয়েই আছি। উনি কিন্তু আমার অক্সিজেন। সেই জন্য অক্সিজেনের গুরুত্ব বুঝিনা। অক্সিজেন কোথা থেকে আসে বুঝিনা। ওকে আমি বুঝিনা কিন্তু ওকে ছাড়া আমি চলতে পারি না। উনি আমার ভিতরেই আছেন। ওনাকে নিয়েই আমি চলছি। সেইজন্য উনি করেন hammering. সেজন্য চর্চা হোক বা না হোক, কেউ জিনিসটা চাক বা না চাক সে কিন্তু তাকে দেখবে। বিভিন্ন form-এ দেখবে। সে যে জীবনকৃষ্ণকে দেখবে তা নাও হতে পারে। রামকৃষ্ণকে দেখবে, কালীকে দেখবে, শিব বা দুর্গা—যাকে হোক দেখবে। এই দেখার মধ্যে এক হচ্ছে তার অন্য ধরনের চাহিদা, আর এক হচ্ছে তাঁকে দেখবো বলে চাহিদা। দুটোর মধ্যেই চাহিদাটা আছে। তাহলে এই চাহিদা বা আকাঙ্খার ভিত্তিতেই তাঁকে দেখবো। আর এইখানেই রয়েছে আমার গুরুত্ব। আমার দিক থেকে রয়েছে একটা ভাবনা। আর ওকে নিয়েই যে আমি আছি। ওনার যে অস্তিত্ব আছে তা দেখানোর জন্য, বোঝানোর জন্য উনি hammering করে যাবেন। এই hammering এর আওয়াজটা যদি আমরা শুনতে পাই, তাহলে আমরা কিছু জিনিস উপলব্ধি করব। আর যদি শুনতে না পাই তাহলে কিছু যায় আসে না। Life-টা যেমন চলছে চলবে, একসময় মরে যাবো। তাতে কোনো কিছু যায় আসে না। এবার এই জিনিস যে উপলব্ধি করতে পারবে, সে বলবে আমি শ্রেষ্ঠ। কার তুলনায় শ্রেষ্ঠ? যে উপলব্ধি করতে পারবে না তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ। তাহলে মানুষকে মানুষের সাথেই তুলনা ক'রে বলে যে কে শ্রেষ্ঠ। মানুষকে কখনো পশুর সঙ্গে তুলনা করে বলা হয় না যে ওর থেকে তুমি শ্রেষ্ঠ। মানুষের সাথেই তুলনা করে বিষয়টা যদি উপলব্ধি করতে পারি তাহলে sound of hammering -টাকে আমি গুরুত্ব দেবো, বুঝতে চেষ্টা করব। তখন মাধাইয়ের কথা আসছে—চর্চা করতে হবে। চর্চাটা নিজে নিজেও করা যায়। ভাবতে হবে এটা কেন দেখলাম? এটা further কি হবে ? আমাকে কি করতে হবে ? নিজে নিজেই ভাবা যায়।

রাস্তায় চলতে গেলে কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করে না যে কিভাবে চলব। কেউ জিজ্ঞাসা করে না। এখন তো technology-র যুগ, আরোই জিজ্ঞাসা করে না। আগে তাও জিজ্ঞাসা করতো। আজ পর্যন্ত তুই কাউকেই জিজ্ঞাসা করিসনি (ব্রতকে উদ্দেশ্য করে) যে হাঁটার সময় আমি আগে ডান পা-টা ফেলবো না বাঁ পা-টা ফেলবো । কেউ-ই জিজ্ঞসা করে না। কিন্তু Army -তে training -এ শেখানো হয় আগে বাঁ পা-টা ফ্যালো। এতে শরীরে একটা balance আসে। সেইজন্য বাঁ পা-টা আগে ফেলতে হয়। একটা technique আছে। যাইহোক, কাউকে কি জিজ্ঞাসা করা হয় যে আগে আমি কোন পা-টা ফেলে চলবো ? নিজে নিজেই কিন্তু করি। নিজে নিজেই কিন্তু রাস্তা খুঁজি। যদি রাস্তায় কিছু জিনিস পড়ে থাকে যেমন গোবর, তাহলে কি ওটাতে পা দিয়ে যাবো না কাউকে জিজ্ঞাসা করব যে কোন পাশ দিয়ে যাব ? ডান পাশ না বাঁ পাশ দিয়ে নাকি ডিঙিয়ে যাব ? কাউকেই জিজ্ঞাসা করিনা। তাহলে চর্চাটা নিজে নিজেই করা যায়।

আবার ঘুরিয়ে সেই এক কথা– unknowingly । কেউ কেউ স্বপ্ন দেখেন কিন্তু চর্চার সঙ্গে যুক্ত নন, তবুও তারা দেখে যায়। আমার ভিতরে অজানা, যেটা আমি জানি না, সেইটাকে জানার ইচ্ছা ভিতরে কোথাও যেন থেকে গেছে—সেখান থেকেই দেখি। চর্চা তো নিজে নিজে করাই যায়। কিন্তু একটা সমস্যা আছে যে ! যেমন ধর অনেক বিষয় আছে- তার মধ্যে একটা vital বিষয় হল অংক। অংক নিজে করা যায়, ভুল করা হয়। Last -এ কি করি ? উত্তরমালা থেকে মিলিয়ে বসিয়ে দিলাম। বলি, বাঃ ! মিলে গেছে। অংক নিজে করা যায় কিন্তু তবু আরেকজনের কাছে শিখতে হয়। তাই চর্চা যে নিজে করা যায় না তা নয়, করা যায়। প্রশ্নটা হলো, এটা কি rightful ? মানে আমি যেটা ভাবছি সেটা কি ঠিক নাকি কিন্তু আছে ? এখানে আবার দুটো কথা আছে। এক—সে ঠিক হতে পারে। দুই—ভুল হতে পারে। মার্ক্সের একটা কথা আছে–"dialectical thought". বাংলায় বললে বলতে হবে নেতি নেতি করে এগিয়ে যাওয়া, দ্বন্দ্বমূলক ভাবনা। নিজের মধ্যে নিজেকে নিজে কেটে কেটে এগিয়ে যাওয়া। সেটাতেও হয়, এভাবেও এগোনা যায়। কিন্তু এইভাবে এগোতে গেলে পুরো মনটা এইদিকে দিতে হয়। পুরো মনটা এইদিকে দিতে গেলে সেই level-এ গিয়ে সেইভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে। যদি একটা কোন question -এর answer পাবার জন্য আমাকে বসতে হয়, যদি ভাবি কারো সাহায্য আমি নেব না, তাহলে at least দশ দিন সময় লেগে যাবে perfect answer পেতে। এবার যদি কারোর সাহায্য নিই, তবে সেটা পাঁচ মিনিটে হবে। আরেকটা উদাহরণ বলা যায়। বাজারে প্রচুর বই আছে। কোন বইটা better জানতে যে পড়েছে তাকে জিজ্ঞাসা করো। আর একটা উপায় আছে- –বাজারের সবকটা বই নিজে পড়ো, তুমি জেনে যাবে এই এই বইগুলো better. তাহলে দুটো উপায় আছে। আমি নিজেই করতে পারি। এই নিজে করার জন্য আমাকে কিন্তু তাগিদটা রেখেই যেতে হবে। না হলে পাঁচটা বই পড়ার পর বিরক্তি লাগবে। আমি confused হয়ে যাব কোনটা ছিল ভালো, কোনটা খারাপ? কোনোটায় একটু ভালো আছে,

কোনোটাতে explanation গুলো কম আছে এসব গুলিয়ে যাবে। তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা বলা হল অনেকে মিলে বসে একটা আলোচনা করা তুলনামূলকভাবে একটু better, কিন্তু নিজে করা যায়।

ব্রতঃ—বাকিদের ব্যাখ্যাটাও যে সত্য সেটাতো আমাকে প্রমাণ পেতে হবে ? কোনো স্বপ্ন হয়তো দেখলাম, সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা তুমি দিলে, সেইটাই যে আমার স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা সেটার প্রমাণ আমি কি করে পাব স্বপ্ন ছাড়া ? সব স্বপ্নের ব্যাখ্যা তো আমি প্রমাণ পাই না যে এটাই আমার স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা হল।

জয়ঃ— দেখো, স্বপ্নের ব্যাখ্যা ঠিক হতে পারে আবার ভুল হতে পারে। এবার আমাদের কিছু জিনিস ভালো লাগে আবার কিছু জিনিস ভালো লাগে না। এই ভালো লাগাটা আমাদের মনের ভিতর। কিছু কিছু জিনিস বলে এই স্বপ্নটার এই ব্যাখ্যা। এবার আমি মনে যেটা চাইছিলাম সেটার সঙ্গে যদি মিলে যায়, বলি বাঃ ! এই ব্যাখ্যাটাই ঠিক। দারুন বলেছে। আবার স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা,যদি আমার সঙ্গে differ করে, তাহলে বলি না হলো না—এইরকমও তো ব্যাখ্যা হয় ! তাহলে ঠিক কি ভুল এই নিয়ে judge করার আমাদের কোন জায়গা নেই। আমাদের ওটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। সেটা যদি এবার মারাত্মক রকম ভুল হয় তাহলে একটা ব্যাপার হবে। যদি আমি এই চর্চাতে থেকে যাই, আমার একটা structural change হবে। structural change -টা হল body condition change হওয়া। সেইজন্যই বলা হয় দেহেতে নিতে পারছি না। ওই ভুল ব্যাখ্যাটা তখন দেহ reject করবে। দেহটা তখন internalised হয়ে গেছে। যেটা আমার external part সেটা internalised হয়ে গেছে। যেটা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের ক্ষেত্রে বলা হয়। দুঃশাসন তার কাপড় খুলে নিতে যাচ্ছে। কাপড়, যেটা বাইরের জিনিস কৃষ্ণের কৃপায় সেটা দ্রৌপদী internalised part করে ফেলছে। সেটাকে দুঃশাসন টেনে খুলে ফেলতে পারছে না, তাই ছিটকে পড়ল। তেমনি ওই অবস্থায় খুব ভুল ব্যাখ্যা শুনলে তখন body তে একটা jerk দেবে—জানাবে যে না, এটা ঠিক হচ্ছে না। সেইজন্য আমাদের ঐ সমস্ত ভেবে লাভ নেই যে এটা হবে না, ওটাও আমাকে proof করতে হবে ইত্যাদি। আমরা সবাই মিলে যদি বিভিন্ন ভাবধারা আদান প্রদান করি একটা কিছু সমাধান আসবে।

ব্রতঃ— ধরো দুজন আলাদা ব্যাখ্যা দিল, তাহলে universal ব্যাখ্যা হিসেবে আমি কোনটাকে ধরবো ? আমি একটা perfect ব্যাখ্যা খুঁজতে চাইছি যে এই স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যাটা এই হতে পারে। আমি দুটো মতই নিলাম কিন্তু আমাকে তো universal point of view থেকে দেখতে হবে যে আমি কোনটা নেব ?

জয়ঃ— একশো বার! আমি কলকাতা যাবো। কলকাতা যাবার অনেক রাস্তা আছে। একটা বাসের রাস্তা—ইলামবাজার হয়ে ওই দিক দিয়ে ঘুরে যাব। একটা গুসকরার দিক দিয়ে আছে, আরো একটু সহজ হবে। একটা ট্রেনের রাস্তা আছে, আমি পানাগড় থেকে ট্রেন ধরতে পারি। আবার দুর্গাপুর থেকেও ট্রেন ধরতে পারি। আমার এই option -গুলো

জানা থাকলো। এবার আমি কোনটাকে নেব ? আমি একটা পথেই হাঁটবো। আমি যেকোনো একটা পথ দিয়ে হাঁটবো। এবার সেটাতে যদি দেখি toughest road পড়ে যাচ্ছে, আমি যদি ওটাকে নিয়ে positively ভেবে যাই অনেক জায়গায় আমার চিন্তা ভাবনার সাথে ওটা miss-match করে যাবে। তাহলে নিশ্চয়ই ওটা মিলছে না। সেখান থেকে back করে আসবো। একটা কোন স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো, সে স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা universal হয়ে যাবে, এটা হয় না। বিভিন্ন জনের স্বপ্ন বিভিন্ন perspective–এ হবে। এ যদি স্বপ্ন দেখে এর স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা এই ভাবে নেব । একটা সবারই জন্য ভাববো, একটা ওর perspective -এ হবে, আবার ও কোন ধরনের চিন্তাভাবনায় চলছে সেটা আমার সঙ্গে কেমন লাগবে সেটা নিয়ে একটা ব্যাখ্যা হবে। অর্থাৎ তিন রকম ভাবে ব্যাখ্যা হবে। একটা স্বপ্নের যে একটা universal ব্যাখ্যা হবেই তা বলা যাবে না। আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি সেটা সমষ্টির সাধনের বিষয় দেখাচ্ছে ভাবছি, তা নাও তো হতে পারে, হতে পারে এটা আমার pure ব্যষ্টি দেখাচ্ছে। কিন্তু আমি আমার perspective -এ ধরছি সমষ্টির কথা। এটা নাও হতে পারে। আমি তখন কি করব ? আমি দুটোকেই নেব। ব্যষ্টির কিছু কথা আছে কিনা, সেখানে আমার কিছু fault-এর কথা বলা হচ্ছে কিনা সেটাও দেখব। আমাকে তো এগোতে হবে।
ব্রতঃ— আমার এই acceptability–টা নিজের individual বোধের উপর নির্ভর করছে না?
জয়ঃ— একশবার !
সমরেশঃ কোন স্বপ্নের ব্যাখ্যায় যদি আমার আনন্দ হয়, তাহলেই যে ব্যাখ্যাটা ঠিক তাতো নয়। অনেক সময় আমার অহং তৃপ্ত হওয়ায় এই আনন্দটা হয়। বলি ব্যাখ্যাটা খুব ভালো লাগলো তাই তো ?
জয়ঃ— একদম ঠিক ! তুমি দেখলে তোমার নিজের যেটা ইচ্ছা ছিল সেটা তো মিলে গেল। বললে, বাঃ! ব্যাখ্যাটা দারুন ! সেটা হয়তো সঠিক ব্যাখ্যা নাও হতে পারে। এবারে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি কোনটাকে সঠিক ব্যাখ্যা ধরবো ? সঠিক কোনটা এটা কিন্তু বলা খুব কষ্ট। আমরা সেই level-এ যাইনি যে বলে দেবো এটা সঠিক। আমাদের দেহটা অতটা pure কিন্তু হয়নি। মামনদি একটা প্রশ্ন করেছিল। যেখানে কথা প্রসঙ্গে বাইবেলের গল্পটা বলল, born again virgin মানে purified হওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই বলা হচ্ছে। আমাদের body কিন্তু ততটা purified নয়। এখনো সেই level -এ হয়নি যে আমি বলে দিতে পারব যে এটাই ঠিক। কিছু জিনিস অনেক পরে জানা যায়। সেটা জীবনকৃষ্ণের ক্ষেত্রেও হয়েছে। স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা যে কি সেটা উনি অনেক পরে বুঝেছেন। উনি হয়তো বুঝেছিলেন কিন্তু বলেননি, সেটা আলাদা বিষয়। তিনি বুঝেছিলেন, তিনি যে purified মানুষ, কিন্তু বলেননি। কেন বলেননি ? তাহলে আমাদেরকে এটাকে নিয়েই পড়ে থাকতে হবে। যেটা এখনো incomplete. এবার যদি মনে হয় যে, এটা বুঝে গেলাম, এটাই ঠিক, তাহলে কিন্তু আমরা trap–এ পড়লাম। আমরা ওইখানেই ঘুরপাক খাবো। জীবনকৃষ্ণ এইজন্যই বলেছিলেন যে অনেক আগের ওই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এতদিনে বুঝলাম। উনি অনেকদিন আগেই বুঝে

গেছিলেন। উনি বলছেন পরে, যাতে আমরা বুঝি। এবার তুমি বললে, আমি ছোটবেলার দিকে কেন চলে যাচ্ছি ? ছোটবেলাটা কেন দেখছি ? সেটা তুমি অন্য way–তেও ভাবতে পারো। গ্র্যাজুয়েশন টাকে জ্ঞান আহরনের প্রথম পর্যায় বলা হয়। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকে জ্ঞান কিছু হয় না। graduation–টাকে জ্ঞান অর্জনের প্রথম স্তর বলা হয়। এইজন্য graduate-কে বলা হয় knowledgable person. তাহলে জ্ঞান আহরণের পথে এখনও আছি। এবার যদি তুমি ভাবো আমি পিছনের দিকে চলে গেলাম, purified-এর দিকে চলে গেলাম, তাহলে তুমি কুয়োতেই পড়লে। সেটা আমাকে বুঝতে হবে। এবার আমি যদি ওটাকে ধরে নিই যে আমার divinity বেড়ে গেল, আমি purified হয়ে গেলাম, এটা আমার পক্ষে সুখের কথা, আনন্দের কথা। আর আমি যদি মনে করি জ্ঞান আহরণের first stage–এ পড়ে আছি, তাহলে আমাকে আরো জানতে হবে। জ্ঞান আহরণের পথেই আমি আছি-–এই ভাবনা খারাপ নয়। এটা আরো betterment –এর দিকে নিয়ে যাবে। আমি যদি ধরি আমি first year –এ পড়ছি, আমার জ্ঞানের preliminary পর্যায় start হচ্ছে, তা হোক না, এখানে কেউ কম জানে না, আবার কেউ বেশিও জানে না। কেউ একটু বেশি জেনেছে কেউ একটু কম জেনেছে তাতো নয়। ওটাতে এইভাবে marking করা হয় না। কি করে marking হবে ? আমি যদি ব্যাখ্যাটা এইভাবে ধরি, তাহলে এটা আমার পক্ষে better, এবার আমি যদি ধরেই নিই যে আমার divinity বেড়েছে, আমি purified-এর দিকে এগিয়ে গেছি, তাহলে তো সব হয়েই গেল actually সে কূয়োতে পড়ল। সমুদ্রে মিশবে না। নদী সবসময়ই ছোটে, সে যে নদীই হোক, বর্ষার জলে পুষ্ট হোক বা বরফ গলা জলেই পুষ্ট হোক, জল পেলেই ও ছুটবে। ছোটাই ওর কাজ। আমি অনেকদিন ছুটেছি, আর ছুটবো না, তা বললে তো হবে না। কারণ আমাদের ছোটাই কাজ। পুরো back -এ যাবো, back থেকে আবার starting ,আবার starting, আবার starting আবার fresh start এই ভাবে এগোবো। socialistic way–তে dialectic theory আছে, আর পিছিয়ে গিয়ে fresh start, এটাও dialectical, কিন্তু এটা হচ্ছে spiritual -এ, দ্বন্দ্বমূলক আধ্যাত্মবাদ। তাহলে দেখা গেল চর্চা ছাড়াও হয়। চর্চাটা ঘুরিয়ে টানলাম। লাটাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। লাটাই নিজেও কাজ করতে পারে। সূতো ছাড়তে পারে। চর্চা নিজেও করা যায়, কিন্তু সম্মিলিত ভাবেই করার কথা, প্রয়োজন মতো check করার সুযোগ থাকে।

অভিজিৎ রায়ঃ—সমষ্টির সাধন আমরা বলছি, যেমন ব্যষ্টির সাধন একটি বিশেষ মানুষের দেহে হয়। কিন্তু সমষ্টির সাধন সম্পর্কে আমরা খুব একটা বেশি clear নই।

জয়ঃ—সাধন মানে কি কিছু আচার আচরণ করা ? সাধনের সমার্থক কথা একটা নিতে পারি যা হলো পুজো। সাধনটা একটু পোশাকি নাম, গালভরা নাম। আর পুজোটা হচ্ছে চলতি নাম। পুজোটাই বা কি আর সাধনটাই বা কি ? দুটোই একই জিনিস। এবার পুজোটাতে বলা হয়নি আচার-আচরণ, বিধি-নিষেধ মেনে করতে হবে। সেখানেও বলা নেই। সাধনও তাই। সেখানেও বলা নেই যে কিছু নিয়ম maintain করে সাধন করতে হবে। কিন্তু দুটোই

একটা practice. যেমন আমরা পড়াশোনা করি এটা একটা সাধন। এটা একটা process বা সাধন যেখানে আমাকে মনটা দিতে হয়। টাকা দিলেই হয়ে যাবে, তবে টাকাটা তো এবার আবার রোজগার করতে হবে। টাকা রোজগার করতে গেলেও আবার মন দিতে হবে। চুরি করতে গেলেও মনটা দিতে হবে। তা নাহলে পুলিশের হাতে ধরা পড়বো, clue রাখলে চলবে না। যে করেই হোক আমার মনটাকে যে দেবো, এই মনটা দিয়ে যে আমি কিছু কাজ করবো এটাই সাধন। সাধন মানে বিশেষ কিছু প্রক্রিয়া নয়। আমরা যে একটা আলোচনা করব, আমি যে চর্চায় থাকবো, আমি যে নিজে চর্চা করবো, সেটাই তো আমার সাধন। তুমি চান করতে করতে ভাবতে পারো, তুমি latrine-এ বসে বসে ভাবতে পারো, হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে পারো, কিছু খেতে খেতে ভাবতে পারো, যখন খুশি তুমি ভাবতে পারো– এটাই হচ্ছে সাধন। আমি যে way-তে ঈশ্বরকে ভাবছি, যে way-তে আমি তাঁকে চিন্তা করছি সেই way-টা সাধন। একটা গানে আছে– The way I like you. আমি যেভাবে তোমাকে চাই সেটাই আমার ভালোবাসা, আমি যে way-তে তোমাকে চাই, সেটাই আমার সাধন। সাধন কোনো specific ব্যাপার নয়, যেভাবেই হোক তুমি করতে পারো। এবার ব্যষ্টির সাধন একরকম, সমষ্টির সাধন একরকম। ব্যষ্টির সাধনের যে মান, সমষ্টির সাধনের যে মান, মানে যে process, যেভাবে তুমি তাঁকে ডাকছো, সেই ডাকার পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আছে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমরা হয়তো এক ঘন্টা সময় দিই। তাও অনেকে সময় দিই না। আর ২৪ ঘন্টার মধ্যে যে ২৪ ঘন্টাই দিতে পারে, তার দেহের আমূল একটা পরিবর্তন হয়ে যাবে। সমষ্টির সাধনে যে দেহের পরিবর্তন আসবে না, তা তো নয় ? সেখানেও পরিবর্তন আসবে ! সহজ ভাষায় বলতে পারি, সবাইকে নিয়ে যখন আমরা চলছি, সবাই মিলে যখন একটা আলোচনা, একটা process -এ আমরা যাচ্ছি সেটা সমষ্টির সাধন।

অভিজিৎ ঃ—আমার কাছের যারা মানুষ তাদের সঙ্গ আত্মিক জগতে এগোনোর পথে বাধা বলে কেন মনে হয় সবসময় ? আমি বলতে চাইছি আমার বাবা-মা, family-র যে মানুষজন, কেন problem হয়ে যায় ? এটা কি ব্যক্তির চাওয়ার উপর নির্ভর করে না যে, সব মানুষের হোক, কাছের মানুষদের কিছু উপলব্ধি হোক, যেন এই পথে সবাই একসঙ্গে থাকতে পারি ?

জয়ঃ—তুমি চাইছো যে সবারই এইরকম হোক। আমি একটা জিনিস খাই। আজ পর্যন্ত ঘরের কাউকে সেটা খাওয়াতে পারলাম না। ছোট থেকেই এটা আমি খাই। চা-মুড়ি আর তাতে বিস্কুট। আমি এটা খাই। বলে, এটা খেলে পেট খারাপ হবে। হোক। কিন্তু এটা আমি ছোট থেকে খাচ্ছি। আর কাউকেই খাওয়াতে পারলাম না। বলেছি যে এটা খাও, দেখো কতো tasty. কেউ বুঝলো না। সবাই বলছে পেট খারাপ হয়। তারা বলে, সকালবেলায় চা খাবি না, পেট খারাপ হবে তোর। ঠিকই বলে, দাদা খায় না। আমার পোস্ত ভালো লাগে। পোস্তর জন্য শরীরের অনেক ক্ষতি হয়, তা হোক। কিন্তু আমার ভালো তো লাগে ! আমি আর কাউকে পোস্ত সেরকম ভাবে খাওয়াতে পারি নাই ! এবার তুমি বলছো এই আত্মিক চর্চা ঘরের সবারই হয়ে যাক, সবার মধ্যে reflected হোক। Reflect কখন হবে বলতো ? দুটো

way-তে হতে পারে। এক—যদি আমার body-টা steel হয়, তাহলে reflection হয়। আর দুই—আমার -body-টা যদি আয়না হয়, তাহলে reflection হবে। আমার body steel হলে অসুবিধা কি ? আমি যেটা চাইছি, আমার ভিতরে যেটা হয়েছে, কেউ দেখতে পাবে না। একটা আভাস পাবে যে একটা কিছু হচ্ছে, এটা ঠিক আছে। যদি আমার body -টা আয়না হয়, আমার কি হয়েছে অন্যে দেখবে। আমার ইচ্ছাটা অন্যের মধ্যে reflect হোক, সেটা তো কেউ চায় না। যেমন ঈশ্বরকে কেউ ভালোবেসে চায় আবার কারোর ভালোবাসার মধ্যে স্বার্থ মিশে আছে। দুটো আছে কিন্তু দুটোর মধ্যেই চাহিদা আছে, টান আছে, তবে টানের তারতম্য আছে। আমার ইচ্ছা যে সবারই হোক—আমার ঘরে মা-বাবা দেখুক, ঘরের আর পাঁচজন আত্মীয়-স্বজন দেখুক, সবাই দেখুক। তাহলে আমাকে তো আগে আয়না হতে হবে। তবে তো আমি তা reflect করব। আমি বলছি, কিন্তু ওরা শুনছে না, বলছে না, ওদের বোধোদয় হচ্ছে না। তাহলে আমাকে আগে আয়নায় পরিণত হতে হবে। সেই process হোক, তুমি বলবে আমার body কখন আয়না হবে ? আয়না কি এখন হয়েছে না কি হয়নি এটা তো বোঝা যাবে না। আয়না হয়েছে, কিভাবে হয়েছে, কিভাবে হবে —এই সব জানার দরকার নেই। তোমার দেহ এমনিতেই আয়না। যদি পুরোন কথায় বলি old wine in a new bottle. যদি নতুন কথায় বলি, কাদামাখা মোষের গায়ে জল ঢেলে দিলেও সে মোষই থাকে, আর কাদামাখা মানুষের গায়ে জল ঢেলে দিলে সে মানুষ। তুমি কিন্তু আয়নাই হয়ে আছো, ওই ময়লাটাকে একটু সরাও। তখন দেখবে আপনা থেকেই হয়ে গেছে। অন্যদের মধ্যে হতেই হবে ! যদি না হয় তাহলে পরিষ্কার কথা—তোমার হচ্ছে না। তুমি সেরকম মন দাও না বা তুমি চাইছো না। সেটা বিভিন্ন কারণে। এবার আমি চাইবো, সেই চাওয়াটার মধ্যে আমার অন্যরকমও থাকবে, আবার আমি অন্য বিধিবাদীয় কাজও করবো আর বলব আমার হচ্ছে না, সেটা বলার কোন মানে নেই। আমি যদি চাই আমি সেই ভাবেই চাইবো। যে ভাবনাটা আমি ভাবছি, সে ভাবনাটা তো ভাবতে হবে। ধরো আমি কিছু পড়াশোনা করছি বা ছবি আঁকছি, ছবি আঁকার প্রতি যদি আমি মনটা না দিই, এবার যদি বলি তুলিটা খারাপ, রংটা ঠিক নয়, এত পারিপার্শ্বিক disturbance! কোন এক artist -কে আমি মেলাতে দেখেছি, আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। যে রকমই disturbance থাকুক না কেন ও ছবিই এঁকে যাচ্ছে। মনটা দিয়ে যাচ্ছে। এবার যারা আমরা মন দিচ্ছি না তখন আমরা নানা রকম problem-এর কথা বলে পাশ কাটিয়ে যেতে চাচ্ছি। নানারকম excuse দেখাচ্ছি। এখানকার এক ছাত্র আমাকে বলেছিল, ডাকলেও তো হয় না । দেখা তো যায় না। কিছুই তো হয় না। কৈ হয়? তখন আমি বললাম, তুই ক'বার ডেকেছিস? আগে আমাকে সেটা বলতো, তুই ক'বার ডেকেছিস ? যদি তোর মাকে দেখতে না পাস, আসছে না মা, একমাস এলো না, তখন ব্যাপারটা রাগারাগির পর্যায়ে চলে যায়। মা আসছে না। তাহলে সেই যে তোর টান, সেই টানটা কি হয়েছে ? তুই যে বলেছিলি, হোলো না। তখন তুই বলতে পারিস ভগবানের ত্রুটি। তুমি আপ্রাণ ডেকেছো, action নিয়েছো তখন কি আসেনি ? তখন তুমি ভগবানকে দোষ

দেবে। এবার আমি অল্প অল্প উপর উপর ডাকলাম আর বললাম কৈ হলো না তো। ওটায় কি লাভ ? সেটাই তোমার হচ্ছে আয়না। ওটাই হচ্ছে born again virgin.

শুভাশিসঃ— এর সঙ্গে আপনা থেকে হওয়ার প্রসঙ্গটা কি ?

জয়ঃ— তুই হেঁটেছিস কিভাবে ? হাঁটার তো একটা পদ্ধতি আছে। ছোটবেলায় হেঁটেছিস কিভাবে?

শুভাশিসঃ—প্রথমে হামাগুড়ি, তারপরে দেওয়াল ধরে ধরে চলা।

জয়ঃ— নিজেই ? কেউ ধরেনি ? কেউ একজন ধরেছিল আর নিজের চেষ্টাটা ছিল, ইচ্ছা ছিল, আমি হাঁটবো দাঁড়াবো। সেই চেষ্টাটা, নিজের ইচ্ছাটাই যদি না থাকে—পাতাল ফোঁড়া শিবকে আমি উঠতে দেব না যদি ঠিক করে থাকি তো শিবের ক্ষমতা নেই ওঠার ! ওঠার ক্ষমতা নেই কথাটা বলা ভুল। ওঠার ক্ষমতা আছে কিন্তু তুমি বাবা মরে যাবে। সেইজন্য উনি উঠবেন না। কারণ উনিই যে তুমি। তাহলে তুমি মরে গেলে উনিও মরে যাবেন। নিজেকে কেউ মারবে না। আপনা হতে হবে—আমরা বলে দিই, একটা safe zone -এ play করা, খেলা যে আপনা থেকে হবে। আপনা থেকে তখনই হবে যখন আমার চেষ্টাটা থাকবে, কিছুই করতে হবে না। আমার শুধু ইচ্ছা আর কিছু চাই না। আমি কিছু করছি, আমাকে এই করতে হবে, আমাকে অহংকার করলে চলবে না, আমাকে এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে—এইগুলো হচ্ছে প্রচেষ্টা। এটাকে বলা হচ্ছে না, ইচ্ছাটার কথা বলা হচ্ছে। সেটা তো তোমার চাই। তাহলেই হবে। তারপরেই আপনা থেকে কাজ হবে। সেই ইচ্ছার কথাটা আমি বললাম। যদি সঠিক ইচ্ছাটা থাকে তাহলে আপনা থেকেই ময়লাটা চলে যাবে। ময়লা হাতে করে পরিষ্কার করতে হবে না। পাশে যে আছে, reflect পড়ে যাবে তার উপর। পড়বেই পড়বে। নির্ঘাত পড়বে। তুমি যে এখানে এসেছ, ছুটি নিয়ে এসেছ, যেভাবেই আসো না কেন, এসেছো। তোমার একটুও তো ইচ্ছা ছিল। এবার তোমার যদি ইচ্ছাই না থাকে, কেউ তোমাকে আনতে পারবে না। তুমি এখানে বসে থাকতে পারবে না, সহ্য করতে পারবে না, তাহলে বিন্দুমাত্র তো ইচ্ছা তোমার ছিল। ব্যস ঐটুকু ইচ্ছাতেই বাকি সব তোমার পূর্ণ হয়ে যাবে। সবদিক থেকে হয়ে যাবে। ঠিক হয়ে যাবে। একটু তো ইচ্ছা ছিল, বাকিটা কি করে হলো সেটা ভাবার দরকার নেই। প্রথম থেকেই হবে না। ওটা আবার একটা ভুল। ইংরেজিতে বলে misperception

সাগরঃ—বলা হয় সব আগে থেকে ঠিক তো হয়েই আছে!

জয়ঃ—হ্যাঁ, ঠিক তো হয়েই আছে। কিন্তু চেষ্টা তো করতে হবে। কারণ এখন আমার কি predestined তা আমি জানিনা। তবু আমি রাত্রে পড়ে যাই। যদি চাকরি হয়, খুড়োর কল। ছুটে যাই। এবার যদি বলা হয় predestined কিছু আছে, এতে এটাই হবে—এটা এরকম ভাবে ভাবি যাতে মনে কিছু একটা শান্তি আসে। predestined, তোমার কি হবে সব কিছু লেখাই আছে—এটা একটা মনের শান্তি, আর কিছু নয়। এত খেটেও আমার কিছুই হলো না। অনেক কিছু করেও সব বৃথা যাচ্ছে। এবার আমি যদি আমার এটা বন্ধ করে দিই, অন্য

যা কিছু আছে সেগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আমরা বলি এটাই হয়তো আমার কপালে লেখা ছিল। predestined কথাটা myth, not মিথ্যা।

ব্রতঃ—মাকে তো দেখেছি। মায়ের প্রতি টান ভালোবাসা তো হবেই। কিন্তু ভগবানকে তো দেখিনি তার ওপর ওই টান হবে কি করে ?

জয়ঃ—এখানে অনেকেই আছে যে শান্তিনিকেতনের মেলা দেখে নাই। মেলার টানটা হয় কি করে ? শান্তিনিকেতনের মেলা দেখেনি, কিন্তু পাগলের মত ছুটবে মেলাতে। শুনেছে যে এখানে একটা বিখ্যাত মেলা হয়। এসে অনেকেই ঠকে যায়। বলে, ওহ্ এই !দূরে অনেক পাহাড়-পর্বত, সোনালী রুপালী কালার fantastic দৃশ্য, মানুষ ছুটে যায়। ওটা কি চিরকাল আমি চোখে দেখে এসেছি বলে সেই টান অনুভব করেছি ? তা কিন্তু নয়। মা যে আসছে না, মা যে আসে, মায়ের প্রতি এই ধরনের টানটাকে আমি highlight করেছি। এই যে টান যে মা তুমি আসছো না, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না—তাহলে তোমাকে যে দেখা যায়, কৈ আমি তো দেখছি না—এই টানটা। টানটা দেখেও হয় আবার না দেখেও হয়।

বরুণঃ—আমি গতরাত্রে একটা স্বপ্ন দেখেছি সেটা বলে শেষ করি। দেখছি—স্নেহময়দা একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। সুন্দর লাল রঙের কভার, চকচক করছে। বইটাতে যেন কি লিখছে। বোঝা গেল বইটা about love. শুধু love-এর উপর বইটা। রবীন্দ্রনাথের লেখা মনে হচ্ছে। ভালোবাসার বিষয়। কি লিখে যেন আমায় gift করলো। বইটা আমার হাতে তুলে দিল। love এর উপর একটা বই আমাকে gift করেছে কাল রাতে স্বপ্নে। মূলত এই বিষয়টার উপরেই আলোচনা হল আজ। ঈশ্বরের প্রতি টানকে মায়ের ভালোবাসার সঙ্গে compare করা হলো। বলা হলো কিভাবে ভগবানকে ভালবাসতে হয়।